সাধুসংবাদ

সাধু-সংবাদ

(উপন্যাস)

মিঞাজী

নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স
নওগাঁ, রাজশাহী

প্রকাশক —
এম, ছোলায়মান আলী
নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স
নওগাঁ, রাজশাহী।

মুদ্রণে :—
খন্দকার আবু নাসের
বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ, বগুড়া।

প্রচ্ছদ অঙ্কনে :—
পামার্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ডিজাইনার
৪১ নং পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ :—
জানুয়ারী, ১৯৬২ ইং

মূল্য :—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

একটি কথা

'প্রতারক' নামে আমার বিশ বছর পূর্ব্বের একটি মাঝারি গল্পে এই বইয়ের ঘটনাটি বাঁধা ছিল। আমার সোদর প্রতিম স্নেহভাজন জনাব ছোলায়মান আলী ছাহেব জেদ্ ধ'রলেন গল্পটিকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিতে হবে বড় গল্পে। জেদের চোটে সাত-তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিলাম। পেয়াদার জবরদস্ত্ তাম্বিহ্ থেকে বাঁচলাম। এর পরের দায়িত্ব আমার নয়।

ছোলায়মান শিক্ষক, বই-ব্যবসায়ী, বিচিত্ররূপে প্রাণবন্ত, ধার্ম্মিক,। তাঁর দোওয়া চাই ;—এবং এরিয়েলের মতো মন জিজ্ঞেস ক'রতে চাইছে—

"Was it well done ?"

প্রস্‌পারের মতো তাঁর জবাব মিল্‌বে কি ?

—"Bravely my diligence, thou shall be free."

আমার ছোলায়মান ছাড়াও যাঁরা আমার মতো ভীরু ও লাজুককে দিয়ে বই লিখিয়ে নিচ্ছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। রেভেনিউ সার্কেল ইনস্‌পেক্টার জনাব মুজিবুর রহমান, বি-এ, ; আমার পুত্রতুল্য আবুল কাসেম বি-এ, বন্ধু বাবু দেবব্রত মৈত্র, এম-এ, S. D E. O. মিঃ আজহারুল ইসলাম B.A., B.T., T.E.O. মিঃ রমজান আলী, এম-এ ; বি টি, আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর এস্-এম্ মুসা কাজেম, মধ্যম ভ্রাতা এস্-এম্ আলী হোসেন প্রাক্তন শিক্ষক ও আত্মীয় জনাব হোসেন আলী মৃধা ছাহেব, পল্লীকবি আফতাব হোসেন ও আব্বাছ আলী ছাহেব, স্নেহভাজন এ-এইচ-এম হাবিবুর রহমান, বি-এস-সি, বি-এড, বন্ধু জনাব ডাঃ খাদেম আলী ছাহেব, জনাবান ছালামতুল্লাহ্ সাহেব, দীন্ মোহাম্মদ, স্নেহভাজন মীর হোসেন, মেছের উদ্দিন বি-এ, মুজিবর রহমান, তরুণ সাহিত্যিক মৌঃ মকবুল হোসেন খন্দকার, কবি প্রভাসচন্দ্র সরকার, মেহের আবিদ আলী, শফী উদ্দিন ও আশরাফ আলী, কছির উদ্দিন এবং পরিশেষে আমার পিতৃতুল্য সাহিত্যিক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব মিঃ আফজলের উৎসাহবাণী মনে চির-জাগরুক থাকবে।

বগুড়া এডওয়ার্ড ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের নটরাজ, সাহিত্য পৃষ্ঠপোষক ভাই জনাব আমজাদ হোসেন সাহেব, সুসাহিত্যিক বন্ধু জনাব শামছুল হক ছাহেব ও বাবু কনক-ভূষণ দাশগুপ্তের নিকট বহু প্রকারে ঋণী। প্রেস হ'তে দূরে থাকায় ছাপায় বানানে ও বিরতিচিহ্নে খানিক ভুল র'য়ে গেল। ত্রুটি আমার। ইতি—

—গ্রন্থকার

একটি কথা

'প্রতারক' নামে আমার বিশ বছর পূর্ব্বের একটি মাঝারি গল্পে এই বইয়ের ঘটনাটি বাঁধা ছিল। আমার সোদর প্রতিম স্নেহভাজন জনাব ছোলায়মান আলী ছাহেব জেদ্ ধ'রলেন গল্পটিকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিতে হবে বড় গল্পে। জেদের চোটে সাত-তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিলাম। পেয়াদার জবরদস্ত্ তাম্বিহ্ থেকে বাঁচলাম। এর পরের দায়িত্ব আমার নয়।

ছোলায়মান শিক্ষক, বই-ব্যবসায়ী, বিচিত্ররূপে প্রাণবন্ত, ধার্ম্মিক,। তাঁর দোওয়া চাই ;—এবং এরিয়েলের মতো মন জিজ্ঞেস ক'রতে চাইছে—

"Was it well done?"

প্রস্পারের মতো তাঁর জবাব মিল্‌বে কি ?

—"Bravely my diligence, thou shall be free."

আমার ছোলায়মান ছাড়াও যাঁরা আমার মতো ভীরু ও লাজুককে দিয়ে বই লিখিয়ে নিচ্ছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। রেভেনিউ সার্কেল ইনস্‌পেক্টার জনাব মুজিবুর রহমান, বি-এ, ; আমার পুত্রতুল্য আবুল কাসেম বি-এ, বন্ধু বাবু দেবব্রত মৈত্র, এম-এ, S. D E. O. মিঃ আজহারুল ইসলাম B.A., B.T., T.E.O. মিঃ রমজান আলী, এম-এ ; বি টি, আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর এস্-এম্ মুসা কাজেম, মধ্যম ভ্রাতা এস্-এম্ আলী হোসেন প্রাক্তন শিক্ষক ও আত্মীয় জনাব হোসেন আলী মৃধা ছাহেব, পল্লীকবি আফতাব হোসেন ও আব্বাছ আলী ছাহেব, স্নেহভাজন এ-এইচ-এম হাবিবুর রহমান, বি-এস-সি, বি-এড, বন্ধু জনাব ডাঃ খাদেম আলী ছাহেব, জনাবান ছাদামতুল্লাহ্ সাহেব, দীন্ মোহাম্মদ, স্নেহভাজন মীর হোসেন, মেছের উদ্দিন বি-এ, মুজিবর রহমান, তরুণ সাহিত্যিক মৌঃ মকবুল হোসেন খন্দকার, কবি প্রভাসচন্দ্র সরকার, মেহের আবিদ আলী, শফী উদ্দিন ও আশরাফ আলী, কছির উদ্দিন এবং পরিশেষে আমার পিতৃতুল্য সাহিত্যিক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব মিঃ আফজলের উৎসাহবাণী মনে চির-জাগরুক থাকবে।

বগুড়া এড্ওয়ার্ড ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের নটরাজ, সাহিত্য পৃষ্ঠপোষক ভাই জনাব আমজাদ হোসেন সাহেব, সুসাহিত্যিক বন্ধু জনাব শামছুল হক ছাহেব ও বাবু কনক-ভূষণ দাশগুপ্তের নিকট বহু প্রকারে ঋণী। প্রেস হ'তে দূরে থাকায় ছাপায় বানানে ও বিরতিচিহ্নে খানিক ভুল র'য়ে গেল। ত্রুটি আমার। ইতি—

—গ্রন্থকার

বিস্ময়কর কর্ম্মশক্তির
ও প্রতিভার অধিকারী
দেশ গণকল্যাণকামী
মিঃ আব্দুর রব্ চৌধুরী, সি-এস-পি,
—এঁর চির-সবুজ স্মৃতির সাথে
বই খানার নাম জড়িয়ে দিলাম।
—মিঞাজী

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

১। পাক্-শিক্ষায় ঘূর্ণিপাক (নাটক) যন্ত্রস্থ
২। পাক্-ভ্রমণে বিপাক ,, (শীঘ্রই প্রকাশনায়)
৩। পাক্-চরিত্রে দুর্বিপাক ,,
৪। বিশ্বরূপ ,,
৫। দুইরূপ ,,
৬। একাল ও সেকাল ,,
৭। দুখু ভাইয়ের পাঠশালা ,,
৮। মিঞাজীর স্বপ্ন ,,
৯। আলেখ্য ,,
১০। সীমান্ত, কাশ্মীর ও উত্তর ভারতে কয়েক মাস (ভ্রমণ কাহিনী) ,,
১১। বিষামৃত (গল্প) ,,
১২। কোরাণ ও আধুনিক বিজ্ঞান ,,
১৩। দোওয়ায়ে কোর-আনুল হাকিম ও মোনাজাতে রাছুলে কারিম ,,

সাধু-সংবাদ

এক

বি-এ পরীক্ষার খা'টুনীতে শরীর এমন জীর্ণ শীর্ণ হ'লো যেন শরীর থেকে মাংস সব ঝ'রে প'ড়েছে। ফল ভালো ক'রবো তা সবাই বিশ্বাস ক'রতেন। তাই আব্বাজান বিশেষ কিছু না ব'লে শুধু ব'ললেন, "দার্জ্জিলিং যাও। স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে এম-এতে ভর্ত্তি হও।"

তিনি রাশভারী লোক। সৎ ও বুদ্ধিমান ব'লে দেশে তাঁর খ্যাতি আছে। তবে কথা কম বলেন ব'লে কেউ কেউ আত্মম্ভরী ব'লেও ঠাওরান। তাই আব্বাকে চিরদিন সমীহ কোরে দূরে দূরে স'রে থেকেছি। বিশেষ দায়ে না প'ড়লে তাঁর সামনে হাজির হোতে চাইনি। আমার আব্দার যা কিছু, তা আম্মার সঙ্গে।

তাই আব্বার প্রস্তাবে আমার ব'লবার কিছুই ছিল না। আর তাছাড়া আমার পক্ষে এতো আনন্দের হুকুম। মনে মনে খুশী হোয়ে মনে মনেই বললুম, 'তথাস্তু। আপনার পরমায়ু ও ধন দিন দিন বৃদ্ধি হোক।' নইলে আমার নবাবী খরচ যোগাবে কে? মাথা নীচু করে, 'নজর বর কদম' রেখে মুখে শুধু ছোট্ট একটু 'জি, আচ্ছা' ব'লে বেরিয়ে এলুম।

যোগাড় যন্ত্রের বালাই আমার কিসের? আমাকে দার্জ্জিলিং পাঠানো যাঁদের গরজ সে চিন্তা ও ঝামেলা তাঁদের। তাঁরাও পাকা লোক।

আগের রাতে একঝুড়ি উপদেশ দিয়ে চৈত মাসের এক বিকেল বেলায় খুলনায় ট্রেনে তুলে দিলেন আব্বা। সঙ্গে এসেছিল আমার বোনেরা। তাদের বেজায় হাসিমুখ। বিদায়ের সময় একটি কথা খরচা না ক'রলে কেমন হয়,—তাই বোধহয় আব্বা তাঁর হিসেব ও ওজন করা কথার সামান্য দু'টি বেহুদা খরচা ক'রলেন। ব'ললেন, "যাও।" আল্লা ভরসা। যেমনটি ব'লেচি সেইভাবে চ'লো। তাঁরা আমার টেলিগ্রাম পেয়েচেন। ষ্টেশন থেকেই "স্যানিটরিয়ামের লোকেরা তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

বহুত আচ্ছা। মনে মনে বলি, একবার পৌঁছি তো। তারপর দেখে নেবো। কচি খোকা খুকুমণি তো নই? লেখা পড়াও জানি। হোক্‌না নূতন জায়গা।

পরদিন সকালে পৌঁছলুম শিলিগুড়ি। সামনের দিকে নজর ক'রে দেখি প্রায় আকাশ ছোঁয়া একটি ঢিবি গাছ গাছড়ায় ও লতাপাতায় ঢেকে র'য়েচে। পাহাড়িয়ে রেলপথের খেলনা রেলগাড়ী দেখে মনে হ'লো যেন আর কিছুটা ছোট হ'লেই ছু'টি ছোট বোনকে উপহার দেয়া যেতো। কামরার ভেতরে দাঁড়ালে মাথায় টক্কর খাবে ব'লে মনে হয়। তবে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তার ইঞ্জিন যে হুশহুশ শব্দ করে তাতে বেহুশ হবারই কথা।

গাড়ীতে যেতে যেতে এই ইঞ্জিনের শব্দ নিয়ে কথা উঠলো। তখন 'তরাই' অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গাড়ী চ'লচে। একজন বুড়ো ভদ্দরলোক এই ছোট্ট কাহিনীটুকু ফাঁ'দলেন, 'তখন সবে পাহাড়ের বুকে রেলপাতা হয়েচে। প্রথম যেদিন এই 'তরাই'এর ঘন জঙ্গল ঘেরা অঞ্চল দিয়ে রেলগাড়ী চ'লচে তখন ড্রাইভার দেখলে, একদঙ্গল হাতী শুয়ে ব'সে খেলা ক'রচে রেল লাইনের উপর। লম্বা একটি অজগরের মত গাড়ীর আসা দেখেও তারা 'কেয়ার না দারদ।' আপন খেলা নিয়েই মত্ত। ড্রাইভার প্রমাদ গুন্‌লে। আজ ট্রেন শুদ্ধ সবারই ধ্বংস অনিবার্য্য। এমন সময় হঠাৎ-ই তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। এই যেমন ট্রেনটির আগে পাছে ছু'টি ইঞ্জিন,—এ ছু'টি থেকে এক সঙ্গে খুব জোরে 'হুশ্‌ হুশ্‌' শব্দে জানিয়ে দিলে যে 'ওরে হস্তিযুথ এখনো হুশ ক'রে স'রে পড়ো।' নইলে এখনই বুঝতে পারবে ঠ্যালা! আর ইঞ্জিন থেকে ছাড়লে গরম পানির ছিটে। হাতীর দল পালিয়ে গেলো। নইলে রেল লাইনের ইতিহাসে সেইটি হ'তো একটী নূতন ধরণের Disaster. এ গল্পটী ফরেষ্টার মিঃ স্যাডির মুখে আমার শোনা।'

গল্প শুনে বুড়োর প্রতি একটী শ্রদ্ধার ভাব মনে জাগলো। বেশ আনন্দ পাচ্চি। এ ধারে ওধারে ঋজু শালবন। নয়নাভিরাম শ্যামল লতাগুল্মাদি গায়ে গায়ে জড়িয়ে র'য়েচে। সবুজ ঘাসে ঢাকা তরাই-এর মাটী। চা'র দিকে শুধু সবুজের বান ডেকে গ্যাচে। আমিও তরুন, তাজা, সবুজ। হয়তো দার্জ্জিলিং হোতে ফিরতি যাত্রায় কয়েকমাস সবুজের সাহচর্য্যে কাটিয়ে সুন্দর, সুপুষ্ট ও লাবণ্যময় দেহমন নিয়েই একদিন ফিরবো।

আপনারা বুঝতে পেরেচেন সেই-ই আমার প্রথম দার্জ্জিলিং যাত্রা। এবং শেষও বটে। কেন,—সে কথা পরে ব'লচি।

এই যে পাহাড়ে উঠা, আর চা'র ধারের দৃশ্যাবলী, সবই আমার কাছে স্বপ্নময় মনে হ'চ্চে। মনে হ'চ্চে যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে যাচ্ছি। রেল লাইনের ধারে 'পাগলা ঝোরা' দেখলুম। অবিশ্রান্ত, অফুরন্ত ধারায় পাগল পারা হোয়ে সে প্রাণের বাঁধন টুটিয়ে, ঢেলে দিচ্ছে তার অমৃত ধারা। মনে পড়লো রবির 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এর কথা,

"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া
আকুল পাগল পারা ;—
আমি ঢালিব করুণাধারা।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর !"

ঠিকই তো। ভয়কে জয় করে যৌবনাবেগ। 'পাগলা ঝোরার' পানি চোখে মুখে খুব ঝা'পটে দিলুম, প্রাণ ভ'রে পান ক'রলুম।

ক্রমে বেলা প'ড়ে আ'সচে। দূর হ'তে দেখলুম কুয়াসা আর পাতলা পাতলা ধূম্রাকার মেঘমণ্ডলী 'ঘুম' ষ্টেশনটীকে একেবারে নিঝঝুম কোরে রেখেচে। দিনের বেলা গোধূলীর খেলা এমন আর দেখিনি যেমন দেখেচি এই 'ঘুম'-এ।

অবশেষে সব শৈলাবাসের রাণী দার্জ্জিলিং-এ পৌঁচলুম যখন, তখন সাঁজের আর সামান্য বাকী। কিন্তু তখনই বিজলী বাতি সব জ্ব'লে উঠেচে।

কি আশ্চর্য্য ! লাল লাল মুখ আর লম্বা লম্বা বেণীওয়ালী মেয়েরা সব কুলি এখানে !

একজন উর্দ্দী পরা চাপরাশ আঁটা লোকের চোখ কাকে যেন খুঁজে ম'রচে। চাপরাশে স্যানিটারিয়ামের নাম লেখা। বুঝলুম আমিই সেই মহামান্যবর ব্যক্তি যাকে সে এস্তেক্‌বাল ক'রতে এসেচে।

দুই

চা'র দিকের কি সুন্দর পরিবেশের মাঝে এই লোইস্ (Lowis) জুবিলি স্বাস্থ্যনিবাস। তকত'কে ঝক্‌ঝ'কে গৃহখানি। উত্তর মুখো হ'লেই নজরে পড়ে বরফে ঢাকা 'কাঙ্-চেন জুঙঘা,'—'ফালুত,' 'জান্নু,' 'কাবরু,' 'পাদিম,' 'মাকালু' আর সীমাহীন ধবল পর্ব্বতশ্রেণী।

"'T is good to see the virgin snows
no man has ever trod,
The saints alone, around his throne
May walk the height of God."

মানবের ঐ পরশ বিহীন
পাহাড় কুমারী হিমানী সতী।
দেবদূত শুধু যেতে পারে সেথা
মানবের তরে নাহি অন্য গতি।

তাই হোক। শুধু দেখেই আনন্দ লাভ করি। কিন্তু মানবেরই বংশধর শের্‌পা তেনজিং আর এডমণ্ড হিলারী পাহাড় কুমারীর সে গর্ব্ব আর বেশী দিন রা'খতে দেননি। আর বামে, পশ্চিম দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন সবুজ গাছপালায় ঘেরা 'টঙলু' আর সন্দাক্‌ফু পর্ব্বত। হেথায় মাথার উপরের আকাশ অনেক নীচে নেবে এসেচে। আর পায়ের তলাকার সমতল খুলনা, শিলিগুড়ির ওপারে ফেলে এসেচি। আমি এখন স্বর্গ ও মর্ত্তের মাঝামাঝি এক নূতন জগতে বাসা বেঁধেচি। এখানে আছে স্বর্গের আনন্দ সুধা, আর মর্ত্তের মায়া বিলাস।

দার্জ্জিলিং— দোর্জ্জেলিঙ,—

Oh Mountain Queen, within thy realms,
What potent charms do lie,
Which gives the old a clinging hold
On things foredoomed to die !
All o'er the hills, the lovers roam,
While Cupid shoots his darts ;
When gods are blind, they are so kind
To those with loving hearts."

ওলো গিরিরাণী মন-মোহিনী,
তোর মাধুরীর নেইকো শেষ।
হেথা জীর্ণ প্রাণে অমৃত আনে
কারো জরার রহেনা লেশ।
হেথা প্রেমিক সুজন মধুর কুজন
করে কুঞ্জেতে ও ঝোপঝাড়ে।
তখন সদয় চোখে দেবতারা চায়
মদন যখন বান ছোঁড়ে।

বাস্তবিকই। এখানে নূতন জনের মনটী সংসারের আর দশটী চিন্তা থেকে বিযুক্ত হ'য়ে পড়ে। গ'ড়ে উঠে মনে স্বপ্ন সৌধ। হারিয়ে যায় সে কল্পনার মায়া-লোকে। কাব্যি করার বদনাম আমার শত্রুতেও কোনও দিন দিতে পারেনি। স্কুল কলেজে গেচি। সুবোধ গোপালের মত গুরুজনের আদেশ মাথা পেতে নিয়েচি। 'এখানে যেও না, ওখানে মিশো না, মন দিয়ে পড়াশুনা করো'—সব মেনেচি। ভাল ছাত্তর ব'লে নামও কিনেচি। আজ হঠাৎ মনের মধ্যে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হ'য়ে বান ডেকেচে। আজ সে আকুলি বিকুলি ক'রে ছুটোছুটী ক'রতে চায়। ছুটোছুটী শুরুও ক'রে দিলুম। ছোট্ট পাহাড়ে শহরে টহল দিয়ে ফিরি, আর আশে পাশের স্থান চ'ষে বেড়াই। কিন্তু সব দেখার পর একটী জায়গা অদেখা দ্রষ্টব্যের মত রোজই আমাকে আকর্ষণ ক'রতে থাকে। সেটী 'অবজারভেটি ট্রি হিল'এর উত্তর পাশে 'বার্চ্চহিল পার্ক।'

রোজ সকালে চা পান ক'রে বেরিয়ে পড়ি। এবং সিধা পার্কের শেষপ্রান্তে এক গাছতলায় ব'সে পড়ি। সেখানে লোকের সমাগম থাকে না। হাহা হিহি হাসির হুল্লোড় আপনার মনকে চকিত কোরে তুলবে না। নিরিবিলি নিজকে নিয়ে মশগুল থাকুন কেউ বিঘ্ন ঘটাবে না। রোজ উপবেশনে গাছতলাটী খট্‌খ'টে হ'য়ে একটী সাধুর আসনে রূপান্তরিত হ'লো।

সাধু ব'লতে আমি। খাঁটী বিবেকানন্দ-মার্কা সাধু। আমার ধ্যানের বস্তু ঠিক সামনেই 'কাঞ্চন জঙ্ঘা।' দৃষ্টি পথে কোনও প্রতিবন্ধক নেই। 'কাক-উড়্‌তি' পথে মাত্র বত্রিশ মাইল।

রোজ দেখি সকালের সূর্য্য কাঞ্চন জঙ্ঘার সাথে যাদুকরের খেলা শুরু কোরে দেয়। তার পাঁচটী ধবল তুষার চুড়ায় সাতটি রংয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়। আবার মিনিটে মিনিটে তার বর্ণের ও রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। যেন কাঞ্চন জঙ্ঘাকে অপরূপ কোরে সাজিয়ে গুজিয়ে সূর্য্যি ঠাকুরের সাধ আর মেটে না। এর মধ্যে মেঘ-দত্যি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে। আরব্য উপন্যাসের হিংসুক প্রণয়ী দত্যির মত তার শাহজাদীকে লুকিয়ে রাখে সে। 'কাঞ্চন' শেষবারের মত দু'একবার উঁকি মেরে ঝুঁকে পড়ে মেঘের কোলে।

আমিও এইবার উঠে পড়ি।

একদিন হ'লো কি,—শুনুন।

বোধ করি সেদিন বারোটা একটা বেজে গ্যাচে। ক্ষিধের চোটে পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার যো। উদরগহ্বরে কিছু না দিলে স্বাস্থ্য নিবাসে ফিরে যাবার মোটেই তাকত নেই। ট'লতে ট'লতে কোনও রকমে পার্ক থেকে নেবে এলুম। এবং ঠিক নীচেই 'সিংহমারী নর্থ পয়েন্টের' যে রাস্তাটি 'বার্চ্চহিল' ঘুরে 'লেবং স্পার'-এর দিকে চলে গ্যাচে তারই ধারে একটি দোকান দেখতে পেলুম। খুব নিকটে অন্য কোনও বাড়ীঘর নেই। একজন পাহাড়িয়ে মেয়ে দোকানে বসে। মেয়ে বলতে ছোট্ট খুকী বা কিশোরী নয়। আন্দাজ, সতেরো আঠারো হবে। স্বাস্থ্যবতী। দোকানে রয়েচে বেশীর ভাগ ফলমূল, নারেঙ্গী, পাঁপলোস, কলা, বাদাম এবং এই রকম আরও দু'একপদ। ভাজা ভুজোও রয়েচে কিছু কিছু। এই নিয়েই পসারিণী পসার খুলে ব'সেচে।

কিন্তু এবার মুস্কিল হ'লো, যে জিনিসটি চাই, কি তার নাম আর কি তার দাম, যুবতীকে জানাই কি করে? সবে ক'দিন হ'লো এসেচি। নেপালী, ভুটিয়া, বা অন্য কোন পাহাড়ী ভাষা জানিনে, কাজ চালাবার মত প্রয়োজনীয় শব্দাবলীও শিখিনি, প্রয়োজনও হয়নি। এসে অবধি খাচ্চি তো স্যানিটারিয়ামে। বাইরে খাবার দরকারও হয়নি। আজই এই প্রথম সম্পূর্ণ বাইরের ধাক্কায় প'ড়েচি। আর এই পাহাড়ী মেয়ে। এও নিশ্চয়ই বাংলা, ইংরাজী, উর্দ্দু জানে না। কাজেই বোবার মত ইশারা ছাড়া উপায় কি?

আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলুম, 'চারটে কমলা লেবু দাও।' পেলুম। ইশারা কোরে দামও জানতে চাইলুম। তাও জানা হ'লো, —'দু'আনা।' ফেলে দিলুম পয়সা তার সামনে। দুই বোবাতে বেশ কথাবার্ত্তা হ'য়ে গ্যালো। ভাষা কি শুধু মুখেরই আছে? হাতের পাঁচ আঙ্গুলের কি নেই? নইলে মুখের শত কথায় যা না হয় এক তর্জ্জনী সঙ্কেতে অনেকেরই তাই হ'য়ে থাকে, যারা তর্জ্জনীকে কথা বলাতে জানে।

স্যানিটারিয়ামের পানে চলি আর কমলা খাই। কে আমাকে চেনে, আর আমিই বা কার তোয়াক্কা রাখি যে লজ্জা ক'রবো।

কমলা চা'রটি বড্ড—বড্ড মিষ্টি লা'গলো। এ কমলার গুণ, কি দোকানের গুণ, না দোকানীর গুণ, কিম্বা আমার জঠরের আগুনের গুণ, তখনো ঠিক ষোল আনা বুঝতে পারিনি।

একত্রে সব ক'টিরই গুণ হবে হয়তো। দার্জ্জিলিং পৌঁছেই আব্বাকে পৌঁছা সংবাদ দিয়েছিলুম। আজ আবার আব্বাকে লিখলুম, "আব্বা, আপনার উপদেশ মত হর রোজ ফলমূল খাই। বাস্তবিকই এখানকার হাওয়া পানির গুণ ভালো।"

তিন

বার্চ্চহিল পার্কে যাওয়া তো আমার কামাই নেই,—সে তো আগেই ব'লেচি। আজও গেল্লুম, এবং ঠিক সময়ে ক্ষিদেও পেলো। অতএব আবার আমাকে যেতে হ'লো সেই দোকানে। গতকাল কার দোকানী আজও দোকানে। হাতে প'শমী সুতোর কাজ। আবার হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা, 'কমলা চাই।' হাতের সূতো হাতেই রইলো। আমার পানে মুখ তুলে চাইলে সে। এবার তার পাতলা দু'টি ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি বিদ্যুতের মত ঝলক ;মেরে উঠলো। এবং পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস ক'রলে, "বাবুজী, আপনি 'নীচু' (Plain সমতল ভূমি) থেকে নূতন এসেচেন,—না ?" বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে ব'ললুম, "হাঁ, কিন্তু তুমি তো বেশ বাংলা ব'লতে পারো ?" স্মিত হাস্যে সে জবাব দিলে, 'কিছু কিছু পারি।'

বললুম, "তবে কাল যে কথা বলোনি ?" এবার হাসিতে মুখখানা তার উদ্ভাসিত হ'য়ে গ্যালো। এবং বললে, 'মজা দেখছিলাম। কেমন কোরে একজন যোয়ান পুরুষ বোবার মত ইশারা করে তাতে ভারি আমোদ পাচ্ছিলাম। যে ভাষাতেই হোক একবার মুখ খুললে তো বুঝতাম আপনি বোবা নন। আপনার মত অনেক সুন্দর পুরুষও তো বোবা থাকে ?'

আমি বললুম, 'আর তুমিই বা কেন তোমার গোলাপ পাঁপড়ির মতো ঠোঁট দু'খানা কাল খোলোনি চাঁদ ? তুমি বাংলা জানো তাই বা আমি কি কোরে বুঝবো ?'

'বেশ তো। হিন্দুস্থানীই বলতেন, কি ইংরেজীই বলতেন ?'

বললুম, 'ওদু'টোও যে তুমি জানো তাই বা কি কোরে জানবো ?'

বললে সে, 'জানা আপনার উচিত ছিল। অন্য দোকানেও তো আপনি দেখেছেন পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ হিন্দুস্থানী মোটামুটী বলতে পারে। তা না হোলে যে তাদের কাজ কারবার চলে না। আপনারাই তো তাদের মূলধন।'

বললুম, 'দার্জ্জিলিং এসে অবধি এ দোকান ছাড়া অন্য কোনও দোকানে যাইনি। আর এসেচিও অল্প দিন হলো। আমার যা দরকার তা আমার স্যানিটারিয়ামের চাকররাই এনে দেয়।'

বললে সে, 'তারা কি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে ?'

ব'ললুম, 'তা প্রায় সব ক'টিই তো বলে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী—সব।'

সে ব'ললে, 'তাদের যে জা'নতে হয়। সেখানে সব রকমের লোকই আসে কি না। আর পাহাড়ীরা তাড়াতাড়ি কথাবাত্রার ভাষা শিখতে পারে।'

বললুম, 'তা যেন হ'লো। কিন্তু আমি যে বাংগালী—তাই বা কি কোরে বুঝলে ?'

ব'ললে সে,—'বাঃ, তা আর জানা যায় না ? হরদমই তো দেখছি সব জা'তের লোক। আমাকে দেখলেই কি পাহাড়ী ব'লে চিনতে কষ্ট হবে ?'

জোর দিয়ে—বললুম,—'নিশ্চয়ই কষ্ট হবে,—একশোবার। চা'র ধারে তো আরও পাহাড়ী মেয়ে দেখচি। তাদের মত তোমার গালের হাড় উঁচু নয়, চোখ ছোট নয়, নাক বেঁটে নয়। শরীরখানিও এদের মত খাটো নয়। একেবারে বর-বপু বলা চলে।'

এখনো আমার ধারণা উঁচু বাংলা সে জানে না। তাই একেবারে 'বরবপু' কথাই ব্যবহার ক'রলুম।

ব'ললে সে, 'তার কারণ এই সব ভুটিয়া লেপচাদের জা'ত আর আমাদের জা'ত এক নয়। আসলে আমরা নেপালী। কয়েক পুরুষ আগে আমরা এখানে বসবাস শুরু করি। নেপালীদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে, ব্রাহ্মণ, ঠাকুরী, ছেত্রি, নেওয়ার, কামী, সরকী এই রকম। এদের গড়ন উন্নত। এরা আর্য্য। জাতিতে আমরা ঠাকুরী।'

'ও, তাই তো তুমি ঠা'কৃরুণ হোয়ে বসে আছো।' তরল পরিহাসের সুরে বলে ফেললুম কথাগুলো। কি হবে সঙ্কোচ কোরে ? হাজারো হোক, তবু তো পাহাড়ী অশিক্ষিতা। তার কমলা লেবুর মত লাল মুখখানা আরও এক পোঁচ লাল হোয়ে গ্যালো, যাকে সাধু বাংলায় 'লজ্জারুণ' বলে।

তারপর ব'ললুম, 'আচ্ছা, বাংলা তো জানোই দেখচি। লেখাপড়া কিছু শিখেচো ?'

মিঠি মিঠি হাসির সঙ্গে ব'ললে সে, 'কিছু কিছু।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'তবু কতটা ? তোমাদের পাঠশালা আছে এখানে ? কোন শ্রেণী পর্য্যন্ত প'ড়েচো ?'

সেই হাসি। ব'ললে, 'দু'চা'রটি আছে বৈ কি। সেও আপনাদের মত দরদী বাংগালী আর মিশনারীদের দরদে।

'ও। কিন্তু তুমি নিজে কতটা পড়াশুনো ক'রেচো সে তো ব'ললে না ?'

ব'ললে সে, 'আমি ? কতো আর। আপনাদের বাংগালী মেয়েদের তুলনায় কিছু নয়। মহারাণী গার্লস্ হাই স্কুল থেকে বাংলা নিয়ে কোনও রকমে ম্যাট্রিক্ পাশ কোরেছি।'

অ্যাঁ! বলে কি ? আমি তো আটাশ্। এ যে বর্ণ-চোরা আঁব!

এতক্ষণ তো এর সম্বন্ধে যা ভেবেচি তো ভেবেচি, আর যা ব'লেচি তো বলেচি। ঠাট্টা মস্করার তো অন্ত করিনি। এখন করা যায় কি ? নিজেকে সংযত ক'রবো ? না চালিয়ে যাবো ? আমাকে থ' মেরে চিন্তাযুক্ত দেখে মুচকি হেসে সে ব'ললে 'চুপ মেরে গেলেন যে। কই কমলা তো খাচ্ছেন না ? নিন্। পেটকে উপোস রেখে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজানো যায় না। খান আর গল্প করুন।' কমলার ঝুড়ি আমার দিকে এগিয়ে দিলে। তার মুখে চোখে কৌতুক হা'সচে।

'কি ?—খোসা ছাড়িয়ে দেবো ? না একাই ছাড়াতে পারবেন ?' ব'লে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হা'সলে। আমোদের অভিব্যক্তি।

আমার দ্বিধা কেটে গ্যালো। এবং আমিও ছা'ড়লুম না। ব'ললুম, "উঁহু, অত জোরই আমার আঙ্গুলে নেই।" ভাবখানা এই যে দেখি কি হয়। সে হেসে উঠলে এবং ব'ললে, "তাহ'লে একটু সবুর ক'রতে হয়। তবে পেট মা'নবে তো ? বোধ করি একটা দেড়টা বাজে।"

ব'ললুম, "তা যতই বাজুক। পেটে প'ড়লেই পেট থা'মবে। কিন্তু পিঠে না প'ড়লেই খুশী।"

ব'ললে হেসে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার পিঠ পিঠার মতো লোভনীয় নয়, কিম্বা পীঠস্থান নয় যে তীর্থ যাত্রীরা ভীড় ক'রবে। আপনি অথিতি।'

ব'ললুম, 'বাঁচলুম। কারো'পর নির্ভর ক'রতে পারাটা বড় আরামের। তবে অথিতি ব'লে গ্রহণ করাটায় বিপদ আছে।'

কৌতুক জিজ্ঞেসায় ভ'রে উঠলো তার মুখ। ব'ললে, 'কি বিপদ? বিপদ আবার কি?'

ব'ললুম, 'যে তিথি নক্ষত্র বিচার না কোরে হুড়্‌মুড়্‌ কোরে ঘাড়ে চাপে সেই-ই তো অতিথি।'

ব'ললে সে, 'বেশ তো। আপনিও তাই চা'পবেন।'

ব'ললুম, 'চাপ্‌ সইবে তো?'

ব'ললে, 'ছাখা যাবে। চা আনি আর কমলা। এত বেলায় শুধু কমলা দিই কি কোরে।' ব'লে উঠে দাঁড়ালে এবং দু'এক পা বাড়িয়েই আমার মুখো ফিরে ব'ললে, 'হ্যাঁ ভাল কথা। জঙ্গলী পাহাড়ী মেয়ের হাতে চায়ে আপত্তি নেই তো? জেনে নেওয়া ভালো, পরে অপমান হওয়াটা ভালো নয়।'

ব'ললুম, 'উঁহুঁ। আমি বামুন ঠাকুর। পাতি বামুন। পাহাড়ী পুরুষের হাতে সব খাই। কিন্তু পাহাড়ী মেয়েদের ছোঁয়া কমলা পর্য্যন্ত নয়।'

"বটে? আচ্ছা।" ব'লে হাসির কুঙ্কুম ছড়াতে ছড়াতে চ'লে গ্যালো। খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে ব'ললে, 'বামুন ঠাকুর, ওখানে নয়। আমার জায়গার। ততক্ষণ দোকানদারী করুন। ও বিদ্যেটাও শেখা হোয়ে যাক।' তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলো। ব'ললুম, 'দোকানদারিটা সব জায়গায় ভাল নয় ঠাকরুন। তা না হয় হ'লো। কিন্তু দাম ব'লে দিয়ে যাও।' যেতে যেতে ব'ললে, 'দামে কাম কি? উপযুক্ত খদ্দের পেলে যা খুশী মূল্যে দিয়ে দেবেন।'

শুনতে পায় এরূপ উচ্চে ব'ললুম, 'দোকান তাহ'লে একদিনেই ফতুর কিন্তু।'

সেও তেমনি কিছু দূর থেকে জবাব দিলে, 'দোকানদার হারিয়ে না গেলেই হ'লো। আবার দোকান গুছে উঠবে।'

আর কথা চলে না। সে তখন একদম বাড়ীর ভেতরে। কাঠের বাড়ীঘর। উপরে টিন। তবে বেশ ছিম্‌ছাম। সামনে রাস্তা। বিপরীত পাশে, পশ্চিম দিকে ঢালু পাহাড়ের কেনারা। সেখান থেকে কাঠ পুঁতে উপরে এনে, সমান কোরে কাঠ দিয়ে সাজিয়ে মেজে তৈরী করা। সবশুদ্ধ তিনটি ঘর। দোকান বাইরের ঘরের দক্ষিণ পাশে। উত্তরাংশের কুঠরীতে সাধারণ একটি

টেবিল ও খান কয়েক চেয়ার পাতা। এই কুঠরীর ভেতর দিয়েই বাড়ীর ভেতরের পথ।

দোকানের সামনের টুলে ব'সেছিলুম। এবার উঠে গিয়ে ব'সলুম ঠিক তার জায়গায়। সেখানে একটি পুরানো পশমী কম্বল পাতা। শরীরের ভেতরটা যেন কেমন শির্ শির্ কোরে উঠলো।

হটাৎ একি প্রাণে জোয়ার এলো। পরিহাসে যার শুরু, পরিণাম তার কোথায়? প্রাণের ভেতরে এত কথা, এত আনন্দ লুকিয়ে ছিলো তাতো জানতুম না। দু'একটি হাল্কা পরিহাস, মনকে হাওয়ায় উড়িয়ে এক নূতন জগতে নিয়ে যেতে পারে এ অভিজ্ঞতা তো আমার এতদিন হয়নি? একেবারে মুখচোরা না হ'লেও এতটা বাক্‌চতুরও তো কোনদিন ছিলুম না। আজ কেমন কোরে কি হোয়ে গ্যালো? কোন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আমার অবচেতন মনের মানুষ উল্লাসে জেগে উঠলো? এত উল্লাস, যে তাকে ধ'রে রাখাই আমার পক্ষে দায়।

"বামুন ঠাকুর, পেন্নাম হই শ্রীচরণে। দাসীর কিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ কোরে কৃতার্থ করুন।' ব'লে সামনে এসে রেখে দিলে সে ডিমের অম্‌লেট্, খোসা ছড়ানো কমলার একরাশি কোষ, বাদাম পেস্তার হালুয়া, আর কেৎলিতে চা। মানুষের কথাও কি এত মিষ্টি হয়? আর দুনিয়ার সব মিষ্টির চেয়ে বড় মিষ্টি মানুষ, তাও টের পেলুম এই প্রথম।

ব'ললুম, "ইস্। ঠাক্‌রুণ, এ্যাতো ক্যানো?"

"আর লজ্জা দিয়ে কাজ নাই। হাত ধোন্ তো। আমি হাতে জল ঢেলে দিই।"

নিরীহ মেষশাবকের মত তার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে দিলুম। তারপর খাওয়া শেষ হোলে সে ব'ললে, 'তা দোকানদারবাবু, ঐ চা'রটে কমলার দাম কত?'

আমি ঠোঁট বন্ধ কোরে হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা কোরে জানালুম—দু'আনা। সে এবার খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লে, সর্ব্বনাশ্। সে হাসিতে ঝন্‌ঝন্ কোরে বেজে উঠ্‌লো আমার বুকের ভেতরটা।

ব'ললে সে, "হোয়েচে, হোয়েচে, ঠোঁট খুলুন। এই নিন্ কা'লকের দু'আনা পয়সা।" ব'লে সত্যি সত্যি একটি দু'আনী আমার পকেটে গুঁজে দিলে। আমি কিচ্ছু ব'ললুম না।

ব'ললে এবার, "দোকানদারবাবু, খ'দ্দের কি এতক্ষণ কেউ জুটেছিলো ?"

ব'ললুম, ''না ঠা'করুণ, তোমার কৃপায় কেবলই বৌনী ক'রলুম। খদ্দেররা মানুষ চেনে।''

ব'ললে,—"আপনি বোধ হয় চিনতে পেরেছিলেন ?''

আবার সেই হাসি। পাহাড়িনী হা'সতে জানে।

আমিও হাসলুম।

তারপর ব'ললুম, "এবার ভাগ্যবানের ভূরি ভোজন তো হ'লো। কিন্তু তোমার নাওয়া খাওয়া ? দেড়টা দু'টো তো শুধু আমারি জন্যে বাজেনি ?''

সে হেসে,—"না। তা নয়। এই ঠাণ্ডা কৈলাসে নাওয়াটা প্রশ্ন নয়। তবে খাওয়ার প্রশ্নটা সমতলের চেয়ে ঢের বেশী। আমার জন্যে চিন্তা নাই। পেটটি আমার বেশ ঠাণ্ডা আছে।''

বললুম, "তার কারণ—বোধ হয় এই যে, আমার রাক্ষুসে খাওয়া দেখে তোমার খিদে ভয়ে কৈলাস ছেড়ে পালিয়ে গ্যাচে। কিম্বা আমার খাওয়াতেই তোমার খাওয়া হোয়ে গ্যাচে। কিম্বা ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং।

হা-হা-হা-হা। আবার প্রাণ খোলা হাসি।

তারপর ব'ললে, "তাহ'লে বাকী অর্দ্ধেকটা কেমন কোরে পুরণ-হবে ?"

বললুম, "বাকী অর্দ্ধেকটা আজকের মত ফাঁকি। তবে আমার সঙ্গে গল্প কোরে পুরণ-ক'রতে পারো।''

সে ব'ললে, "তাই তো হ'চ্ছে। অর্দ্ধেক নয়,—ষোল আনা। বাস্তবিকই এত আমুদে মানুষ আপনি। এ রকম মানুষ জীবনে দেখিনি আমি।''

ব'ললুম, "তাহ'লে আমি অদ্বিতীয়ম্ বলো ? আমার নজির আমি ?''

সে,—"ঠিক তাই।"

বললুম,—"সবাই কিন্তু তাই। বিশ্বের সাড়ে তিন শো কোটী মানুষ কেউ কাউরি মতো নয়। তবে তুমি সেই সাড়ে তিন শো কোটি থেকেও আলাদা। পুরাণে নাকি খবর আছে, মর্ত্তবাসী মরণশীল ছাড়াও সাড়ে ছত্রিশ কোটি অমৃত লোক বাসী কারা আছেন যাঁদের লীলাখেলা বুঝা ভার। হে কৈলাস বাসিনী গৌরী, তুমি বোধ হয় তাদেরই একজন।"

সেও তেমনি সুরেই ব'ললে, "আর কৈলাসে অবস্থানকারী হে হরহর মহাদেও, আপনিও সে তালিকা থেকে বাদ পড়েন না।"

কথার আর শেষ হয় না। মনও চায় না শেষ ক'রতে। আর যে হারে চ'লচে তাতে শেষ হ'বে ব'লেও মনে হয় না। কবির তর্জ্জা,—'কেহ নাহি আঁটে কারে, সমানে সমান।' কিন্তু শেষ তো হ'তে হবে? ওদিকে বেলা যে প'ড়ে এলো।

তাই আনন্দে নয়, নিরানন্দে প্রস্তাব ক'রলুম, "গৌরী, দিনটিই শেষ হ'লো আজ তোমার ডেরায়। এখন উঠে পড়ি। কেমন?"

জবাব দিলে সে, "এখন খুব আফছোছ হ'চ্ছে—না? হয় তো দিন ভর কত পড়াশুনো,—কত কি ক'রতেন।"

ব'ললুম, "না, ওসব নয়। এখন একটি বড্ড মজাদার নূতন বই পে'য়েচি। রসও পা'চ্চি খুব। যা কোনও মানুষের কেতাবে পাইনি। কিন্তু তবু সময়কে তো মা'নতে হবে?"

এতক্ষণের হাসি মুখ তার কোথায় যেন লুকিয়ে গ্যালো। ভারী মনে ব'ললে সে, "আচ্ছা, আসুন তবে। আবার আ'সবেন তো?"

ব'ললুম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই আমার পথ,—আমার স্বাস্থ্য ফিরে পাবার পথ। কা'ল আবার দেখা হবে।"

এর পর পিছন ফিরে চেয়েচি একবার। তার চোখে যা দেখেচি আর কারো চোখে দেখিনি তা।

—:—

চা'র

রাস্তা চ'লচি আর ভা'বচি। হঠাৎ এক দিনের ভেতরে আমার কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হোয়ে গ্যালো। বাইরের নয়, ভেতরের। বই কেতাবে প'ড়তুম, নারী ছলনাময়ী, এবং এবম্প্রকার মন্তব্য আরও আরও। কিন্তু কোনও যুক্তিই মন আজ মা'নতে চায় না। বিবেক আমাকে শাসায়, 'ওরে বোকা, ওরে ভেড়া, তুই আনাড়ী,—অনারী, নারী জ্ঞানহীন। আর তুই গেচিস্ কাঁচা ডাক্তার হোয়ে সমস্ত

নারীর নাড়ী টিপ্‌তে ? পাহাড়ী মেয়েরা স্বাধীন। এরা গল্প সল্প কোরেই থাকে। হেথাকার বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে সে পড়েচে, খুব মিশেচে। সুযোগ পেলে কিশোরী যুবতীরা একটু ফ্লার্টও কোরে থাকে। কিন্তু তাই বোলে তুই যে একেবারে আকাশে উদ্যান রচনা ক'রচিস। হৃদয়ের আবেগকে বল্গাহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া অত ভালো নয়।'

ভাবলুম, শুধু বিবেকের নিরস যুক্তি নিয়ে দুনিয়া কোনও দিন সরস হোতে পারেনি, বড়ও হোতে পারেনি। এই রুক্ষ কষ্টের দুনিয়া থেকে মানুষকে উদ্ধার কোরেচে কল্পনা আর আবেগ। প্যাণ্ডোরার বাক্সে নিবদ্ধ বড় হরফের 'আশা,' কল্পনা ও আবেগে মেশানো। পাহাড়িনীর সঙ্গ সুখ ও বাক্‌সুধা যদিও ছলনাময় ও সাময়িক হয়, হোক্। তবু তো আনন্দ। ওমর খৈয়ামের মত তাকেই আমি হেথাকার আমার নিঃসঙ্গ জীবনের পরম প্রসাদ ব'লে মেনে নেবো।

যতই চিন্তা করিনে কেন পাহাড়িনীর চিন্তা যে কিছুতেই আমি ছা'ড়তে পারিনে। সব যুক্তি, সব চিন্তা ছাপিয়ে তার মুখ, তার কথা, তার হাসি মধু ঢেলে দেয় আমার প্রাণে। মনের পটে যুক্তি তর্কের ধারে হাসিখুশী মাখা মুখ নিয়ে উঁকি মারে সে। আর শুধু চোখের ভাষায় চ্যালেঞ্জ দেয়, "কই, ভোলো দিকিন আমাকে ?"

না, সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি পরাজিত। ভুলতেও চাইনে তোমাকে।

এমনি চিন্তার মাঝে পৌঁচে গেলুম স্বাস্থ্য-নিবাসে।

আমার রুম্ মেট্ পরেশ মজুমদার হাওড়ার লোক। ক'লকাতার চাকুরে। জায়গা ও হাওয়া বদ্‌লাতে মাস কয়েক হ'লো এসেচেন এখানে। আমার মত তিনিও ক'লকাতার স্কটিশ্ চার্চ্চের ছাত্তর। তবে বছর পনেরোর আগের। বয়সও তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। সঙ্গে এনেচেন একগাদা ধর্ম্মগ্রন্থ, আর মাসিক পত্রিকা। তাই ব'সে ব'সে পড়েন বেশীর ভাগ। সকালে বিকেলে মল চৌরাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসেন, বড় জোর মার্কেট স্কোয়ারে যান। দুপুর বেলা পাশের কামরায় তাসের চাটি পড়ে। সঙ্গী পরিতোষ বনিক, হৃদয় অধিকারী আর ভবেশ মুখুজ্যে। ওঁরা প্রায় সবাই সমবয়সী। কম বয়সী ব'লতে আমি।

পরেশ মজুমদার লোক ভালো। সকালে বিছানা ছা'ড়বার পর পরই বার কয়েক সুর কোরে নাম কেত্তন করেন,

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

এবং বিছানায় শুতে যাবার সময়ও তাই। তার পরেই নাক ডেকে গভীর নিদ্রা।

প্রথম দিন পরিচয় নিলেন,—

"খুলনা বাড়ী?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখানে কি বেড়াতে? ক'দিন থাকা হবে?"

"স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন ক'রতে। যতদিন লাগে।"

"কি করা হয়?"

"এবারে ক'লকাতার স্কটিশ্ চার্চ্চ থেকে বি-এ দিয়েচি।"

"ও-ও, তাই নাকি? আহে, আমিও যে ঐ গোয়ালেরই বলদ। তা'হলে তো দেখচি তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতই হ'লে।"

"আজ্ঞে, আমি আপনার ছোট ভাই।"

সেই থেকে আমি তাঁর ছোট ভাই হোয়েই রইলুম। দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে তিনি আমাকে ওয়াকিফহাল করেন,—মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন ও আমি নিই। একটু সমীহ ক'রেও চলি যদিও পরেশদা ব'লে ডাকি।

আজ স্বাস্থ্য নিবাসে ঢুকতেই দেখলুম তিনি বারান্দায় ব'সে আলবোলায় তাম্রকুট রূপ মহাদ্রব্য সেবন দ্বারা টানে টানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমান পূণ্য অর্জ্জন ক'চ্চেন। কেননা রসিক চুড়ামনি পরেশদাকে এই চুরুট সিগারেটের যুগে বেশী হুঁকো খাওয়ার কেউ উল্লেখ ক'রলেই, তিনি হাত নেড়ে নেড়ে আওড়াতেন,

"তাম্রকুটং মহাদ্রব্যং সেবনে চ মহৎ ফলম্
অশ্বমেধ সমং পূণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি।"

এ হেন পরেশদা আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই জিজ্ঞেস ক'রলেন, "ওহে ছোকরা, এখন বাজে ক'টা?" হাত ঘড়ি হাতেই বাঁধা। কিন্তু লজ্জায় তাকাতে পা'রলুম না।

ফের ব'ললেন, "হ্যাঁ হে, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? সেই সাত সকালে বেড়িয়ে গেচিস্। তোর কি খেতে শুতে হয় না? ওদিকে দু'দিন ধ'রে ভাতগুলো নষ্ট হ'চ্চে;—ম্যানেজার ব'লছিলেন সে কথা।"

চুরি ক'রতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেচি যেন। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ধাঁ কোরে জবাব দিলুম, "দাদা, দার্জ্জিলিং-এ আমি নূতন এয়েচি কিনা। ঘুরে ফিরে দেখে আর সাধ মেটে না। যতই দেখচি ততই যেন নূতন লা'গচে। তাই তো পরেশদা, লোকে তো ঠিকই বলে, মানুষের তৈরী জিনিসে দু'দিনেই অরুচি ধরে। আর খোদার তৈরী জিনিস নিত্যি নতুন।"

ধর্ম্মভীরু মানুষ তিনি। সায় দিয়ে বল্লেন, 'তাতো বটেই। আজ কতদূর গেছ্লি?'

ব'ল্লুম, 'সেঞ্চল হ্রদ দেখতে।'

তিনি,—'সে তো অনেক দূর। কি কোরে গেলি এলি?'

আমি,—'খানিকটা পায়ে হেঁটে, খানিটা রিক্সায়।'

তিনি,—'রিক্সা কত ভাড়া নিলে? শুনেচি অত দূরে তো রিক্সা যায় না।'

সর্ব্বনাশ। এ যে উকিলী সওয়াল।

বল্লুম, 'আমি তো চিনিনে। শেয়ারও কাউকে পেলুম না। কাজেই এই তিব্বতী, ভুটিয়া রিক্সাওয়ালা ব্যাটাদেক খোষামোদ ক'রে পঁচিশ টাকা দিয়ে রাজী করি।'

তিনি,—পঁচিশ টাকা! বলিস্ কিরে? আমারই এ তক্ সেথা যাওয়া হয়নি। একবার যাব ভাবছিনু। তা আর যাওয়া হ'লোনি। অত টাকা! তা দেখলি ক্যামন্?'

এই সেরেচে রে! আর রক্ষে নেই। আমি কি জানি এ ব্যাটা ব'সে ব'সে হুঁকো টা'নবে, আর এত খবর জিজ্ঞেস ক'রবে? হাওড়ার লোক,—সময় কা'টতে না চাইলে গল্প নিয়ে বসে। তার চেয়ে দ্যাখা কোনও একটা জায়গার কথা ব'লে দিলেই হতো। কিন্তু তাহ'লে যে লম্বা দিন-ভর সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। আল্লার নাম কোরে দিই ব'লে একটা, লাগে তাক্ না লাগে তুক্।

হ্রদ জিনিস। নিশ্চয়ই চিল্কা, উলারের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। বললুম, 'সে এক বিরাট বিশাল সমুদ্দুর বিশেষ, পরেশদা। তা প্রায় ১০/১২ মাইল জুড়ে তো হবেই।'

পরেশদা ব'ল্লেন, 'উঁহুঁ, তাতো না। শুনেচি নাকি আমাদের দেশের একটা বড় দিঘির সমানও নয়। আমাদের পরিতোষ সব জানে। ও দেখে এয়েচে। হ্যাঁ হে পরিতোষ, ও পরিতোষ....'

হাঁ'কতে লাগলেন। আমি তাড়াতাড়ি ব'ল্লুম, 'কি জানি বাপু। আমার একটু দূর থেকে দেখা। একেবারে নিকটে তো আর যাইনি। আমার তো ঐ রকমই মনে হ'লো। ভুলও হোতে পারে।' ব'লেই পায়খানা যাওয়ার বাহানা ক'রে স'ড়ে প'ড়লুম এবং পায়খানায় মিছিমিছি অনেকক্ষণ কাটালুম। পায়খানার দরজা একটু একটু ফাঁক কোরে নজর করি পরেশ মজুমদার তখনো দাওয়ায় ব'সে হুঁকো টা'নচেন কি উঠে গ্যাচেন। যখন দেখলুম ওভার কোট গায়ে জড়িয়ে হাতে ছড়ি নিয়ে বেড়িয়ে প'ড়লেন বৈকালীন ভ্রমণে, তখন বেড়িয়ে এলুম পায়খানা থেকে। বাব্বাঃ, কিছুক্ষণের জন্যে বাঁচা গেলো লজ্জার হাত থেকে।

তারপর ধপাস্ কোরে বিছানায় শুতেই লজ্জা চম্পট দিলে এবং হাজির হ'লো সুখ চিন্তা। কি এমন কোরেচি? অমন হোয়েই থাকে। ভালোবাসার পাত্রীর জন্যে মানুষ এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী কত কি করে। আমি তো লজ্জা ঢা'কতে সামান্য একটু ছলনা ক'রেচি মাত্র। তা হোক। তবু আমার পাহাড়িনীর, আমার গৌরীর স্মরণ কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে পারিনে মন থেকে। মশগুল হোয়ে গেলুম সুখ চিন্তায়। এতক্ষণ হয়তো গৌরী আমারই মতো, আমি যেমন তাকে, সেও তেমনি আমাকেই চিন্তা ক'রচে। এ-কাজ ও কাজ ক'রতে গিয়ে সব ভুল হোয়ে যাচ্চে। রান্না তার কে করে জানিনে। সে নিজে যদি রান্না করে, হয়তো আজ নূনের বদলে দেবে চিনি আর তেলের বদলে দিবে পানি তরকারীতে। বাড়ীতে যদি অন্য কেউ থাকে তাহ'লে বকুনী দেবে তাকে এই আন্‌-মনার জন্যে। হয়তো পশমী সোয়েটার বুন্‌তে গিয়ে ক্রুশে কাঁটা বিঁধবে তার চাঁপা কলির মত আঙ্গুল। ঝ'রে প'ড়বে গাঢ় কমলার রসের মত রক্ত। কিন্তু যদি তার স্বামী থাকে? থা'কতে পারে তো? হয় তো সে অন্য কোনও খানে চা'করী ক'রতে গ্যাচে। ফিরে এসে দু'জনে মশগুল্ হবে ফায়ার প্লেসের ধারে হাসি মস্কারা নিয়ে। সেও

মনে মনে .... দুত্তোর্! অনেক কথাই হ'লো, এ সব জেনে নিলুম না কেন? কা'ল তো একবার যাবোই এবং সকলের আগে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেবো খরব গুলো।

ঘরে কখন সাঁঝের বাতি জ্ব'লে উঠেচে টের পাইনি। কখন ঝাড়ুদার ঘর ঝাঁট দিতে এসে আমার অসংলগ্ন জুতো জোড়ার তলাকার ধূলি কাদা ঝেড়ে ঝুড়ে সংলগ্ন অবস্থায় রেখে গ্যাচে তাও জা'নতে পারিনি। কিন্তু একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর যখন 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' মধ্যম স্বরে গাইতে গাইতে ঘরের দাওয়ায় উঠেচেন তখন আর অজানা রইলো না। ধড়্মড় কোরে তাড়াতাড়ি বিছানায় ব'সে, সামনের টেবিল থেকে একখানা বই নিয়ে, প্রথম খুলতেই যা পাওয়া গেলো, যেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে প'ড়তে লাগলুম। বুঝতেই পেরেচেন, এ শুধু বিকেলের লজ্জা ঢা'কবার চেষ্টা। দেখি পরেশদা আর কি বলেন।

"কি হে ছোক্‌রা, কী বই প'ড়চিস?" ব'লতে ব'লতে হাতের ছড়িখানা রেখে দিলেন তাঁর টেবিলের ধারে, আর ওভার কোট্ রা'খলেন ব্র্যাকেটে। র‍্যাপার জড়ালেন গায়ে। এইবার জুতো খু'লে, বিছানার উপর ভালভাবে ব'সে, লেপের একাংশ পায়ে মুড়ি দিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে কথা জুড়লেন,

"তারপর?"

আমার বুকখানা ধড়াস ধড়াস ক'রছিলো। এইবার আবার পরিতোষ বাবুকে ডেকে, সেঞ্চল হ্রদের পরিধি নিয়ে, মোকাবিলা ক'রবেন নাকি? খোদা র'ক্ষে করুন, তা তিনি ক'রলেন না। তাঁর জিজ্ঞেসা সূচক,

"তারপর?" শুনেই মুখ তুলেই তাঁর পানে চাইলুম। তিনি বল্লেন, "তারপর বাড়ীর খবর কি বল। বাড়ীর কোনও চিঠি পত্তর আর পেয়েচিস?"

বাঁচলুম। ব'ললুম, "পরশু এক চিঠি পেয়েচি, পরেশদা। সব ভালোই।"

পরেশদা—"আচ্ছা। কিন্তু তুই এলি শরীর মনটাকে সারাতে। তার ঠিক সময় মত তো তোর খাওয়া ও বিশ্রাম চাই। নইলে শরীর ভাল হবে কেমন কোরে?

ব'ললুম, "দার্জিলিং দেখে দেখে আমার খুব আনন্দ হ'চ্চে। হোটেলে ফিরতে মন চায় না। আব্বা ব'লে দিয়েছিলেন "খুব কমলা খাবি। রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে খুব কমলা খাই। যখন একটু ক্লান্ত হোয়ে পড়ি কোনও এক জায়গায় ব'সে

জিরিয়ে নিই। শরীর সারাতে মনের আনন্দই আসল কথা। নয় কি পরেশদা? নইলে দেখুন না, ক'দিনেই শরীরের রং আমার অনেক ভালো হয় নি?

পরেশদা,—"তা তো হ'য়েচে। আরে, দেহের রং তো তোর এমনিই উজ্জ্বল। নবাব-পুত্তুর মার্কা। তবে পাহাড়ীদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু হুঁসিয়ার হোয়ে চলিস। এরা শান্তও যেমন আবার রেগে গেলে ফিয়োসাচ্‌ও হয় তেমন। এই সেদিন মার্কেট স্কোয়ারে এক শিখের পেছনে ছুটচে, না হলেও অন্ততঃ ৫০।৬০ জন পাহাড়ী। তাদের মেয়েরাও। সব শেয়ালের এক রা'। বলে 'ফাটাও মাথা।'

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "কি হোয়েছিলো কি পরেশদা?"

পরেশদা,—"আরে, শিখটাও শুন্‌লু পাজী। এক পাহাড়ী মেয়ে দোকান-দার্‌নী,—আর দোকান তো প্রায় ওরাই করে—বাজারে জিনিস পত্তর বেচচে। শিখটা বোধ হয় ভেবেচে যেহেতু সে শিখ এবং পাঞ্জাবী, এবং গায়ে জোরও আছে, তাই সে ব্যাটা মেয়েটির গায়ে রসিকতা কোরে হাত দিয়েচে। আর যায় কোথা। নিকটে ছিলো একটি বোতল। মেয়েটী পটাশ্‌ কোরে দিয়েচে মাথায় এক বাড়ি। এই নিয়ে এক মহাকাণ্ড,—হুলুস্থুল ব্যাপার।"

ব'ললুম,—"সে তো ভালোই হোয়েচে পরেশদা। শিখ-পুঙ্গব শিক্ষা পেয়েচে জন্মের মতো।"

পরেশদা, "আরে, যারা ঐ বংশের তাদের আবার শিক্ষা। তারা এখানে মা'র খাবে অন্যত্র মজা লুট্‌বে। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ' বুঝলি নি কথাটা?

আমি ব'ললুম, "তা তো বটেই। আমি এই সব জংলী পাহাড়ীদের সঙ্গে আদতেই মিশ্‌তে চাইনে। আর ভাষাও তো জানিনে।"

পরেশদা,—"আরে না, না। সবাই জংলী নয়। এখন এদের বহু ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষা পাচ্চে। এমন কি অনেক ছেলে মেয়ে ক'লকাতার কলেজেও পড়ে। এদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। এরা প্রকৃতির স্বভাব-দুলাল। প্রত্যেক পাখীর তো বটেই, এমন কি জঙ্গলের প্রত্যেক গাছ-গাছড়ার নামও মনে রাখে।

অবাক্‌ হোয়ে ব'ললুম, "তাই নাকি?"

পরেশদা, "হ্যাঁ। রাস্তায়, বাজারে, দোকানে, ট্রেনে মেয়েরা বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি সিনেমা ও রেকর্ডের গান কি বিশুদ্ধ ভাবে গাইচে,—শুনিস্‌নি?

ব'ললুম, "অতটা খেয়াল করিনি।"

—"পাহাড়ীরা বেজায় স্ফূর্তিবাজ। চিন্তা করে কম। তাই স্মৃতিশক্তি ভালো।"

—"গল্পচ্ছলে পাহাড়ীদের সম্বন্ধে বেশ একটা আইডিয়া আমার হোয়ে গ্যালো পরেশদা। আমি কৃতজ্ঞ।"

"আচ্ছা হোয়েচে। চল্ এবার ডাইনিং রুমে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে হে। দার্জিলিংএর হাওয়া বড্ড রাক্ষুসে। কিন্তু জল সম্বন্ধে দিন কতক সাবধান থা'কবি। তারপর স'য়ে গেলে আর কিছু না। নইলে 'হিল্ ডাইরিয়া' হোতে পারে।

পরেশদা এবারে বিছানা ছেড়ে উঠে ওয়েটার্‌দেক্ হাঁ'ক্‌তে লা'গলেন, "ওহে ও'ঝা'রতির পো-এরা ; খেতে দাও হে।"

আগেই ব'লেচি পরেশদার মন খুব ভালো। মনে প্রাণে ধার্ম্মিক বটেন, তবে ছোঁয়াছুঁয়ির গোঁড়ামি নেই।

তাঁর পাশেই খেতে ব'সলুম টেবিলে। খাবার সবই এলো। কিন্তু তার সঙ্গে এলো না প্রাণ ঢালা মমতা, সেবা। এ ক'দিন মন কিছুই বলেনি। আজ এই রাতেই প্রথম খুঁৎখুঁৎ শুরু ক'রলে। বোধ হয় তাই হোয়ে থাকে। কড়া মিষ্টির পরে হাল্কা মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায় না। গুড় খাবার পরে কঁ্যাঠাল (কাঁঠাল) আর ভালো লাগে না।

বিছানায় গিয়ে আর এক বিপদ। পরেশদা তো 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' শেষ কোরে নাক ডাকাচ্চেন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম কই? উস্‌খুস্ ক'রচি। বিছানা ফুটচে। এ পাশ ও পাশ ফির্‌চি। নাঃ, ঘুমের বাবার দেখা নেই।

পরেশদার কথা, পাহাড়ীরা বেজায় স্ফুর্ত্তিবাজ, আবার বড্ড হিংস্র। তা'হলে গৌরীও তো স্ফুর্ত্তির জন্যেই আমার সঙ্গে ছুটো মিঠে আলাপ কোরেচে। বন্ধু ভাবে না হয় আমোদজনক গল্প কোরেচে। একটু কৌতুক অভিনয়ও না হয় কিছু-ক্ষণের জন্যে হ'য়েচে। তা আজকাল স্বামী থা'কতেও শুনেচি অনেক ভদ্র ঘরের মহিলা অপর নায়কের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন– থিয়েটার সিনেমায়। সেখানে চোখের পানি নাকের পানি একাকার হোয়ে যায়। বাহু, বক্ষপাশে আলিঙ্গনাবদ্ধও হোয়ে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে কি অভিনয়ের নায়ক দানাপানি ছেড়ে, ঘুমকে

নির্ব্বাসিত কোরে. তার নায়িকার জন্যে হাহুতাশ কোরে ফিরবে? গল্প শুনেচি, পূর্ব্বে নাকি কামরূপ কামাখ্যার মেয়েরা অন্য দেশের পুরুষ গেলে ভেড়া বানিয়ে রা'খতো নিজেদের ছলাকলা দিয়ে। আমিও কি তাহ'লে ...... ? আর যদি তার স্বামীই থেকে থাকে,—তা আবার নেই, অত বড় সেয়ানা সোমথ মেয়ে,—তাহ'লে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রচি জা'নতে পেরে একদিন হিংস্র হোয়ে উঠবে। তারপর? তারপর একদিন আব্বা, আম্মা, বোনেরা, দেশের লোকেরা খবরের কাগজে জা'নতে পা'রবেন একজন শিক্ষিত যুবক দার্জ্জিলিং বেড়াতে এসে এই এই কুকাজ কোরে পাহাড়ীদের হাতে নিহত হোয়েচেন।

আর এক চিন্তা বলে, 'ছুত্তোর বাপু, তুমি অত ভীরু তো ওপথে এগুচ্চো কেনো? তুমি কাউকে ভালবা'সতে পা'রবে না। রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে বিপদ আছেই। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, 'Nothing unfair, in love and war' যুদ্ধে ও প্রেমে অন্যায় ব'লে কোনও কথা নেই। এনিয়ে কত আগুন জ্বলেচে ছুনিয়ায়। কিন্তু তাই ব'লে ছুনিয়া থেকে প্রেম প্রণয় জিনিসটি উঠেও যায়নি।

দার্শনিক পণ্ডিত বুড়ো বার্ট্রান্ড রাসেল্ তো সাফ্ ব'লে দিয়েচেন, "of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness." সব হুশিয়ারির মধ্যে প্রেমের ব্যাপারে সাবধানতা সত্যিকার আনন্দের পক্ষে মারাত্মক।

এমনিতরো কত—কত চিন্তা। শেষের দিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম কিছুটা হ'লো বটে, কিন্তু শরীরটা তেমন ঝরঝরে মনে হ'লো না। মনটাও বেশ খানিকটা ক্লান্ত।

——::——

পাঁচ

এত ঠাণ্ডা। তবু খুব সকালে উঠে প'ড়েচি। অন্য দিন সূর্য্য আমাকে দেখবার জন্যে বন্ধ জানালার আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মা'রতো। আমি আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়ে কুকুর কুণ্ডলী হোয়ে শুয়ে থা'কতুম। আমি যখন উঠতুম সূয্যি

মামা তখন আকাশের অনেক উঁচুতে। আর আজ যখন আমার সকাল হ'লো সে ব্যাটার ঘুমই ভাংগলো না। তার সকাল আর কত দেরীতে হবে? আনজুমানের মস্‌জিদে আজান প'ড়েচে সেই কখন। এতক্ষণ মুছল্লিদের নামাজ' তেলাওয়াত, অজিফা হয়তো সবই হোয়ে গ্যাচে। পরেশদা'র 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, শতের কোঠা পেরিয়ে কয়েক শতের কোঠায় প'ড়েচে, না শুনেও অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সূর্য্যি মামার দেখা না পেলে ভা'গনের দল রাস্তায় বেরোয় কি কো'রে? পাহাড়ে কি সে ব্যাটারও বড্ড শীত? পরেশদা'র নাম কেত্তন হোয়ে গ্যালো। ফি'রলেন আমার দিক্। "হ্যাঁরে, এত উস্‌খুস্ ক'চ্চিস্ কেন? ঘর বা'র ক'চ্চিস্, বারান্দার যা'চ্চিস্, পূবমুখো আকাশ পানে চাইচিস্, আবার বিছানায় এসে বস্‌চিস্। হোলো কি তোর? আর আজ এত সকালে উঠ্‌লিই বা কেন? এত সকালে তো কোনও দিন উঠিস্ না?"

"বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে, পরেশদা। কা'ল রা'তের তরকারিটা মোটেই মুখে দিতে পারিনি। ব্যাটা বাবুর্চি কী যে রেঁধেছে। ক্ষিদের জ্বালায় রাতে ভালো ঘুম হয়নি আমার। তাই তো সুয্যির দিকে ঘন ঘন চাইচি। সে আকাশের অনেক দূর না উঠা পর্য্যন্ত তো এই ব্যাটাদের বিছানা ছেড়ে উঠা হবে না। এ রকম নবাবী চাকর তো কোথাও দেখিনি পরেশদা

পরেশদা ব'ললেন, "তাই ব'লে কি তুই ব'লতে চা'স্ এ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশে ওরা রাত দুপুরে উঠবে? ও'দেরো তো মনিষ্যির শরীর? আর এত ভোরে উঠে ওরা ক'রবেই বা কি?

আমি ব'ললুম, "কেন? একটু চা কোরে দেবে। ব'ললুম তো আপনাকে তরকারির জন্যে কা'ল পেট পুরে খেতে পারিনি।"

পরেশদা একটু হেসে ব'ললেন, "কেন রে, তরকারি তো কা'ল ভালই রান্না কোরেছিলো? তুই কি আবার নিজের বাড়ীর মত রান্না চা'স এখানে?"

ব'ললুম, "চাইলেই আর পাচ্চি কোথা পরেশদা? তবে আপনি ব'ললে ওরা একটু জ'ল্‌দি জ'ল্‌দি চা কোরে দেয়।"

ব'ললেন তিনি, "আচ্ছা, উঠুক আগে। তারপর তো?"

"ঠিক আছে" ব'লে বেড়িয়ে চাকরদের ঘরে গিয়ে লেপ তুলে ফেলে ধম্‌কানি

দিলুম, "ব্যাটারা পাহাড়ে'ভূত, উঠ্‌বি কখন ?"

চোখ কট্‌মট্‌ কোরে তাকিয়ে ব'ললে একজন, "কি বাবু ? এখন কাা ডা'কছেন ?"

একটু নরম হোয়ে ব'ললুম, "সকাল সকাল একটু চা দিতে পারিস্‌ বাবা

ব'ললে, 'দুধ নেই।'

নাঃ, অধৈর্য্য হোয়ে এখানে সময় কাটাবার ছল কো'রলেই কি সময় কাটে সূর্য্যি ব্যাটার এখনও দেখা নেই। এ সময় রাস্তায় বেরুনো অস্বাভাবিক, অন্তত আমার পক্ষে। পরেশদা'ইবা কী ভাববেন। এত সকালে গিয়ে গৌরীর দেখাই মি'লবে তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর এমন সময়ে যাই বা কোন লজ্জায় সেই বা ভা'ববে কি ? তার উপর যদি তার স্বামী ঘরে থাকে তা'হলে ? সব দি বিবেচনা কোরে কাজ ক'রতে হবে তো ? পিতৃ-মা'রের কথাও চিন্তে কো'রতে হবে। তবু দৌড়ের ঘোড়াকে জোর কোরে বেঁধে রাখার মত অধৈর্য্য অবস্থা আমার।

অবশেষে ঘড়িতে সাতটা বা'জতেই বেড়িয়ে প'ড়চি। পরেশদা ব'ললেন, "আরে, কোথায় যা'স ? চা খাবিনি ?"

ব'ললুম, "রাস্তার কোনও এক দোকানে খাব। আমার আর পেট মা'নচে না।"

ব'ললেন তিনি, "এখনও তো কোনও দোকানে উনুনই ধরানো হয়নি।"

ব'ললুম, "যাই হোক গুড় মুড়ি, খই যা পাওরা যায়।" ব'লে রওযান দিলুম।

যাই কোথা ? কুয়াসার ভেতর দিয়ে দিয়ে চৌরাস্তা মলে গিয়ে ঘুরপাক দিতে লাগলুম। ক্রমে ক্রমে কুয়াসা দূর হ'লো। সূর্য্যি মামার দেখা পাওয়া গেলো। কিন্তু সূর্য্যির জন্যেই তো সূর্য্যির আমার দরকার নেই। আমার দরকা প্রয়োজন মত কিছুটা বেলার ; যে সময় স্বাভাবিক মত কোনও বন্ধুর বাড়ী গিে তার সঙ্গে দেখা করা অশোভনীয় না হয়।

অনিচ্ছুক মনটিকে টেনে নিয়ে গেলুম আমার সেই নিত্যিকার আস্তানায়, বার্চ্চাহীল্‌ পার্কে। কিন্তু আজ আর কাঞ্চনজঙ্ঘার কাঞ্চনী শোভায় মনই দিতে পা'রলুম না। আমার মন ছিলো শুধু বেলার দিকে, আর হাত-ঘড়ির সময়-মাপ কাঁটাগুলোর দিকে।

ন'টা বেজে গেলো। আর ধৈর্য্যকে মানাতে পারিনে। পার্ক থেকে না'ব্‌তে না'ব্‌তে নীচের দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখলুম গৌরীর দোকান খোলা। সে ব'সেচে স্বস্থানে। কিন্তু দৃষ্টি তার যথাস্থানে স্থির নেই অর্থাৎ হাতের সূচী-শিল্পে। এক লহমা সোয়াটারের দিকে নজর দিতে না দিতেই পর মূহুর্ত্তেই যেন নজর আ'সচে বার্চ্চ-হিলের দিকে। আমার ঠাঁই ঠিকানাও যে সে সব নিয়েচে তাও নয়। তবু ক'দিন হয় তো না'বতে দেখেচে এই পাহাড় থেকে। তাই রিফ্লেক্স এ্যাক্‌শনের মত খামোখাই তার নজর প'ড়চে এই দিকেই। আরও কিছুটা নীচে নেবে আ'সতেই মনে হ'লো যেন আমাকে সে দেখে ফেলেচে। কিন্তু তারপর দৃষ্টি আর তার উপর দিকে উঠ্‌লো না। মনে হ'লো যেন কত অভিনিবেশ সহকারে সে সূচী শিল্প নিরতা। মনে মনে একটু না হেসে পারিনি। পরক্ষণে আবার একটু সন্দেহ যে মনে উদয় না হোয়েচে তাও নয়। এ লক্ষণ অনুরাগেরও হোতে পারে, বিরাগেরও। যাই হোক্,—পরীক্ষা নিরীক্ষা তো একবার কো'রতেই হবে এবং যে দিকেই হোক্, নিঃসংশয়ও আজ হোতেই হবে। দোদুল্যমান মনের অবস্থা নিয়ে কাল কাটানো আর সাপের গর্ত্তসহ মেটো ঘরে বাস করা একই কথা। আজ এস্‌পার্ কি ওস্‌পার্।

ধীরে ধীরে দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলুম। উঁহু, তবু তাকানোর কথাই নেই। তার চোখ আর হাত যেন বড্ড ব্যস্ত পশ্‌মী সূতোর খেলা নিয়ে।

অবশেষে ব'ললুম, "নমস্তে মহাশয়া, এখানে কি সোয়েটার কিন্‌তে পাওয়া যায়?" ব'লে ব'সে প'ড়লুম সামনের টুলে। হটাৎ-ই যেন তার চমক্ ভাঙ্গলো এমনি ভাবে চাইলে। এবং হাত জুড়ে বললে, "প্রাতঃ পেন্নাম ঠাকুর মশায়। কি ব্যাপার? আজ এত সকালে যে?"

ব'ললুম, "কি জানি এই পাহাড়ে'জায়গায় সবই অদ্ভুত। বেলা ন'টায় যদি সকাল হয় তো সকাল আর বলে কাকে?

মুচ্‌কি হেসে ব'ললে সে, "আমার যখন ঘুম ভাঙ্গবে তারই নাম সকাল।"

ব'ললুম, "অর্থাৎ তোমার যদি রাত ন'টায় ঘুম ভাঙ্গে তো তখনই হবে সকাল?"

ব'ললে সে, "হ্যাঁ, তাই তো। নিজেকে নিয়ে কালের বিচার। এক জনের সুকাল হোলে সবারই সুকাল হবে তার তো কোনও মানে নাই। এই যেমন আপনার সুকাল আর আমার অকাল।"

ব'ললুম, "কি রকম ?"

ব'ললে সে, "রকম আবার কি। গতরাতে নিশ্চিন্তে মহানন্দে ঘুমিয়েছেন আপনি, তাই আপনার সকাল হোয়েছে ছ'টায়। আমি ঘুমুতে পারিনি কিন্তু ঘুমের চেষ্টা কোরে চোখ বুজে বিছানার কামড় সহ্য কোরেছি সারারাত। ঘুম্ ঘুম্ ভাব এলো ছ'টায়, – তখনো আমার রাত্তির। আর সকাল হ'লো ন'টায়, যখন বিছানা বিছাতুর মত কা'মড়ে জোর কোরে তুলে দিয়েছে আমাকে।"

কৌতূহল আর চা'পতে পারিনে। ব'ললুম, 'সারারা'ত ঘুম হ'লো না কেন ? ঠাকুর মশায় গতরাতে বাড়ী আসেননি বোধ হয় ?'

হেসে ফেলে ব'ল্লে, "না, তিনি সারারা'ত তো আসেন-ই নি। বেলা ন'টার আগ অবধি নয়।"

তখনকার আমার বুকের অবস্থার কথা জানি, মুখের বর্ণখানার কথা তো জানিনে। তবে জিভের রস যেন শুকিয়ে যাচ্ছিলো। টেনে টেনে ব'ললুম, "তাহ'লে কিছু আগেই এলেন তিনি ? এখন কোথায় আছেন ? বাড়ীর ভেতরে কি ?"

তেমনি হেসেই ব'ল্লে, "হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগেই এলেন। এখনো বাড়ীর ভেতরে যেতে পারেন নি।"

ব'ললুম, "তবে কোথায় তিনি ? আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হোতে চাই।"

ব'ললে সে, "এই বারই তো বিপদে ফেললেন। পরিচয় যে আমিই জানি না। আপনাকে কী পরিচয় দেবো।"

ব'ললুম, "হেঁয়ালী রাখো গৌরী। তোমার মানুষ আর তুমি পরিচয় জানো না ? এও কি আবার একটা কথা হ'লো ?"

ব'ললে সে, "সত্যিই জানি না। আর আমার মানুষ, কি কার মানুষ, তাও তো জানি না।"

মুখভার কোরে ব'ললুম, "গৌরী, আমার সঙ্গে তুমি ঠাট্টা ক'রচো। আমার সত্যিকারের ইচ্ছে যে তোমাদের সঙ্গে উভয়তঃ পরিচিত হই। একদিন এই

পাহাড় ছেড়ে চ'লে যাবো। সঙ্গে নিয়ে যাবো তোমাদের স্মৃতি। বুদ্ধি-দৃপ্ত, আনন্দদায়ক তোমার কথাগুলো চিরজীবন হবে আমার স্মৃতির সাথী। কিন্তু....."

একটু নরম ঝাঁঝের সঙ্গে এবার ব'ল্লে সে, "পাহাড় ছেড়ে একদিন চ'লেই যাবেন তো অল্পক্ষণের পরিচয়ে লাভ কি? তার চাইতে যতটুকুন হোয়েছে তাই থা'ক।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চাপা অভিমানের সুরে ব'ললুম, "বেশ তাই থা'ক। আচ্ছা উঠি তবে।" ব'লে দাঁড়িয়ে গেলুম।

জিজ্ঞেস ক'রলে সে,—মুখে কিছুটা উদ্বেগের চিহ্ন—, "কোথায় যাবেন?"

ব'ললুম, "কোথায় আর। অন্যখানে তো পরিচয় নেই। এমনি ঘুরে বেড়াবো।"

পুনঃ জিজ্ঞেস, "তারপর?"

ব'ললুম, "তারপর আর কি? ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত হবো ফিরবো স্যানিটারিয়ামে।"

ফের্ জিজ্ঞেস্ ক'রলে, "কোন্ স্যানিটারিয়ামে? সে তো এখানে গুটী কয়েক আছে।"

একটু তিক্ততার সঙ্গে জবাব দিলুম, "অত খোঁজে-তোমার দরকার কি? নিজেদের পরিচয় দেবে না, সেটী দোষের। আর আমারটীই বা ব'লবো ক্যানো?"

সে ব'ল্লে, "শাস্ত্রে বলে দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে ব'সতে হয়। তাহ'লে রাগ প'ড়ে যায়। আর,

'ক্রোধে তাপ তাপে মনস্তাপ শাস্ত্রের বচন
অতএব ক্রোধ সবে কর সংবরণ।'

অতএব এই মূহূর্ত্তে, দেরী না করে, আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ টুল খানায় নয়, কুঠরীর ভেতরের এই চেয়ারখানায় এখনই বসা দরকার।"

ব'ললুম, "আর তোমার ঠাকুর এসে আমার ঘাড়ে কিছু বসিয়ে দিন এও তোমার দেখা দরকার। এই তো?"

এইবার ব'ল্লে সে, "ঠাকুর, ঠাকুর অত কী ব'কছেন? ঠাকুর কোথায় আর চাকরই বা কোথায়? এ বাড়ীতে ঠাকুরও নাই চাকরও নাই। থাকি তো আমি আর মা। বাবা থাকেন 'শুকিয়া পোখ্‌রী।'

আমি সোৎসাহে জিজ্ঞেস কর্'লুম, "তাহ'লে তোমার বিয়ে কি....... ?

এবার কতকটা ছেলে মানুষি সুরে ব'ললে, "আমার কথা না মা'নলে আর কিছুই ব'লবো না।"

ব'ললুম, "আচ্ছা, আচ্ছা, ব'সচি। তবু তুমি সব বলো।" ব'লে কুঠরীর ভেতরে গিয়ে চেয়ারে ব'সলুম।

তারপর ব'ললুম, "বলো এইবার।"

সে বল্লে, "আমার কথা না রা'খলে ব'লবো না ব'লেচি।"

ব'ললুম, "রাখলুম তো তোমার কথা।"

বল্লে সে, "কই রা'খলেন? পরীক্ষা কোরে দেখি এইবার। ব'সলেই খেতে হয়।"

একটু ব্যঙ্গের সুরে বললুম, "আর খেলেই শুতে হয়। তাই না?"

সে হেসে উঠ্‌লে। "না, তা নয়। খেয়ে গল্প কো'রতে হয়। গল্প, অফুরন্ত গল্প।"

ব'ললুম, "উঁহু, গল্প নয়। তোমাদের কাহিনী।"

হেসে ব'ললে, "সেও তো গল্প।"

ব'ললুম, "বেশ্, বেশ্। কী দেবে খেতে, দাও। আমার আর তর্ সইচে না। অদৃষ্টে তোমার এখানে খাওয়া লেখা আছে তাই তো আর কোথাও তা জোটেনি। পারসীতে একটী কবিতা আছে। কথাটা ঠিক দেখ্‌চি।

'দো চিজ্ আদ্‌মিরা কাশাদ্ জোর্ ও জোর্
একে আব্ ও দানা দিগর্ খাকে গোর্'।'

দু'টো জিনিস মানুষকে সব সময়ই খুব জোর্ টা'নচে। একটী তার দানা পানি, আরেকটী তার কবরের মাটি। অর্থাৎ, ও দু'টো যেথায় কপালে লেখা আছে সেথায় যেতেই হবে।"

ব'ললে সে, "সে তো আমার কপাল ভালো যে 'আমার' সকালে বামুন ঠাকুরের সেবা ক'রে ধন্য হোতে পা'রবো। আর আপনার অদৃষ্ট মন্দ যে একজন জংলী পাহাড়ীর কুৎসিত হাতের সেবা বাধ্য হোয়ে নিতে হবে।"

ব'ললুম, "হোয়েচে, হোয়েচে। আর বিনয়ের আতিশয্যে কাজ নেই। আমার পেটে আগুন জ্বল্‌চে।"

ব'ললে, "ওঃ, মাফ চাইচি ঠাকুর। এখুনি আ'নছি।" ব'লে ঝট্‌পট্‌ ভেতরে গেলো। কি রকম কোরে গ্যালো কেমন কোরে বুঝাই? উপমান আর উপমেয়, তুল্য আর তুলনীয় কোনদিনই পূর্ণ নয়। নৃত্যচ্ছন্দা চপলা বন্য-হরিণীর গমনই বলুন, আর কুন্দনময় ঘোটকী-গমনই বলুন, কিন্তু মানবের বৈশিষ্ট যে হাসি তা পাবেন কোথায়? হাস্যময় গমন, যে গমনে সারা দেহে হাশিখুশীর ঢেউ খেলে যায় তা মানবেতরে পাবেন কোথা? না, না, খোদার বিস্ময়কর সৃষ্টি যুবতীর মধুমাখা হাসি। তাই তো তারে ভালেবাসি। কিছুরই সঙ্গে তুলনা নেই তার।

খেতে ব'সে ব'ললুম, "এত জিনিস এক্ষুনি এক্ষুনি পেলে কোথা?"

ব'ললে সে, "থাকে যদি মনে এড়াতে পারে না ত্রিভুবনে। আজ আসবেন তো ব'লেছিলেন। তবে এত সকাল সকাল আসবেন তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম হয় তো আবার বেলা একটা দেড়টায় আ'সবেন। তাই তো হাতের তৈরী এখন কিছু দিতে পা'রলাম না।"

ব'ললুম, "ভালোই ক'রেচো। আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিলো জানো। কা'ল রাতে একদম খেতে পারিনি।"

জিজ্ঞেস ক'রলে সে, "কেন খেতে পারেননি?"

একটু হেসে ব'ললুম, "ব'লবো না সে কথা। শুনে তুমি হা'সবে।"

সে,—"বেশ। আমিও ব'লবো না আমার কথা। শুনে আপনি ঘেন্না ক'রবেন।"

আমি,—"তোমার প্রতিজ্ঞা তাহ'লে ভঙ্গ হবে। বেশ্‌ তো। তোমার প্রতিজ্ঞা আগে পূরণ করো। আমি পরে তোমায় ব'লবো সব।"

সে,—"আচ্ছা, আমাদের পরিচয় কী এমন আছে যে আপনি এত উদগ্রীব হোয়েছেন? বাবা বালা সুন্দর ঠাকুরের এক ছেলে এক মেয়ে। পুত্র সুখ বাহাদুর ক'লকাতা সেণ্ট পলস্‌ কলেজে প'ড়তো জানি আলী হষ্টেল থেকে। গত বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হোতেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রক্তের ডাক্‌কে সে অবহেলা করেনি। ইউ,-ও,-টি,-সি-তে পূর্ব্বেই ট্রেনিং নিচ্ছিলো। পিতা বালা সুন্দর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ

ফের্‌তা এবং সামান্য লেখাপড়া জানা হ'লেও এরই জোরে চাক্‌রী পেয়ে যান ফরেষ্ট রেঞ্জার পদে। অনেক জায়গায় ঘোরাফেরার পরে—এমন কি খুলনার সুন্দর বনেও ছিলেন—এখন তিনি শুকিয়া পোখ্‌রীতে ঐ পদেই বহাল আছেন। থাকেনও সেখানে। বুড়ো হোয়ে গেছেন। অল্পদিনের ভেতরে রিটায়ার ক'রবেন।

মাঝখানেই ব'ললুম, "সুখ্‌ বাহাদুরের কি হ'লো?"

"হ্যাঁ ব'লছি সে কথা। সুখ বাহাদুর আর ফিরলেন না। সরকার জানিয়ে দেন আফ্রিকায় রোমেল বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়ে সে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল কোরেছে বটে, কিন্তু আফ্‌ছোছ, সে শহীদ হোয়েছে। কিছু টাকা এলো, প্রসংশা পত্র এলো, তক্‌মা মেডেল অনেকগুলো এলো; কিন্তু এতে একমাত্র পুত্রহারা কোমল হৃদয়া প্রৌঢ়া মায়ের মন ভিজলো না; বুক প'ড়লো ভেঙ্গে। সেই অবধি তিনি একরকম ইন্‌ভ্যালিড্‌। বুদ্ধ পূজায় অত্যন্ত মনোনিবেশ কোরেছেন। বাবা কোন প্রকারে এশোক কাটিয়ে উঠলেন।

এইবার তাঁদের একমাত্র জীবিতা কন্যা-সন্তান মনমায়ার কথা। সে ছোট বেলা মিশনারী স্কুলে পড়ে। বাবা চিরদিন বাঙ্গালী ভক্ত ও তাদের বুদ্ধি ও কৃষ্টির পূজারী। তাই কন্যা মনমায়াকে পুরোদস্তুর বাঙ্গালিনী কোরে তুলবার জন্যে দিলেন তাকে মহারাণী গার্লস্‌ হাই স্কুলে। আর দিলেন প্রচুর অবসর ও সুযোগ বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে মেশবার। তার জন্যে টাকা পয়সারও তিনি কম শ্রাদ্ধ করেননি ভদ্রতা ও আতিথেয়তার অপরিহার্য্য উপকরণ রূপে। সেই হতভাগিনী মনমায়া গত বছর কোনও রূপে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ কোরেছে। বাবার ইচ্ছা ছিলো মেয়েকে ক'লকাতার কলেজে ভর্ত্তি কোরে দেন। কিন্তু মায়ের দিক বিবেচনা কোরে এবং তাঁর অত্যন্ত বাধার জন্যে পিতার সে ইচ্ছা আর পুরণ হয়নি। এখন সে পিতা-মাতার প্রশ্রয় প্রাপ্তা আহুরি দুলালী। সময় কাটানোর নিমিত্ত-স্বরূপ নিজেদের বাগানের ফলমূল দিয়ে তাকে দোকান সাজিয়ে দেয়া হ'য়েছে। ঠিক যেমন খেলনা দিয়ে শিশুদের ভুলিয়ে রাখা হয় তেমনি। কিন্তু শিশু বড় হোয়ে গেলে এ খেলনায় যে মন ভরে না তা টের পেয়েছে সে হতভাগী এই সবে। সে একাকী নিঃসঙ্গী। তার সঙ্গে গল্পের সাথী চাই এক জীবন্ত পুতুল। আগেই ব'লেছি এ

বাড়ীতে ঠাকুর চাকর কেউ নাই। সম্প্রতি এক ঠাকুরের দর্শন মিলেছে। কবে অন্তর্ধান ক'রবেন জানি না।"

বুঝলুম সবই। তবু কথাটা পরিষ্কার কোরে নিতে চাইলুম। ঝাপের উপর রেখে সারারাত মনোকষ্টে দাপাদাপি করার মত বেওকুফি আর ক'রচিনে। জিজ্ঞেস ক'রলুম, "সেই ঠাকুরটি কে তাই স্পষ্ট কোরে বলো? আমি পরিষ্কার জা'নতে চাই।"

ব'ললে সে, "আরও পরিষ্কার? সে ঠাকুর আমার সামনে সেবারত। আর চাকর হতভাগিনী মনময়া, সভ্যতার বাইরের জংলী পাহাড়ী।"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হটাৎ দমকা বাতাসের ধাক্কায় মেঘ-নির্ম্মুক্ত হোয়ে সৌর করোজ্জ্বলে যেমন কোরে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠে আমার মনের দিগন্ত তেমনি কোরেই হেসে উঠলো।

আমি ব্যাথার সুরে ব'ললুম, "মনমায়া, তুমি নিজেকে কেন বার বার জংলী পাহাড়ী বলো? আমি মনে বড় ব্যথা পাই।"

ব'ললে সে, "যা সত্যি তা ব'লবো না? আপনাদের বাঙ্গালী মেয়েদের কাছে রূপে গুণে কোনও দিকে দাঁড়াতে পারি আমরা?"

ব'ললুম, "'আমরা'-র কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমার কাছে এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার। এই পাহাড়ে না এলে কোন দিন ধারণা ক'রতে পারতুম না যে তোমার মত কোনো নারী এমন জায়গায় জন্মাতে পারে। আজ বুঝতে পেরেচি অনেক সময় বনফুল সযত্ন সাজানো সখের বাগানের ফুলের চেয়েও হয় স্বভাব সুন্দর।"

ব'ললে সে, "কিন্তু বনফুল বনফুলই। কে তারে আদর করে? বনে সে বেদনা নিয়েই মরে।"

তারপর সে কষ্ট হাসি হেসে ব'ললে, "তাই ব'লে কিন্তু আমি নই। অপরের কথা ব'লছি। আমার মনকে খুশী করার জন্যে ও ফুলের সঙ্গে আপনি তুলনা ক'রলেন।"

মুখ ভার কোরে ব'ললুম, "যাও,—মেয়ে মানুষের সবতাতেই সন্দেহ। কছম খেয়ে, দিব্বি কোরে ব'লবো?"

ব'ললে হেসে, "না, না, আর দিব্বি কোরতে হবে না।" আমার ততক্ষণে খাওয়া হোয়ে গ্যাচে। প্লেটে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ব'ললে সে, "খাওয়া তো নয়। শুধু কষ্ট দিলাম। আর কিছু কমলা এনে দেবো?"

ব'ললুম, "হ্যাঁ, দেবে বই কি! খাদ্য-রাক্ষস ব'লে কি একেবারে রাবণ মেঘনাদের বংশধর ঠাউরে রেখেচো নাকি?"

মৃদু হেসে ব'ললে সে, "কি জানি। রাবণ মেঘনাদের বংশধরদের খাওয়া দেখিনি। তবে আমার মনে হয় আমার তো দূরের কথা, আমাদের সাত দিনের শিশু যা খেতে পারে তাও আপনি পারেন না।"

ব'ললুম, "শুধু মুখে ব'ললে হবে না চাঁদ। কাজে প্রমাণ ক'রলে তবেই তো বলি বাহাদুর। ব'সো খেতে আমার সামনে। দেখি তোমার মুরোদ্।"

ফিক্ কোরে হেসে ব'ললে, "ব্বাঃ, তাই ব'লে বসি আপনার সামনে এক সান্‌কি খাবার নিয়ে।"

ব'ললুম, "বেশ্ তো। গোপনেই খেয়ে এসো। আমি ঘড়ি ধ'রে থাকি।"

ব'ললে সে, "তার মানে, এক সা'ন্‌কি খেতে গেলে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন তাই থেকে ধ'রবেন আমি ঠিক এক সা'ন্‌কি খেতে পারি কি না?"

ব'ললুম, "তাই তো।"

— "কিন্তু আমার ক্ষিদে যে মোটেই পায়নি। খাই কি কোরে?"

—"দ্যাখো, যে খেতে পারে এতটা বেলা অবধি সে ক্ষিদে না থাকার বাহানা করে না। এই যেমন আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ব'ললুম, 'ক্ষিদেয় পেটের নড়ী হজম হ'চ্চে। খেতে দাও।'

—"না, ব'ললেন, খিদে পায়নি। স্যানিটারিয়ামে গিয়ে খাবো।"

—"ওটা অভিমানের কথা। তা'হোক। গতরাতে তোমার ঘুম হ'লো না কেন সেই কাহিনী বলো।"

—"ব্বাঃ, আমারই শুধু শুনবেন? আর নিজের কিছুই ব'লবেন না? এটা বোধ হয় শুধু পুরুষ মানুষ হওয়ার অধিকারে?"

—"আমার কী শুনতে চাইচো?"

—"কেন? কা'ল রাতে খেতে পা'রলেন না তবু চমৎকার ঘুম হ'লো?"

—"কে ব'ললে তোমায় চমৎকার ঘুম হ'লো? বরং নিজে আটটা ন'টা অবধি মজাছে ঘুমিয়ে নিজের স্বপন পরকে দেখাচ্চো। সারারাত কেটে গ্যালো আমার দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায়। তাই লুইস্ জুবিলি স্যানিটারিয়ামের কণ্টক শয্যা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়'লুম পাখী-ডাকা ভোর বিহানে মহারাণীর বাস ভবনের দিকে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে......।"

সে মুচকি হেসে ব'ললে, —"চোর তো বটেই,—মনোচোর। যার জন্যে মন রইলো না দেহে তো ঘুমোবে কে? কাজেই একজন উঠলেন ভোর বিহানে, আর ঐ সুযোগে আরেক জন কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ফিরে পেয়ে কাক-নিদ্রা উপভোগ ক'রেছে। তা হোক্। কিন্তু মহারাণী আবার কে?"

—"যে মহারাণী হাই স্কুলে পড়েচে সেই। আবার কে?"

—"আপনার শুধু ঠাট্টা।"

—"ঠাট্টা ঠিক করিনি, রাণী। কোনও মহারাণীকে দেখিনি, কিন্তু তাদের ছবি দেখেচি। আমার বড় ইচ্ছে করে তাদের জম্‌কালো পোষাকসহ ছবির পাশে, তোমার অনাড়ম্বর পরিপাটিহীন একটি ছবি রেখে দেখি।"

—"ইস্! সৃষ্টিছাড়া দুরন্ত সখ্!"

—"ওটা সখ্ নয়,- আমার সুখ। এ আমি একদিন দেখবোই রাণী।"

সে হেসে উঠ্‌লে এবং তাড়াতাড়ি ব'ললে, "বেশ তো। দেখো, দেখো। দিন তো ব'য়ে যায়নি?" তারপরই হটাৎ যেন ভুল ক'রেচে এবং শুধরে নেয়া দরকার এমনি ভাবে ব'ললে, "মাকে দেখবেন? চলুন না ভেতরে। পরিচয় চান্ তো জ্যান্ত পরিচয়ই সব হোয়ে যা'ক্। তবু যদি মহারাণী সম্বন্ধে কল্পনার ফানুস্ উড়ে যায়। হয়তো কল্পনার রঙীন চশমা দিয়ে দেখা মিথ্যে শীশ্‌মহল একদিন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে প'ড়বে। দিবাস্বপ্ন দিনের আলোর কঠোর ধাক্কা খেয়ে মূহুর্ত্তে বিলীন হোয়ে যাবে। সেদিন মহারাণীর নামটি পর্য্যন্ত বিস্বাদ লা'গবে গ্লানি-দগ্ধ দুষ্কৃতির মতো। তার চেয়ে আমাকে দাসী বলুন, বাঁদী বলুন, অসভ্য পাহাড়ী বলুন। ঘৃণা করুন। ভালোবাসার স্বাদ বিলিয়ে পরে তাচ্ছিল্য করার চেয়ে এখন থেকেই সত্য পরিচয় নিন্।"

না, এবার তো আর এতক্ষণের হাসিমুখ নেই? হা'সতে হা'সতেই চোখে পানি। এদের কখন আনন্দ, আর কখন বিষাদ, কখন হাসি কখন কান্না, এযে বুঝাই ভার। তাই তো ডাঃ কেন্ট্ এদেরকে ব'লেচেন, 'ওয়েদার কক্,' আবহাওয়ার ব্যারোমিটার। কথা ব'লতে ব'লতে কখন এক সময় মনে কোন্ হাওয়া দোলা দেবে পুরুষ জা'নবে কি কোরে? তাই তো নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। তাই তো সংস্কৃত পণ্ডিত ব'লেচেন, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।' স্ত্রী চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতারাই জানেন না মানুষ তো দূরের কথা। তবে সে চেষ্টা কোরে আর লাভ কি? কিন্তু কৌতূহলী মানব মনের জা'নবার আকাঙ্খার তো শেষ নেই। একদিন কলেজ লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় দেখলুম হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ নামে একজন ভদ্রলোকের একখানি বইয়ের নাম, 'মাইণ্ড অভ্ উমেন'—'নারীমন।' অনেক বন্ধু ব'লেছিলেন ভদ্দর লোক মস্তবড় যৌন বিজ্ঞানী। তাহ'লে তিনি কি নারীমন সব জেনে ফেলেচেন? এবার ক'লকাতা ফিরে গিয়ে প'ড়তে হবে বইখানা।

কিন্তু এখন করি কি? এই যে হাস্যলাস্যময়ী নারী,—এক লহমার মধ্যে সংসার বিরাগিণীর কথা ও মূর্ত্তি নিয়ে হাজির একে নিয়ে আমি করি কি? তার কথার মধ্যে এইটুকু বুঝলুম সে আমাকে ভালোবেসেচে কিন্তু আমার ভালোবাসার পরিণামে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার মনের নৈকট্য সে কামনা করে, কিন্তু হীনমন্যতা অসমমন্যতা তাকে বাধা দিয়ে দূরে স'রে রাখে। আমার এখন প্রয়োজন, শুধু অভয় মন্ত্রে নয়, হাতে কলমে প্রমাণ কোরে দেয়া যে তার সন্দেহ অমূলক। তাই কাছে গিয়ে হাত ধ'রে ব'ললুম, "মায়া, আমার ভালোবাসাকে তুমি সন্দেহ ক'রো না। আমার এখন মনে হয় এই দার্জ্জিলিং পাহাড়ে আমি অনন্ত—অনন্তকাল থা'কতে পা'রবো। শুধু গল্পানন্দের জন্যে, শুধু সাহচর্য্যের জন্যে মিছিমিছি তোমার সঙ্গে ছলনাময় কৌতুক করিনি। বিশ্বেস করো আমাকে। এখন মনে হয় তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর সুখ নেই।"

সে এইবার ঝর্‌ঝর্ কোরে কেঁদে ফেল্লে। আবেগ উচ্ছ্বসিত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ল্লে, "জানেন.... আমি বাধা দিয়ে ব'ললুম, "না-না, আর 'জানেন' নয়। নিকটে এসেচো যদি তবে আর দূরে যেওনা। দোহাই তোমার, 'জানো' বলো।"

ব'ললে সে, "জানো, জীবনে কত মানুষকেই তো দেখেচি। কত জনের সঙ্গে গল্প কোরেচি। কিন্তু এক দিনের মধ্যে আমার মন হারিয়ে যেতে পারে এ কল্পনাই আমি করিনি। আমার ধারণা ছিলো আমার হৃদয় 'ম্যান্ প্রুফ্।' সে অহংকার আমার তুমি চূর্ণ কোরে দিয়েছো। একজন বিদেশী এসে দস্যির মত বাট-পাড়ি কোরে আমার প্রাণের মণি কোঠায় প্রবেশ ক'রবে স্বপ্নেও যে ভাবিনি তা। তুমি জানোনা সারারাত একাধারে আনন্দ ও সন্দেহ দুই চোখের পাতা আমাকে এক ক'রতে দেয়নি।"

তার হাতখানা আবেগের সঙ্গে নিজের হাতে নিয়ে ব'ললুম, "বিশ্বেস করো মায়া, আমারও রাত ঠিক ঐ ভাবেই কেটেচে। ক'লকাতা খুলনার জৌলুস কেটে এসে, আমার প্রাণও বাঁধা পড়বে এখানে, এ যে আমারো স্বপ্নাতীত মায়া। তাই তো কবি ঠিকই গেয়েচেন,

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে?"

চ'লো মায়া, এই পরম শুভ ও স্বর্গীয় মূহুর্ত্তে তোমার মা তথা আমার মাকে দেখে ধন্য হই। আজ কবির সত্যানুভূতিকে মনে প্রাণে সায় দিই,—

'স্বর্গ মর্ত্তে নামে প্রেমে
মর্ত্ত স্বর্গে উঠে প্রেমে।'
"প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমো-দূর।"

সেও ব'ললে, "চলো তবে।" বাড়ীর ভেতরে না যাওয়া অবধি তার হাত কিন্তু ছাড়িনি।

পশ্চিম দিকের ঘরের উত্তর-পূব মুখো কোণে একটি বুদ্ধের মূর্ত্তি। তারি সামনে ব'সে গৈরিক বাস পরিহিতা মঠ বাসিনী সন্ন্যাসিনীর মত এক বৃদ্ধা। শোকে বৃদ্ধা কিংবা বয়সে তা বু'ঝতে পারিনি। শুধু দেখলুম তাঁর ঠোঁট ন'ড়চে। মনে মনে ভাবলুম—

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'
সংঘং শরণং গচ্ছামি'

কিম্বা ঐ রকম সব মন্ত্র পাঠ কোরে থা'কবেন। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। মায়া ইশারা কোরে ব'ললে, 'সকালে ব'সেচেন। হয়তো অল্প-ক্ষণ পরেই ধ্যান শেষ হবে।' কিছুক্ষণ পরে হলোও তাই। আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন। আমি হাত কপাল পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে আদাবের ভঙ্গীতে তাঁকে আমার সম্মান জানালুম। বৃদ্ধা মায়াকে সম্ভবতঃ এই অপরিচিতের কথাই জিজ্ঞেস কোরে থা'কবেন। তাঁর মাত্র একটি কথাই মনে রেখেছিলুম 'কাঞ্চী।' মনমায়ার কাছ থেকে পরে মানেও জেনে নিয়েছিলুম কাঞ্চী মানে 'খুকী,' কাঁচু, কচি। বৃদ্ধা আমার সম্বন্ধে দু'একটি মাত্র পরিচয় জেনে নিলেন। মনমায়া দোভাষীর কাজ ক'রলে। সে ব'ললে, 'মা ব'লছেন আপনার বাড়ী কোথায়?' ব'ললুম, "বলো, খুলনায়, সোঁদর বনের দেশ।' আবার জিজ্ঞেসা, 'আমি কি করি এবং কি মনে ক'রে এই পাহাড়ে এসেচি?' জানালুম আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়েই শরীর সারাতে এসেচি এখানে। বৃদ্ধা ব'ললেন, 'রামরছ'— ভালো, উত্তম।

মনমায়া ব'ললে, "মা ব'লছেন বেশ ছেলেটি। আমার সুখ বাহাদুরের মতোই। আ'সতে বলিস্ মাঝে মাঝে।" আমি ব'ললুম, "ও জবাবটা তুমিই দিয়ে দাও।"

বাঁচলুম যে বৃদ্ধা আমাকে পছন্দ কোরেচেন। এর পর দু'জনে ঘর ছেড়ে ছোট্ট আঙ্গিনায় এলুম। মায়াকে ব'ললুম, "মায়া, আমার আরও দু'একটি পরিচয় যা আছে তুমি জেনে নাও। আমার মন খালি হোয়ে যা'ক্। তারপর তুমি ভেবে ছাখো তোমার মনের পুতুল ভাঙ্গলো কি ঠিকই রইলো।"

মায়া ব'ললে, "সে আবার কি?"

আমি ব'ললুম, "এতদিন আমাকে বামুন ঠাকুরই মনে করো আর যাই করো, আমি কিন্তু মুসলমান।" ব'লেই মায়ার মুখের পানে চাইলুম তার মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রতে। কেননা মুখই নাকি মনের দর্পন। আমার ইচ্ছে এ ক'দিন ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কোরে যে আনন্দ-মেলাপ্, প্রেমের খেলা চোলেচে সে মুখোশ্ আজ পূর্ণরূপে খ'সে পড়ুক। জানুক সে আমার সত্য পরিচয়। তারপর

যা হবার হবে। নিজের হাতে এ সুধাপাত্র ভেঙ্গে দেবো,—নেবে আ'সবে আমার জীবনে বিষাদের বিষভাণ্ড। তা হোক্—তবু সব পরিষ্কার হওয়া দরকার। নইলে কবি ভবভূতির 'মালতী মাধব'-এর সেই অমর শ্লোক-বাণী আমার জীবনে সত্য হোয়ে আ'সবে,

'চিতাচিন্তা সমখ্যাতা, চিতাহি বিন্দুনাংধিকাঃ
চিতা দহ্যতে নির্জ্জিবং চিন্তা দহ্যতে তনয়াঃ।'

চিতা আর চিন্তা এক প্রকারের জিনিস। চিতা এক বিন্দু অধিক নয় চিন্তার চেয়ে। বরং চিন্তাই অধিক বড়। কেননা চিতা নির্জ্জিবকে পোড়ায়, আর চিন্তা সজীবকে তিলে তিলে দগ্ধ করে। কাজেই বুকে আগুন নিয়ে চলার চেয়ে এ আগুন একবারে নিবিয়ে দিয়ে ভস্ম-শৈত্য অনুভব করা, তাও ভালো।

ভেবেছিলুম মায়ার মুখের আলো দপ্ কোরে নিভে যাবে। ধারণ ক'রবে চাঁদনী রাতে রাস্তার বাঁকে হঠাৎ দত্যি দেখার মূর্ত্তি। ও খোদা, তা কিন্তু হ'লো না। তার বদলে আনন্দে উল্লসিত হোয়ে ঝটিতি আমার হাত চেপে ধ'রে ব'ললে, "সত্যি, সত্যি তুমি মুছলমান?"

ধীর ভাবে জবাব দিলুম, "এক বিন্দু ঠাট্টা নয় মায়া। যেমন ঠাট্টা নয় তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা। মায়া, তোমার প্রতিমা তুমি ভেঙ্গে ফেলো, বিসর্জ্জন দাও; আমি কিন্তু ব'য়ে বেড়াবো তোমার প্রতিমা জীবন ভর।"

ব'ললে মায়া, "কী ব'লছো? আমার সব চেয়ে আনন্দ হ'চ্ছে আজ,—এই মূহুর্ত্তে। এ কদিন বামুন মনে ক'রে আমিও বড় মনোকষ্টে, সন্দেহ দোলায় দুলেছি। তাদের জাতি বিচার আছে, বংশ গৌরব আছে, কৌলিন্য আছে, আর সর্ব্বোপরি আছে তাদের শ্রেয়মন্যতা। সেখানে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে সাধারণ মানুষের প্রেম। তারা ভালোবাসে বর্ণকে, শ্রেণীকে, মানুষকে নয়। তারা বাগানের সাজানো নিকৃষ্ট গোলাপকেই ভালবা'সবে, কিন্তু বন্য গোলাপ সুন্দরতর, উৎকৃষ্টতর হ'লেও নয়।"

ব'ললুম আমি, "এ তোমার নেহায়েৎ ভাববিলাসের কথা মায়া। হঠাৎ তোমার হ'লো কি?"

ব'ললে সে, "হঠাৎ? হঠাৎ আমার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হোয়ে গ্যাছে। আর নিজের আবেগকে ধ'রে রা'খতে পারছি না। রবী-ঠাকুরের একটি গান শুনেছিলাম,

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ
তারই সঙ্গে মৃদঙ্গে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ।'

আমারো মনের অবস্থা আজ তাই। হে প্রাণের ঠাকুর, আজ তোমাকে সব কথা বোঝাতে পা'রবো না। আর একদিন হবে।"

ব'ললুম আমি, "আমারো একদিন ঐ রকমই হ'য়েছিলো। সেও জানাবো অন্যদিন। কিন্তু মায়া, আজ কি তুমি কিছুই খাবে না? বেলার দিকে চেয়ে দ্যাখো দিকিন্।"

ব'ললে সে, "তুচ্ছ খাওয়া। শোননি মেয়ে মানুষ আর মাটির সহ্যগুণ অশেষ? তোমার এই পাহাড়িনীর সহ্যগুণ পাহাড়ের মতই অটল, জেনে রেখো।

আগ্নেয়গিরির আবেগ-ভারী পরিবেশটী ক্রমেই একটু হাল্কা হোয়ে আ'সচে। তাকে আরও একটু হাল্কা ক'রবার জন্যে ব'ললুম, "আমার পাহাড়িনীকে খেতে না দিয়ে, আমি কাছে না থাকলেও সে বেঁচে থাকবে। এই তো?

এইবার সে একটু ফিক্ ক'রে হেসে ব'ললে, "না, তা নয়। খেতে দিও না। কিন্তু তোমার থা'কতে হবে আমার কাছে।"

জানি, এটা আবেগের আতিশয্য। পণ্ডিতেরা বলেন প্রেম আর পাগলামি এক জিনিসেরই এপিঠ ওপিঠ। বি-এ পর্য্যন্ত প'ড়েচি। তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র কিছু কিছু ঘেঁটেচি। মানব জীবনে প্রেমের মূল্য বোধ সম্বন্ধে কত বিতর্ক সভায়ও যোগদান ক'রেচি। কিন্তু আজ সব বিদ্যে ভুল হোয়ে য'াচ্চে। মনের ভেতরে সাত সমুদ্দুরের তুফান উদ্দাম বেগে জেগেচে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ফেনায় ফেনায় ভ'রে উঠেচে সমুদ্দুর। আজ কোথায় স্থল আর কোথায় কুল, তার আর নিমেসিমে নেই। আমা হেন অন্তরই যখন এই অবস্থা তখন অধিকতর ভাবপ্রবণ নারী হৃদয়ে প্রেম যে কতখানি তোলপাড় কোরে তোলে তাতো সজ্ঞান ও বিবেকী মূহুর্ত্তে বুঝতে পারি। আপনারা ব'লবেন 'সব বুঝি বাপু। এ আর কিছু নূতন জিনিস নয় যে আমরা বুঝিনে। সবাই বিয়ে না কোরলেও অন্তত: বরযাত্রী হোয়েচি। তোমার মত এতটা ঘন-প্রেম না হোলেও অন্ততঃ টুটা

ফাটা, ছিটকে পড়া, প্রেমের স্বাদ পেয়েছি, চিঠি পত্তর লিখেছি, হটাৎ রাতারাতি কবি সেজে কবিতা গেঁথে দয়িতার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করেচি। এ আর নূতন কথা কি? এরূপ কাহিনী নিয়ে তো বাজার ছেয়ে গেলো বই কেতাবে। ছেলে মেয়েদের মাথা খেলে তোমরা। এমনি তো সিনেমার দুঃখে বাঁচিনে তার আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

আমি বলি. 'এতটাই স'য়েচেন যখন দয়া কোরে আর একটীও স'য়ে যান। বিয়ে বাড়ীর নেমতন্নে ঢেঁকি পেটে আরও চা'রটী রসগোল্লা খেয়ে থাকেন নিতান্ত অনুরোধে। যারা অনুরোধ ক'রে খাওয়ায় তারা খাওয়ানোর আনন্দ লাভ কোরে তৃপ্তির হাসি হাসে। এটা স্বাভাবিক। আমারও তাই।

আমার এই প্রথম ভালোবাসা। এবং এই অদ্ভুত ভালোবাসা আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেলো তা না ব'লে আমি পা'রছিনে। কেন পা'রছিনে তার কৈফিয়ৎ মাইকেল দিয়ে গ্যাচেন। সেই যে 'বরিষার কালে সখি প্লাবন পীড়নে ····তেমতি দুঃখিত যে দুখের কথ. কহে সে অপরে।' অতি সুখের কথাও মানুষ মানুষকে ব'লে নিজের সুখটাকে বাড়াতে চায়। এইটীই মানবের সাধারণ প্রকৃতি নয় কি? প্রেম নাকি মানুষকে স্বর্গীয় করে, দেবতা বানায়। মানুষের আদি রস, শ্রের-আবেগ ও অনুভূতি-শ্রেষ্ঠ নাকি এই প্রেম, সৃষ্টির আদিম বীজই নাকি এই ভালোবাসা। এনিয়ে রবিবাবু নব প্রেম-দর্শন তৈরী ক'রলেন,

"এ সঙ্গীত রস ধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম তৃষা।
·· ·· ···এই প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে,—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা?

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।
·· ·· ·· ··· যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তা'রা
লুটে পুটে নিতে চায় সব। ··· ···
.. ··· ·· তুমি মিছে ধরো দোষ
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।"

দোহাই আপনার, অধৈর্য্য হবেন না। আমার কাহিনীটা শেষ পর্য্যন্ত শুনে যান। যদি সহানুভূতি না পাই তো কিসের হাম্‌দর্দ্দী আপনার? মানবের নাকি ঐটেই বড় গুণ। এখনি ক্লান্ত হোয়েচেন?

"যত শুনি সেই অতীত কাহিনী
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ মিলন কথা"

ততই তা নিয়ে নব উপলব্ধি, নব অভিজ্ঞতা লাভ হয়। থা'ক সে কথা।

তারপর?

হ্যাঁ তারপর, 'আমার' মায়াকে ব'ললুম,—বড় হরফের 'আমার', কেন না আমার হোতে প্রতিবন্ধক তো কিছুই দেখছিনে,—'মায়া, আমি ব'সে থা'কবো তুমি যতক্ষণ বলো। কিন্তু তুমি কিছু মুখে না দিয়ে এলে আমি এক দণ্ডও থা'কবো না। তুমি খাওনি, আমি সুখ পাচ্ছিনে।"

আমার কাতর মুখখানার দিকে চেয়ে রইলো মনমায়া মিনিটখানেক। তার চোখে বিশ্বের মমতা যেন উথলে উঠ্‌চে। মনে হ'লো কখন বুঝি আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে। তারপর একটু হেসে ব'ল্লে, "তোমার বুকখানা মেয়ে মানুষের চেয়েও কোমল। আমার না খাওয়ায় তুমি এত ব্যথা পাচ্ছো? আচ্ছা,

যাচ্ছি খেতে। পৃথিবীতে এসে অবধিই তো খাচ্ছি। কিন্তু কিছু না খেয়েও যে ভরা পেটের চেয়ে পেট বেশী ভ'রে থাকে এ কথা তুমি বিশ্বাস ক'রতে পা'রছো না।"

তাকে এইবার ঠেলে বাড়ীর ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম বললুম, "সবই বিশ্বেস করি। আর কথা খরচা না কোরে এবার যাও দিকিন্।"

সে চ'লে গ্যালো।

ব'সে রইলুম আমি।

চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো আগামী দিনের কল্পনায় জড়ানো একটি রঙীন ছবি। মায়ের স্নেহ, বোনদের সেবা, যত্ন, মমতা সব পেয়েচি। কিন্তু এই অনা-স্বাদিত, অপূর্ব্ব, ধরা ছোঁয়ার বাইরের বস্তুটি অনাত্মীয়ের বুকে কেমন কোরে, কি ভাবে জমা ছিলো যা ধরাকে ক'রে দেয় মধুময়, জীবনকে ক'রে দেয় স্বপ্ন-মধুর ? একি আমার চোখের নেশা ? একি আমার যৌবন ধর্ম্ম ? মনমায়ার রূপ আছে তা আমি কেন, তার শত্রুতেও স্বীকার ক'রবে। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপই কি লালসাহীন প্রেম টেনে আনে ? এর আগেও তো কতো রূপসী-শিক্ষিতা যুবতী দেখেচি। আমার সহপাঠিনীদের ভেতরেও তো অবাক্ করা রূপ ছিলো। তারা আমার মনের প্রসংশা পেয়েচে, স্বীকৃতি পেয়েচে। কিন্তু আমার মনের কোন্ নিভৃত কন্দরে যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অলক্ষ্য-পূর্ব্ব ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব, অমলিন স্বর্গীয় বস্তু ঘুমিয়ে ছিলো তাতো তারা কোনোদিন আকর্ষণ কোরে জাগাতে পারেনি ? আর আজ ?

আমাদেরই পাড়ার একজন সুদর্শন যুবক বাপমায়ের অমতে যখন কালো একটি মেয়েকে বিয়ে কোরে ঘরে নিয়ে এলো, তাই নিয়ে পাড়াময় সে কী ঠাট্টা। বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞেস ক'রলে, তুই একি ক'রলি ? তোর একি রুচি ?' শুধু যুক্তি-তর্ক-বিচারহীন একটি জবাব, 'আমার ভালোলা'গ্‌লো।' আরেক জন সাধু চরিত্রের অতি উচ্চ শিক্ষিত যুবক গুটিকয়েক সরকারী উচ্চপদ ও উত্তম বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যা-খানের পর শিক্ষকতা জীবনে একটি অতি সাধারণ ঘরের যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা অনুঢ়া মেয়েকে বিয়ে ক'রলেন। দেশে শোর্ উঠ্‌লো। আত্মীয়-স্বজন ধিক্কার দিলে। মাথা মুরুব্বী এক প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ ক'রলেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি শুধু বলেন, 'কোর্-আন্ পাঠকারিণী মেয়েটিকে আমার বড় মমতা হ'তো।'

এঁদের জবাব আজ আমি খুঁজে পেয়েচি। সে জবাব-হীন জবাব এই যে, 'কেন জানিনে, কিন্তু আমার ভালো লেগেচে।' বাস্। একশো কথার শেষ কথা।

এমনিতরো চিন্তায় বিভোর। কখন মনমায়া এসে কাছে দাঁড়িয়েচে, কখন থেকে আমার এ ভাব লক্ষ্য কোরে মিটিমিটি হা'সচে, টের পেয়েচি শুধু তখনই যখন সে আমাকে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, "মক্কা মদিনার মুসলমান ঠাকুর, জাত ধম্মো খুইয়ে কোন্ দেবী দুগ্‌গার ধ্যান করা হ'চ্চে?"

একটু আঁৎকে উঠে ব'ললুম, "ধ্যান? হাঁ, ধ্যানই তো বটে। আমি জীবনে শুধু গৌরী দেবীরই ধ্যান কোরেচি, ঠাকরুন। তা দেবী যদি টের না পান তো ভক্তের দোষ নয়। মক্কা মদিনার মুসলমান ঠাকুরের জা'ত যায় না, সে জা'ত হরণ করে। সে সর্ব্বজাতিহর।"

সে ব'ললে হেসে, "ইস্! ভারী যে গর্ব্ব।"

ব'ললুম, "নয় তো কি? ইতিহাসে পড়োনি জাহাঙ্গীর বাদশা'হ্ রাজপুত কুমারী যোধাবাঈকে ঘরে এনে দিয়েছিলেন ধর্ম্মের স্বাধীনতা? তাতে জাহাঙ্গীরের জাত ধম্মো নষ্ট হয়নি।"

ব'ললে সে, "কিন্তু এ রকম নজির আরো তো ছিলো? সব বাদ দিয়ে শুধু জাহাঙ্গীর বাদশার কথাই বা মনে উদয় হ'লো কেন?"

ব'ললুম, "তার কারণ বক্তা নিজে খুলনার সৈয়দ আকবর হোসেনের এক মাত্র পুত্র সৈয়দ জাঁহাগীর হোসেন। নিজের ঢোল নিজে না পিট্‌লে আজকাল অপরে কেউ বাজাতে চায় না। তুই কন্যা ও তস্যা মাতাসহ শ্রদ্ধেয় পিতা খুলনায়। আর তস্য পুত্র নব-যুগের জাঁহাগীর বাদশাহ্ এই দার্জ্জিলিং-এ হাওয়া খেতে। এ যেন আসল জাহাঙ্গীর বাদশার কাশ্মীরে হাওয়া খেতে যাওয়া।"

ব'ললে সে, "তবে দুঃখ এই যে সঙ্গে নুরজাহান নাই। নইলে নামের সঙ্গে কামও মিলে যেতো। নিজে বাদশাহ্ সেজে ব'সে আছেন আর আমাকেই মহারাণী মহারাণী ব'লে ঠাট্টা।"

ব'ললুম, "নুরজাহান নেই তো কোনও দুঃখ নেই মহারাণী। নুরজাহানকে গ'ড়ে নেবো মহারাণীর মধ্যে।"

ব'ললে সে, "আচ্ছা, হোয়েছে, হোয়েছে। আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না। একেবারে কথার সাগর, রসের নাগর, ঠাট্টার ঠাকুর, আর রূপে গুণে জাঁহাগীর বাদশাহ্।"

ব'ললুম, "দোহাই রূপমণি মহারাণী, গুণের মধ্যে বোতল টানার গুণ কিন্তু নেই আমার। আমার সবই গুণ, শুধু একটি অগুণ যে, আমি গুণহীন। এবার নারী-গুণে যদি আমি গুণবান হ'তে পারি।"

ব'ললে সে, "মাভৈঃ, এবার রূপমণি মহারাণী গৌরী ঠাকরুন অভয়বর প্রদান ক'রছে বাদশাহ জাঁহাগীর হর ঠাকুর সুরূপা, সুগুণা, সুকণ্ঠি নারীগুণে গুণান্বিত হউন।"

অভিনয়ের ভঙ্গীতে ব'ললুম, "কৈলাস বাসিনী গৌরী দেবীর জয় হোক্। জয় গৌরী দেবী কি জয়।"

সেও ব'ললে, "জয়তু! জয়তু! মনোরাজ।"

দুই জনেই হা'সলুম। বৈকালীন সূর্য্য পরিহাস ভঙ্গিমায় হা'সতে হা'সতে পশ্চিমের পাহাড়টির ওপাশে ঢ'লে প'ড়লো। নেবে এলো দীর্ঘতর ছায়া প্রেতকায়ার মতো দ্রুত পদবিক্ষেপে।"

ব'ললুম' "মায়া, সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে এলো। আ'জকের মতো অথ হর-গৌরী সংবাদ ইতি কোরে উঠে পড়ি।

'ছাড়িতে পরাণ নাহিক চায় তবু যেতে হবে হায়।"

একটু মাথা নেড়ে, শুধু সে ব'ললে, 'আচ্ছা।'

রাস্তায় দাঁড়াতেই মনে হ'লো মায়ার মায়াময় স্নিগ্ধ চক্ষুর অপলক দৃষ্টি পেছন থেকে আমাকে অপরূপ অমিয় ধারায় প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে।

——::——

"ছয়"

সে সন্ধ্যায় পরিশ্রান্তির লেশ্ নেই, আর প্রশান্তিরও শেষ নেই। আজ আমার সবুজ মনের আনাচে কানাচে রং-এর বাহার। শত শোভায় ও সৌন্দর্য্যে ধরণীর প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে বিচিত্রতম হোয়ে উঠেচে। অনুভূতির পেয়ালা রসে ও রহস্যে কানায় কানায় পরিপূরিত।

আমি স্যানিটারিয়ামের বারান্দায় বারান্দায় দোয়েল শ্যামার মত শীষ্ দিয়ে ফিরতে লাগলুম। কখনও কখনো গুন্ গুন্ কোরে গান ধরি,—

'শুন্‌ছো সখি, শুন্‌ছো সখি, শিখ্‌ছি শুধু চোখেরি ভাষা,
শিখছি যত বা'ড়ছে তত মোর প্রাণেরই পিয়াসা।'
চোখে তুমি ব'লেছিলে 'ওগো প্রিয়তম,'
ইশারায় ব'লেছিলে 'প্রিয় মনোরম,'
মোর মুগধ অন্তর
কাঁপে তনু থরোথর্
প্রাণে ঐ ফুলশর
সহিতে নারি
আজ তুমি ছাড়া কেমনে গো রহিতে পারি ?'
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার গান বন্ধ হ'লো, যখন সদর সিঁড়ির ধাপে ধাপে 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' উদাত্ত কণ্ঠে শুনতে পেলুম।

পরেশদা আমায় দেখ্‌তে পেয়েই ব'ল্লেন, "এই যে, কখন ফেরা হ'লো ? আচ্ছা খেয়ালী ছোক্‌রা হে।"

ব'ল্লুম, "আপনিও বেড়িয়েচেন, আমিও ঢুকেচি।
এক পৈঁসহি এক নির্গমহি ভীড়ভূপ দরবার।"

শেষের টুকুন্ হিন্দি রামায়ণের জন্মদাতা তুলসী দাসের কাছে থেকে ধার-করা সামান্য পুঁজি নির্ঘাত কাজে লাগালুম।

পরেশদা ব'ললেন, "শরীরটার দিকে একটু নজর রেখো হে। দিনভর অত ঘোরা ফেরা..... ।"

ব'ললুম, "শরীর তো দিন দিন আমার.. । আমার তো মনে হ'চ্চে... । এই দেখুন না, কা'লকের আমাকে আজ আর চেনাই শক্ত।"

ব'ললেন তিনি, "বেশ্, বেশ্। কামনা করি তাই হোক্। দেখি দু'এক চাঁটি মেরে আসি। ওহে ও পরিতোষ, হেরদয়, ভবেশ আছো নাকি হে? আরে ঝা'রতির পো, তামাক নিয়ে আয়।"

তিনি পাশের ঘরে বেড়িয়ে গেলেন। এই বার আমি একা। আজ হটাৎ কবিতে লিখ্‌তে বড্ড ইচ্ছে হ'চ্চে যেন। প্রাণের ভেতরে বড্ড আঁকু পাঁকু, হাঁচর্ পাঁচর্ ক'রচে। রাইটিং প্যাড্ টেনে নিলুম, ঝরণা কলম পকেট থেকে বের কোরে লেখার ভঙ্গীতে আঙ্গুলে ধ'রলুম। টেবিলের উপর ঈষৎ ঝুঁকে প'ড়ে কনুই পেতে বাম হাত গালে লাগালুম। দৃষ্টি উদাস ভঙ্গীতে পাঠিয়ে দিলুম দেয়ালের দিকে, যেন আমার তাঁকে দেখতে পাচ্চি। এইবার আমার একটা ফটো নেবার মতো অবস্থা।

বেশ খানিকটে সময় তো গেলো, কিন্তু কবিতে কই? লিখি কি? ভাব কই, ভাষা কই, ছন্দ কই? ও হেন শীতেও বিরক্তিতে ঘেমে উঠলুম। দূত্তোর ছাই। বিধির বরপুত্র যারা, কবিতে লিখুক তারা। সেনাপতির আদেশে সেনা-বাহিনীর মত কথাগুচ্ছ ফল্-ইন্ ক'রবে কবিদের হাতে। তা হোক্। কবিতে চাই। স্বভাব-কবি না হই, কষ্ট-কবি হোতেই হবে। এতে রা'ত থা'ক আর যা'ক।

ক'বছর ধ'রে প্রেমের কবি বায়রণ, শেলী, কীট্‌স্ প'ড়লুম, পরের লেখা সমালোচনা, ব্যাখ্যা' রা'ত জেগে জেগে মুখস্থ ক'রলুম বি-এ পাশের জন্যে। ওদেক নিয়েই চেষ্টা করিনে কেন? ভবভূতি, কালিদাস যদি কবি হোয়ে থাকেন অধ্যবসায় ফলে, আমি চেষ্টা করি তবে যা থাকে কপালে। শেলীকে নিয়েই শুরু করা যা'ক। কিন্তু বই নেই সঙ্গে। ভাব তো মনে আছে। স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ হোক্ খেতি কি? তারও থা'ক, আমারও থা'ক। শেলীর সেই কবিতে, ডিগ্রিকোর্সে ছিলো,—

"I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine"

চুম্বন ভীতি।

তোমার চুমায় ভয় করি সই,
আমায় তুমি না করিও ভয় ;
ভারাক্রান্ত হৃদয় আমার
চুমার ভারে পাবে গো প্রলয়।
সই, তোমার সুরে, তোমার চুলে
ঐ মিষ্টি গতি ভঙ্গিমায়,
পরাণ আমার শিউরে উঠে
কেঁদে উঠে এই ভাবনায়,—
হয় তো তুমি আমার তরে
প্রেম ব্যাকুলা অন্তরে,
আমার কিন্তু তোমার লাগি
হিয়ার পূজার ফুল ঝরে।
আর পারি না, আর সহে না
প্রেম মদালস দৃষ্টি ঐ,
অবশ হিয়া সইতে নারে
বইতে নারে চুমা সই।

যা'ক। মগজের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি কোরে, কলমে কেটে কুটে, কোনও রকমে তো খাড়া ক'রলুম একটি। এরপর পুনশ্চ দেখা যা'ক। ছা'ড়ছিনে।

অতঃপর, শেলীর প্রেম-দর্শন, Love's Philosophy.

"প্রেম-দর্শন"

ঝরণা ধারা পাগল পারা মিল্‌ছে নদীতে,
বেগবতী স্রোতস্বতী ধায় যে সাগরে ;
আকাশ বাতাস ফেলছে যে শ্বাস মিলন সঙ্গীতে
যায় যে দেখা নাগরিকা বাঁধের নাগরে ;

এ দুনিয়ায় কেহ কোথায় নাই তো রে আজ একা
তবু কেন এতক্ষণও প্রিয়া তব পাইনে দেখা ?

পাহাড় দেখো চুমছে আজি ঐ আকাশের প্রান্তরে,
ঢেউয়ের পিছে ঢেউ ছুটেছে চুমার নাহি অন্ত রে ;
ফুল যদি হায় চুমা না দেয় তাহার প্রিয় ভ্রমরে
বিধির বিধান কঠোর নিদান নাই কো তাহার ক্ষমারে
রবির কিরণ চুমছে গগণ চুমছে এই ভূবন,
অংশুমালী প'ড়ছে ঢলি সাগর গালে দেয় চুমন।
হায় গো প্রিয়া, বেদীল্ হিয়া কী হবে এই বর্ণনায়
যদি আমার চুমা না দাও এ সব চুমা যায় বৃথায়।

শুধু জেগে থাকার বদলে কাজ নিয়ে থাকি। ঘুম তো কাছে ঘেঁসচেই না। কবিতা চেষ্টা করা যদি অকাজ হয়, হোক্ গে। তা আপনারা যা খুশী বলুন গে। আমার এ নবজীবনে প্রেম ছাড়া অন্য খেয়াল আ'সচে না যে। দোষ যদি দিতে হয়, আমার সঙ্গে ব্র্যাকেটে কোল্‌রিজ্‌কেও জড়ান। তাঁর কাছে—

"All thoughts, all passions, all delights
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of Love,
And feed his sacred flame."

যত চিন্তা, যত আবেগ, যত আনন্দ যা এই মরণশীল দেহটাকে অনুপ্রাণিত করে, সবই তারা প্রেমের কার্যাবাহক, হুকুম বর্দার। এবং প্রেমের পবিত্র শিখাকেই জ্বালিয়ে রা'খতে সাহায্য করে এরা।

রা'ত কটা বেজেচে জানিনে। পরেশদা উঠলেন পেচ্ছাব ক'রতে। ঠাণ্ডার রাতে ও কাজে উঠ্‌তে হয় তাঁর দু'একবার।

পরেশদা ব'ললেন, "হ্যাঁরে, রা'তে কিছুই খেলিনি। আবার তো সাত সকালে চাচা চাচা কোরে চিৎকার ক'রে থা'কবি। তোর ফ্ল্যাস্ক্ ভ'রে নিলিনি কেন ?"

—"ভুলে গেচি পরেশদা।"

—"তুই কি আজ শুবিনি? কী অত লিখছিস্?"

—"বাড়ীতে আর দু'একজন বন্ধু বান্ধবের কাছে চিঠি পত্তর।"

—"রাত জাগিস্‌নি। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ কো'রবে। তোর কি দিনেও বিশ্রাম নেই, রাতেও না?"

—"এই শুই পরেশদা। আর সামান্য বাকী।"

সামান্য বাকী সা'রতে অনেক রাত লা'গলো। অনাহুত, রবাহুত প্রেম আমার জীবনে গরীবের লটারীতে লাখ টাকার মতো এসেচে যখন তখন একে নিয়ে কী করি আর না করি সে উন্মাদিনা আমাকে অস্থির ক'রে তুলেচে। আজ সারা দুনিয়া আমার আপন। মনের দিকচক্রবাল আজ এতো প্রশস্ত যে সেখানে ছোট বড় সকলের জন্যেই আজ শুধু মমতা আর মমতা। মনে হয় ছুটে গিয়ে রাস্তার ঐ নিঠুর গরীবের ছিন্নবাস ছেলেটিকে কোলে নিই, গায়ে মাথায় হাত বুলোই, মিষ্টি কোরে সোহাগ করি। আমার ধন্য প্রেম, আমার শত অভ্যর্থিত প্রেম। যে বিধাতা তাকে গ'ড়েছিলো শত কোটি কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্যে। তাঁকে সামনে পেলে লুটয়ে প'ড়তুম তাঁর পায়ে। প্রেমের দার্শনিক বিশ্লেষণে প্রয়োজন নেই আমার। একে রসগোল্লার মত পেয়েচি, খেয়েচি। এবং খুব মিষ্টি লেগেচে যখন তখন আর শত মতবাদের ঝগড়ায় আমার প্রয়োজন কি? আমি একে উপভোগ ক'রতে চাই কবিতায়, গানে, শিল্পে আমার প্রাণের পেয়ালা পূর্ণ কোরে।

আমার প্রেমের গান যে গেয়েচে আমার প্রাণের ভাষায়, সে আমার আপন জন, পরম বান্ধব। তাই তো ভালোলাগে শেলীকে। অমনি কোরেই ব'লতে পারতুম নিজের ভাবগুলো! পাকা ঘুমের মাঝেও তাকে জাগিয়ে দেয় তার প্রেম। শেলী, তোমার আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমার গাথাটী আমার কোরে নিতে চাই,—

পবন যখন উতলা অধীর
তারকা হাসে আকাশ পথে,
তোমার স্বপন আমায় তখন
জাগায় সখি, নিঝুম রাতে।

গভীর মধুর ঘুমের মাঝে
তোমার স্বপন জাগায় মোরে
মন চ'লে যায় তোমার পাশে
মন জানে সই, কিসের তরে।
নীরব ভুবন উজল গগণ
চাঁদির বরণ নদীর মাঝে
মুর্‌ছে পড়ে বাতাস আজি
বুক ফাটা কোন্ দীর্ঘশ্বাসে ?
সেই বাতাসের সাথে সাথে
প্রেমের সুরভ পড়ে ঝরি'
এমন মোহন স্বপন ভুমে
প্রিয়া তোমায় স্মরণ করি।
বুলবুলির ঐ বুকের কাঁদন
কাতর সুরে বুকেই মরে
অমনি আমি তোমার বুকে
কাঁদবো সখি, জনম ভ'রে।
তোলো, তোলো, আমায় তোলো,
যাই ম'রে সই অসীম দুখে ;
ভালোবাসার বৃষ্টি ঝরাও
চুমায় সাগর চোখে মুখে।

মনমায়া, এ লেখা আমি লিখছি, কি তুমি ? আমিই যদি লিখতুম তো এতোদিন ছিলুম কোথায় ? আমি মিডিয়ম্ ; আমাকে বাহন কোরে লিখছো তুমি। তোমাভিন্ন আমার স্বত্বাকে আমি আর আমার ভা'বতে পারিনে। আজ তুমি আমি, আমি তুমি।

দুদিন আগেও তুমি ছিলে তুমি, আমি ছিলুম আমি। আজও শরীর মন বদলাবদলি হয়নি। কিন্তু বদল হোয়েচে মনের চেহারা। সে চেহারায় আমি গিয়ে দাঁড়িয়েচি তোমার পাশে, আর তুমি এয়েচো আমার ঠাঁয়। ভেতরে ডুবে নিজেকে

যখন দেখতে যাই, দেখতে পাই তোমাকে। তবু ছায়া নিয়ে তৃপ্ত নয় মন। তোমা কায়াকে দেখতে চাই প্রতিমার মত সামনে।

বিরহ বেদনা জাগতিক আর দশটী ব্যথা থেকে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ আলাদ ফাগুনের আগুনে হাওয়ার মত—

"সখি, মিষ্টি ও ঝাল মেশা এলো একি বায়,
এ বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়।"

এ অদ্ভুত বেদনা তো এতোদিন বুঝিনি? তুমিই বুঝিয়ে দিলে। তোম অজ্ঞাতে তাই তুমি আমার নবজ্ঞানদাত্রী।

রক্‌ভিল্ রোডের বড় ঘণ্টায় এক দুই কোরে দু'টো বেজে গেলো। আ জেগে। এই মুহূর্ত্তে সংসারে যত মাতৃহারা, পিতৃহারা, সন্তানহারা, প্রিয় প্রি হারা আমারই মত জেগে র'য়েচে। কিন্তু তাদের আর আমার বেদনার মধ্যে কতইন তফাৎ।

আরও কিছু প'রে ঘুম ঘুম ভাব এলো। অনেকটা কাক-নিদ্রার মত হবে হয়তো। দেখি, আমার মনমায়া এসেচে। চোখে মুখে সর্ব্বশরীরে মায়া জড়ানো। শিয়রে ব'সে আমার চুলগুলোর ভেতরে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে কণ্ঠে সোহাগ জড়িয়ে ব'ললে, 'আমি কাছে নেই, তাই ঘুম আ'সচে না?'

ব'ললুম, 'বিপদ হ'লো মায়া। তুমি কাছে থা'কলেও ঘুম পালিয়ে থাকে। তুমি দূরে থা'কলেও ঘুম টিট্‌কিরি মারে। তুমি যে শাঁখের করাত হ'লে আমার জীবনে।'

সুধাকণ্ঠে ব'ললে, 'রাত জেগো না। শরীর খারাপ হবে। ঘুমও লক্ষ্মীটি। সোনা আমার। মানিক আমার। আচ্ছা, আমি ঘুম পাড়ানি গান গাই। তুমি ঘুমোও। আর চোখে মেরে দিই আমার ঠোঁটের শিল মোহর। আর ঘুম্ আয় . ...।'

পরীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আনত হোয়ে এলো আমার মুখের উপর। কমলা রংয়ের পাতলা ঠোঁট দু'টো মিলিত হোয়ে অগ্রভাব হ'লো সরু। বিদ্যুৎ শিহরণের মত স্পর্শ ক'রলে আমার নিমিলিত আঁখি পল্লব। প্রশান্তিতে ছেয়ে গেলো সারা দেহমন। রাজ্যের ঘুম অসাড় কোরে দিলে কয়েকদিনের উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী।

'হ্যাঁ হে, ওহে ছোক্‌রা, এ জাঁহাঙ্গীর, ন'টা বেজে গেলো। এখনও ঘুমিয়ে থা'কবি?' পরেশদা ডা'কচেন। অমৃত স্পর্শিত নয়ন যুগলের ঘুমঘোর তখনো কাটেনি। শুধু কানে শুনতে পাচ্চি কথা। "তোর সবই অদ্ভুত বাবা। দিনভর টো টো ক'রে ঘুরবি। সারারা'ত জা'গবি। কোনও দিন সাত সকালে উঠবি। কোনও দিন ন'টা দশটা অবধি ঘুমোবি। এমন ছেলে তো দেখিনি বাবা।" পরেশদা ব'লে চ'ললেন।

"একটা খবর আছে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নে।" ততক্ষণে বিছানায় উঠে ব'সেচি। খবর আছে! বাড়ীর কোনও মন্দ খবর নয় তো? এতদিন লেটার বক্সও তো দেখা হয়নি। দেখবে কে? সৈয়দ আকবর হোসেনের একমাত্র পুত্র সৈয়দ জাঁহাগীর হোসেন এখন স্বপ্ন রাজ্যের বাদশাহ। একটী লাল মুখ ও একটি প্রণয় সবুজ মনের বদলে সে বিলিয়ে দিয়েছে খুলনা আর সৈয়দ পরিবার। আমি ভালো কোরে নিরীক্ষণ ক'রেচি আমার মায়ার গালে কালো কেন কোনও তিলই নেই। সেটি একেবারেই নিখুঁত। চাঁদে কালো দাগ আ'ছে। উপমা ফেলে দিন্ আস্তাকুঁড়ে। উপমাবিহীন আমার মায়া চাঁদের চেয়েও সুন্দর। আর ততোধিক সুন্দর তার পাহাড়িয়া শিশু সরল মন।

হাফেজের সৌন্দর্য্য-বোধ আলাদা। প্রিয়ার কপোলের একটি তিলের জন্যে তিনি তখনকার দিনের তাঁর জ্ঞাত সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর সমরখন্দ আর বোখারা হেলায় বিলিয়ে দিতে পারেন, যদিও এটা তাঁর নিছক ভাব বিলাস।

আর মায়ার পুরো সত্বাই আমার ভালো লেগেচে। শুধু বাইরের রূপ সায়রে আমি সিনান করিনি। আমার মনকে যদি চুরি কোরে থাকে তো মায়ার মন। Similar begets similar. এক জাতীয় যেমন পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ অনুভব ক'রে থাকে।

হাজারো হোক্। তবু রক্তের আকর্ষণও তো একটি থা'কবেই। তাই পরেশদার কথায় একটু ভীত হ'লুম। জিজ্ঞেস কোরে জেনে নিতে সাহস হচ্চে না।

"আরে, একটি আনন্দ সংবাদ। তোকে কা'ল ব'লতে ভুলে গেচি। আর বলি কাকে। তুই তো একটি হাওয়া। আজ আমাদের একটি দল পিক্‌নিকে

যাচ্ছি। তোরও যেতে হবে। গান গাইবি। আমি সকলকে ব'লেচি সে ক
পরিতোষ স্বরোদ বাজাবে। হেরদয় বাঁয়া তবলা। দেরী না, উঠে পড়্।'

এই আনন্দ সংবাদে আমার হৃদস্পন্দন থেমে যায় আর কি। সর্ব্বনা
একটী দিনের অদর্শন। আমি মারা প'ড়বো। আমার বনভোজনে দরকার ে
মনভোজন চাই। পরেশদার কথা ফেলি কি কোরে? ভাবনায় মুখখানা বোধ
বিবর্ণ হোয়ে থা'কবে। নইলে পরেশদা ব'লবেন কেন?

"হ্যাঁরে, অমন হাঁ কোরে তাকিয়ে রইলি কেন? মনে হ'চ্ছে মুখে যে
রক্ত নেই। তোর হ'লো কি?"

"দেহখানা আজ আমার ভালো যাচ্ছে না পরেশদা। আজ আমি কিছু
খাবো না ভা'বচি।"

'আরে, ও কিছুই নয়। ক'দিন অবিরত ঘোরাফেরা আর অনিদ্রার জন্যে
অমন মনে হ'চ্ছে। বাব্বাঃ, একটী ছেলে বটে। অনেক ছেলে দেখেচি বাং
কিন্তু তোর মত আর ... ...। নে, নে, দেরি করিস্নি। বেবি অষ্টিনে যাব
হাঁটতে হবে না। জায়গা ভালো,—লয়েড বোটানিক গার্ডেন। চুপচাপ মে
শুয়ে থা'কবি। রান্না হবে। কিছু মুখে দিলি আর নাই দিলি। শরীর মন
তাজা হবে তো! প'ড়েচিস্ তো ডাঃ জনসনের কথা—We that live t
please, must please to live?'

অজুহাত বৃথা। নাছোড় বান্দা। আজ একটী দিন ভদ্রতার মুখো
ঢেঁকি গিলতে হবে।

"যাওয়ার বোধহয় এখনো দেরী আছে। আমি ঘণ্টাখানেকের ভেতে
একটী জরুরী কাজ সেরে চ'লে আ'সচি।'

মতলব, মনমায়াকে ব্যাপারটী ব'লে আসি। পরেশদা ব্যাগ্রতার সঙ্গে
ব'লে উঠলেন, "ওরে, না, না। এক ব্যাচ পুর্ব্বে চ'লে গ্যাচে। আমি তোর
জন্যে অপেক্ষা ক'রচি।"

মহাবিপদ। কোনও কূল কিনারা নেই। বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে
বাধ্য হলুম।

ইডেন স্যানিটারিয়ামের নীচে বোটানিক গার্ডেন। আড়ে প্রস্থে বিয়াল্লিশ
বিঘে জমি। কত দেশের কত প্রকার গাছ গাছড়া। অষ্ট্রেলিয়ান ইউক্যালিপটস্

চাইনিজ ক্যামেলিয়া, জ্যাপ্যানিজ উইজটারিয়া, সব পাবেন। ঠিক মাঝখানে পিক্‌নিক্ পার্টির জন্যে তাঁবুঘর। আরও আধ মাইল টেক উত্তর দিকে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

সবই আছে, কিন্তু দেখবে কে ? যে জাহাঙ্গীর নয়ন ভ'রে দেখতো, আনন্দ পেতো, সে আজ অনুপস্থিত। এতক্ষণে সে হাজির সিংহমারীর সেই অনতিবৃহৎ কাঠের বাড়ীটিতে। মনমায়াকে নয়ন ভ'রে দেখচে সে। কথার জলপ্রপাত দু'জনের সময়কে নিতান্ত সংকীর্ণ কোরে আ'নচে। বলিহারি মনের দৌড়। নইলে এ গার্ডেনে কি অবস্থা হ'তো আমার।

পরেশদা জাহাঙ্গীর ব'লে যাকে ধ'রে এনেচেন সে তো এখন একটি খোলস মাত্র।

ওদিকে রান্না হ'চ্চে। বিরিয়ানী, মুরগীর কোর্মা, খাসীর কালিয়া, আরও আরও। এদিকে পরিতোষদা স্বরোদে কত রকমেরই না সুরের অপরূপ ব্যাঞ্জন পরিবেশন ক'রচেন। কয়েকজন আবেগ প্রবণ সঙ্গীত রসিক আহা উহু শব্দে পরিতোষ সহকারে উপভোগ ক'রচেন সে সুর মুর্চ্ছনা। আর হৃদয় অধিকারীর তবলার সংগত। একেবারে মানিক জোড়।

পরেশদা শুধু নামকেত্তন ক'রতেন তাই শুধু জানতুম। সেই পরেশদা আজ তানপুরো সহযোগে কত সুরই গাইলেন। একেবারে সুরসাগর। অবাক মেরে গেলুম।

আমাকে গাইতে বলা হ'লো। ব'ললুম, 'আমায় আর লজ্জা দেবেন না। শেষে পাহাড়ীরা খুক্‌ড়ী হাতে ছুটে আসে তো আপনাদের পিক্‌নিক্ আর জীবনে ক'রতে হবে না।'

বললেন সবাই, 'হোক্ গর্দ্দভ রাগিনী তবু গলা খুলতেই হবে। আচ্ছা। কোন রকমে ধ'রলুম,—

'ব্যথার পানে সে যে আমায়
চেয়ে গেলো বারে বারে।
কেমন কোরে ভুলবো তারে, ভুলবো তারে।'

আনন্দে উল্লসিত হোয়ে পরেশদা মন্তব্য ক'রলেন, 'ওহে ছোক্‌রা, এরকম সুরেলা কণ্ঠ নিয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্চো ?

তারপর অনুরোধের আসরে আরও দু'একটি গাইলুম। গজল জাতীয়। আমার বুক চাপা বিরহ বেদনা কথায় ও কণ্ঠে ফুটে উঠেচে। আমার শুধু কান্না পা'চ্চে। এ সময় মায়া কাছে থা'কতো! মায়া অভাবে সবই আমার কাছে মায়াহীন, স্বাদহীন।

খানাপিনা আনন্দ উল্লাস শেষ হ'লো সেই প'ড়্‌তি বিকেলে। স্যানিটারিয়ামে ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে।

অধীর অসহিষ্ণুতায় সারারাত নরম বিছানা কাঁটার মত ফুটেচে।

——::——

"সাত"

আগের রাতের পুরো ছবি আঁ'কবো না। বুদ্ধিমান আপনারা, অনুমান কোরে নেবেন।

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে ব'লি'
এত ভোরে কোন ছলে মায়াবাড়ী চলি ?

দুরাত্মার নাকি ছলের অভাব নেই। ইচ্ছে থা'কলে ছলের অভাব দুনিয়াতে কোনও দিনই হয়নি। আর কিছু না থা'ক, প্রাতঃভ্রমণ তো আছেই। বিশেষ কোরে আমি স্বাস্থ্য অনুসন্ধানে এসেচি।

দার্জ্জিলিং-এর কুয়াসা ভেদ কোরে আমি চ'লেচি। সিংমারী নর্থ পয়েন্টের মায়াবাড়ী কুয়াসার মায়ায় ঢাকা। কাছের মানুষ চেনা যায় না। দু'একজন গরীব পাহাড়ী ছুটেচে রুজির তাগিদে। সম্ভবতঃ এরা হোটেল ও বাসাবাড়ীর চাকর। এদের সঙ্গে দেখা হয় আর আপন মনেই আঁ'ৎকে উঠি।

মায়াবাড়ী পেরিয়ে লেবংস্পারের দিকে গেলুম। কয়েকটি চক্কোর মেরে আবার ফিরে এলুম মায়াবাড়ী। সবাই হয়তো উঠি উঠি কো'রচে। কিন্তু কেউই উঠ্‌চে না। এমন কি আ'লসে সূর্য্যিও।

কি করি? আবার ঘোড়দৌড় দিতে থা'কলুম। কয়েক বারের পর দোকান ঘরের ঝাপ খোলা হ'লো। তখন সকাল আট সাড়ে আট হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো হাজির হওয়া ঠিক্ নয়। আরও কিছু সময় এদিক ওদিক দেরী কোরে দোকানের সামনে দাঁড়ালুম।

মায়া দোকানে ধূপধূনো দিচ্চে। এবং মনে মনে হয় বুদ্ধকে, নয় এ বুদ্দুকে স্মরণ কোরে মন্ত্রপাঠ ও প্রণাম ক'রচে। আমার দিকে নজর ক'রতেই প্রাণভরা আবেগ নিয়ে ডা'কলুম, "মায়া,…"

চকিতে ধূপদান রেখে ব'ললে, "এই যে, নমস্কার মহাশয়।"

ব'ললুম, "মায়া, কা'ল আসতে পারিনি…"

কথার মাঝখানেই সে নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলে, "নিজের কাজ ফেলে আ'সবেন কেন? এখানে কোন্ আকর্ষণ, কোন স্বার্থ আছে আপনার?"

স্পষ্ট অভিমানের সুর। কিন্তু বেশ মিষ্টি লা'গলো।

আমিও ছা'ড়লুম না। ব'ললুম, "দেখো, এমনিতেই ম'রে যাচ্চি। তুমি কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিও না ব'লচি।"

ব'ললে সে, "কাল দিনরা'ত আমোদ প্রমোদে বাবুর মনে কি ঘা হ'য়েছে নাকি?"

ব'ললুম একটু জোরের সঙ্গে, "হ্যাঁ। উঠো তুমি।"

"কোথায়?"

"আমার সঙ্গে। দোকান বন্ধ করো।"

"দোকান বন্ধ কোরে, মরিচিকার পেছনে ছুটলে, আফ্‌ছোছ্-ই সার হবে। ভাত ভিক্ষে জুটবে না। আমরা জাহাঙ্গীর বাদশার মত বড় লোক নই।"

"তোমার পায়ে ধরি মায়া, আমাকে আর কাঁদায়ো না। 'স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লব মুদারং।' তোমরা কত গরীব সে আমি জানি। আমার ভয়ানক বিপদ। তুমি উঠো।"

এবার সে আর স্থির থা'কতে পা'রলে না। মুখে চোখে আতঙ্কের ভাব। অভিমানের মুখোশ এক মূহুর্তেই খ'সে প'ড়লো। ব'ললে, "বিপদ? কী বিপদ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বলো। বলো, কী বিপদ, কি হ'য়েছে তোমার?"

মুখ ভার কোরেই ব'ললুম, "উঠে এসো, ব'লচি। এখানে বলা হবে না। রাস্তায় যেতে যেতে, ব'লবো। সে খুব সাংঘাতিক গোপনীয়।"

তাড়াতাড়ি ঝাপ বন্ধ ক'রলে। এবং রাস্তায় এসে আমার পাশে দাঁড়ালে। ব'ললুম, "চলো ঐ বার্চহিল্ পার্কে।"

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে যাবার পর সে মুখ খুলেলে। তার আতঙ্ক ভাব কাটেনি। "যেতে যেতে বলো। কী ঘ'টেচে তোমার? আমি সইতে পা'রছি না।"

"বিপদ এই যে, কাল আমাকে একদল লোক জোর কোরে ধ'রে নিয়ে যায়। এবং সমস্ত দিন বোটানিক্ গার্ডেনে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আ'টকে রাখে।"

"তারপর?"

"তারপর সন্ধ্যেয় ছাড়া পেলুম।"

"তখন কী ক'রলে?"

"বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারারা'ত কাঁদলুম।"

"মেয়ে মানুষের মত কাঁ'দ্‌লে? পুলিশে খবর দিলে না কেন? আমায় জানালে না কেন? দেখতাম কী কোরে আ'টকায় তোমায়।"

"কী ক'রতে তুমি? তুমি তো মেয়ে মানুষ।"

"কী ক'রতাম? পুলিশ নিয়ে গিয়ে হাজির হতাম। আমি মেয়ে মানুষ বটে। কিন্তু লেখাপড়া জানা, হিম্মতওয়ার, স্বাধীনা পাহাড়ী মেয়ে। দেখতে তুমি, কি ক'রতাম। বাছাধনদের জন্মের মতো শিখিয়ে দিতাম। এখনো বলো। পাড়ার পাহাড়ী আত্মস্বজনকে এ অত্যাচারের কথা ব'লে এর শোধ তু'লবো।"

এইবার আর কপট গাম্ভীর্য্য রাখতে পা'রলুম না। হেসে ফেললুম।

রেগে ব'ললে সে "হাসলে যে বড়ো?"

ব'ললুম, "আমার বিপদ আরও বেশী এই জন্যে যে স্নেহের অত্যাচারের শোধ লাঠিতে ওঠে না।"

তারপর আদ্যোপান্ত কাহিনী ব'লে, তার অদর্শনে আমার কত কষ্ট হয়েচে, সে কথা ফেনিয়ে বিনিয়ে ব'ললুম।

সে আশ্বস্তির সঙ্গে ব'ললে, "ও, এই কথা। তুমি যেমন আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে, তেমনি ধরিয়ে দিয়েছিলে রাগ।"

ব'ললুম, "মায়া, তুমি কি মনে করো ইচ্ছে কোরেই কা'ল আমি আসিনি? অভিমান কোরে একেবারে তুমি থেকে আপনি?"

ব'ললে সে, "বাস্তবিক। কী ভাবে আমার দিনরাত কা'ল কেটেছে সে আমি জানি। মোটে সুখ পাই না। খেয়ে না, ব'সে না, শুয়ে না। আমি বাঁ'চবো কি কোরে?"

ব'ললুম, "আমিও যেমন কোরে বাঁ'চবো, তুমিও তেমনি কোরেই। কিন্তু কথা হ'চ্চে, তোমার বাবা মা কি ব'লবেন?"

—"বাবা মা আমার খুবই ভালো মানুষ। অমন মানুষ আর হয় না। মাকে তো দেখেছো। কা'ল এলে বাবাকে দেখতে পেতে। দশ পনেরো দিন পর পর শুকিয়া পোখ্‌রী থেকে তিনি বাড়ী আসেন। বর্ত্তমানে একমাত্র সন্তান আমি। উভয়ে স্নেহ মমতা যেমন করেন, বিশ্বাসও করেন তেমনি। কথায় কথায় তোমার কথা কা'ল ব'লেছি তিনি তোমায় দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু বিকেল অবধি তুমি এলে না। আমার খুব রাগ হ'লো। তিনি দেরী ক'রে দেরী ক'রে চ'লে গেলেন।"

ব'ললুম, "কিন্তু কথা হ'চ্চে, 'কন্যা বরয়েতে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতম্, বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। আমার তো কিছুই নেই।"

—"দ্যাখো, আমি পালি প'ড়েছি। আমাদের ধর্ম্ম ভাষা। সংস্কৃত পড়িনি।"

—মৃদু হেসে ব'ললুম, "আমি যে সংস্কৃত জানি তাও না। তবে সাহিত্য ও চিন্তা সম্পদের জন্যে ভাষাটিকে ভালোবাসি। যেমন ভালোবাসি অন্যান্য ভাষা-কেও। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রবো এম্-এ তে। কিছু নাড়াচাড়া কো'রতে গিয়ে এখানে ওখানে ছিঁটে ফোটা যা ভালো লেগেচে তাই মনে রেখেচি।"

—"তা যেন হ'লো। কিন্তু মানে তো ব'ললে না?"

ব'ললুম, "ও—ও। সেই কথা। বীরভূমের কেন্দুবিল্বের কবি জয়
গীত গোবিন্দে শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের সময় গোবিন্দ যা ব'লচেন, তার সার ক
'রাধিকে, আমার ঘা'ট হ'য়েচে। তুমি অভিমান ভরে আর মুখ তেঁতো ক
রেখো না। তার চেয়ে আমার অপরাধের জন্যে আমার মাথা মোড়াও। অ
তোমার পা দুখানি আমার বুকে দাও।' আর দ্বিতীয় শ্লোকে ব'লচে যে বর নির
পনের ব্যাপারে ক'নে নিজে চায় বরের রূপ, মাতা চায় টাকা, পিতা প্রতিষ্ঠা, বন্ধু
বান্ধব কৌলিন্য আর অপর লোকেরা মুখে মিষ্টি। তাই তো ব'লছিলুম আমার ন
আছে রূপ, না টাকা, আর না প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বর হিসেবে বাজার দর আমার
নিতান্তই মন্দা। আর তোমার তুলনায়, কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে।"

—"এটা সত্যিই তোমার ধারণা? না গর্ব্বিত বিনয়?"

—"তো আমি কি ধারণা কোরে ব'সে আছি যে আমার মত রূপবা
ধনবান ও প্রতিষ্ঠাবান আর কেউ নেই?

—"বাহাদুর তার্কিক। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার মন্দ ফন্দি নয়। আমি
ব'লছি তোমার রূপ নাই গুণ নাই কিচ্ছু নাই। কাজেই তোমাহেন গুণহীনে
আমি ছাড়া গতি নাই। অতএব আমি ব'লছি, স্যানিটারিয়াম ছেড়ে মহারাণী
প্যালেসে তোমার আসা দরকার।"

—'সে তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি থা'কবে কোথায়?'

—'কেন? মা'র কাছে,—যেমন বরাবর থাকি। তুমি থা'ক
কুঠরীতে। আর দিনভর বেড়াবো আর গল্প ক'রবো।'

—'এনিয়ে সমাজে কথা উঠবে না?'

—'কথা উঠবার তো কিছুই নাই। বন্ধুত্ব আর পাপ আলাদা জিনিস।
স্ফুর্ত্তিবাজ পাহাড়ীদের মধ্যে সমাজের বাঁধন তেমন কড়া নয়। ধর্ম্মের দিক থেকেও
বিরাট কোনও অসুবিধে নাই। তোমাদের যে যে সময়ে পাঁচবার নামাজ প'ড়তে
হয় আমাদেরও প্রায় ঐ ঐ সময় পাঁচবার উপাসনা ক'রতে হয়। আমরা বৌদ্ধ
তাই ব'লে নিরামিষাশী নই। গরুকে আমরা দেবতা বলি না। ভক্তিভরে ভক্ষণ
করি। তবে নিজেরা হত্যা করি না।'

আমার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হ'লো ওদের বৈবাহিক রীতিনীতি জা'নতে। তাই জিজ্ঞেস ক'রলুম, 'আচ্ছা মায়া, পাহাড়ীদের মধ্যে বিয়ে শাদীর রীতিনীতি আমার জা'নতে বড় ইচ্ছে করে।'

মায়া বললে, 'বেশ। শোন তবে। এদের মধ্যে বহু প্রকারের বিয়ে আছে। ক'নের জন্যে বরকে যৌতুক দিতে হয়। তার নাম 'রীত'। ভূটিয়া লেপচাদের মধ্যে বরকে শুধু শ্বাশুড়ীর বাড়ী একটি চুক্তি অনুসারে বাস ক'রতে হয়। যদি শ্বাশুড়ী এপ্রেন্টিস্ বরকে বিনয়ী ও মেষশাবকের মত নিরীহ দেখতে পায় তো বিয়েতে সম্মতি দেয়। নেপালীদের মধ্যে দু'রকমের বিয়ে আছে। প্রথমে প্রেম, পরে অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে বিয়ে। দ্বিতীয় প্রকার বিয়ের নাম 'চুরিয়া বিয়া'। এটি প্রায় গন্ধর্ব্ব বিয়ের মত। প্রলোভন ও বিবাহ বিচ্ছেদ যথেষ্ঠই আছে। আমাদের মধ্যে বিধবাদের পুণর্বিবাহে শাস্ত্রগত ও আইনগত কোনও বাধা নিষেধ নাই। প্রচলনও যথেষ্ঠই আছে। বহু বিবাহও প্রচলিত। আর তিব্বতীদের মধ্যে যে বহুভর্ত্তা প্রথা চালু আছে সে তো তুমি জানোই আশা করি। নেপালীদের মধ্যে বহু উপভাষা আছে। এক জায়গার ভাষা অপরে বুঝতে পারে না। তবে তোমাদের হিন্দুস্থানী ভাষার মত খাস্-কুরুস্' ব'লে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত, ঠিক Lingua francaর মতো যা দিয়ে সব নেপালীদের কাজ কারবার চলে।'

আমি ব'ললুম, 'মায়া, তোমার বাংলা ভাষার দখলে আমি অবাক হোয়ে যাই।'

সে জবাব দিলে, 'তার কারণ তো পূর্ব্বেই ব'লেছি। বাংলা শিখবো এ আমার আশৈশব সাধ। আমার নিজের বান্ধবী ছাড়াও বড় ভাইয়ের অনেক বাংগালী বন্ধু ছিলেন। দাদাও ভালো বাংলা জা'নতেন। বাবার সঙ্গে ক'লকাতায় গেছলাম একবার। তা থা'ক্। এবার বলো কোথায় যেতে হবে।'

'খুলনায়।'

'ইস্। সে সাহস আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। আমি পুরুষ মানুষ। যুবক।'

'ভারী তো বড়াই। যুবক অনেকই থা'কতে পারে। পুরুষ সবাই নয়। পৌরুষের অভাব অনেকেরই আছে।'

'তুমি কি ব'লতে চাও আমারও আছে ?'

'জানি না। পরীক্ষার সুযোগ তো এখনও আসেনি।'

'আ'সতে দাও। প্রমাণের সুযোগ এলে, ফেল্ ক'রবো না জেনে রেখো।'

'ভালো, ভালো। পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খল.....'

কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললুম, 'ভাঙ্গবো। মানুষই সমাজ ভাঙ্গে গড়ে। যে সমাজে মানবাধিকারের এতটুকুন মুক্ত বাতাস নেই সে সমাজকে ভেঙ্গে গ'ড়তে হবে সাহসের সঙ্গে। মানুষের জন্যেই সমাজ। সমাজের জন্যে মানুষ নয়। দুর্ব্বলকে সমাজ গড়ে। আর সমাজকে গড়ে সবল ব্যক্তিত্ব।'

'আর পরিবারের পরিবেষ্টনী ? তার শৃঙ্খলও তো সহজ নয় ?' মন জানাজানির প্রশ্ন করে সে।

ব'ললুম, 'বটে। কিন্তু যেখানেই স্ত্রী পরিজন, সেখানেই পরিবার অত সন্দেহ ক'রচো কেন ?'

'শেষে কি আমায় নিয়ে বিদ্রোহ ক'রবে বাপ মা'র সঙ্গে ?'

'বিদ্রোহ নয়, যদি একান্তই হয় তো সে হবে অভিমান। আর তার পরিণামে হয় সন্তানের জয় বাৎসল্যের অধিকারে। তুমিও কি পা'রবে না বাপ-মা'র হৃদয় জয় কো'রতে ?'

আত্ম প্রত্যয়ের হাসি নিয়ে ব'ললে, 'আসুক তো সে সময়। কিন্তু এখন চ'লেছো কোথায় ? এ তো খুলনার পথ নয় ? এ যে বার্চ্চহিলের পথ।'

"আপাততঃ ঐখানে। পার্কে।" জবাব দিলুম।

সামনেই খাড়া পাহাড়। উঠবার সহজ পথ পেছনে ফেলে এসেচি। ব'ললুম তাকে, 'ওঠো এইবার।'

'পথ কোথায় ?'

'তৈরী কোরে নাও পাহাড়িনী। জীবনের চলার পথ আরও দুর্গম। তার উপর সঙ্গে যদি নারী থাকে।'

'নারী নরের পথ-চলাকে সহজও কোরে আনে। এই দেখো না।' ব'লেই তরতর কোরে ক্ষিপ্রপদে পাহাড়ে উঠে যেতে লা'গলো সে। এক জায়গায় সত্যি-

কারের একটি খাড়া স্লোপ্ ডিঙ্গিয়ে উপরে দাঁড়িয়ে বিজয়িনীর হাসি হেসে কৌতুকের সঙ্গে ব'ললে, 'এসো। অত পেছনে প'ড়ে রইলে কেন?'

কিঞ্চিৎ ছদ্মবেশী আতঙ্ক-ভরা মুখ নিয়ে ব'ললুম, 'ওরে সর্ব্বনাশ! অত জোরে কেন? আমার হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখি, আমি যে গো পথ চিনিনে।' হাত বাড়িয়ে দিলুম। টেনে তুললে সে। হেসে ব'ললে এবার 'উল্টো হ'লো কিন্তু।'

'হোক্ উল্টো। সবক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীন সিধে হবে তার তো কোনও নজির নেই মানুষের ইতিহাসে। উল্টো সিধে, আর সিধে উল্টো, এই নিয়েই তো তোমার আমার জীবন।'' কাজে না পারি, কথায় তো বীরপুরুষ।

আরও দু'এক জায়গায় চড়াই উৎরাই ক'রতে ক'রতে আমার হাঁপানী ধ'রে গেলো। আমার অবস্থা দেখে মজা ক'রে ব'ললে, 'কেমন? উল্টো সিধে হ'চ্ছে এবার? কই, আমি তো হাঁপাচ্ছি না? সরল পথে চলার মার নাই। বাঁকা পথে চলার বিপদ অনেক। টম্‌টমের ঘোড়ার মত এত হাঁপাবে জা'নলে মল চৌরাস্তা ধ'রেই আ'সতাম আমরা।'

'তোমার পথটিই যে বাঁকাপথ গৌরী। তোমাকে পেতে গেলেই যে আমাকে বহু চড়াই উৎরাইয়ের বেড়া ডিঙ্গুতে হবে। নকুড় মামার কথা মনে পড়ে? 'দার্জ্জিলিং কি জায়গারে বাবা, চ'ললে হাঁপানী, থা'মলে কাঁপুনী।'

'কোন নকুড় মামা?'

''পরশুরাম' রাজশেখর বসুর নকুড় মামা?'

'তিনি আবার কে?'

বুঝলুম বইখানা পড়েনি। বললুম, 'তবে আজ আর পরিচয়ে কাজ নেই। বিশদ পরিচয় দেবো বইখানি তোমার হাতে দিয়ে।'

এতক্ষণে পৌচে গেচি পার্কে। সিধে তাকে নিয়ে গেলুম আমার নিত্যি-কার ব'সবার আসনে। 'এই যে খট্‌খ'টে জায়গাটি দেখতে পাচ্চো,—আহা-হা, জুতো শুদ্ধো মাড়িয়ো না হোথা,—এটি পরম সাধু প্রবরের ধ্যানের আসন।'

'কি রকম?'

'তবে দাড়াও। হাতে কলমে দেখিয়ে দিই।' মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর কোরে, ধ্যান স্তিমিত নেত্রে, পদ্মাসনে ব'সে গেলুম। সামনে গৌরী, সম্ভবতঃ কৌতুক হাস্যে জিজ্ঞেস ক'রলে সে, 'সাধুজীর ইষ্ট মন্ত্র কি জা'নতে পাই কি?'

'অবশ্যই। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মনমায়া রূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্তে নমস্তস্তে নমঃনমঃ।'

"মনমায়া দেবীকে দেখার পূর্ব্বে কার ধ্যান হ'তো?"

"মনমায়া দেবীর মতনই ধবলা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। তাকে ধ্যান ক'রতে গিয়ে কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চনীকে বর স্বরূপ লাভ কোরেচি।"

"এখন ভক্তাধীন দেবী ভক্তের প্রসাদ ভিক্ষে করে সাধুজী।"

"তাই লহ দেবী, ভক্তের প্রসাদ প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা।" কোটের ঘড়ি-পকেটে সুন্দর একটি বনফুল ছিলো। প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ তাই গুঁজে দিলুম তার খোঁপায়। কাছে টেনে বসালুম তাকে। মোহাবিষ্টা মন্ত্রমুগ্ধা হরিণীর-চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলে সে কিছুক্ষণ আমার চোখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে প্রেম-নেশাঘোর তন্দ্রাতুরা বিবশা শিরোভার এলিয়ে দিলে আমার কাঁধের উপর। দ্রুত তালে শ্বাস প্রশ্বাস বইচে। মুখের ভাষা স্তব্ধ হোয়ে এসেচে। হৃদয়ের ভাষা সংকেত ধ্বনিদ্বারা কত কথাই না ব'লচে। টরেটক্কা লাব্‌ডাব্‌। আমি তোমার,—একান্তই তোমার। শুনতে কি পাও প্রাণের ভাষা, ও গো মনচোর? প্রকৃতির সাড়া শব্দ নেই। নিস্তব্ধ উন্মুখ আগ্রহী প্রকৃতি শুনছে তার মানব মানবীর প্রাণের ভাষা, প্রেমের মর্ম্মকথা। আনন্দিতা সে। নন্দিতা সে। ভা'বচে সে, ভুলের সন্তান, দুর্ব্বলতার সন্তান মানব মানবীর বুকে প্রকৃতির নিজ হস্তের পরম শ্রেষ্ঠ দান আজ স্বার্থকতার স্বকীয়তায় এক জোড়া ফুলের মত এক বৃন্তে বিকশিত হোয়ে উঠেচে। মহাকাল তার অদৃশ্য হাতের তুলি দিয়ে আঁকছে এ অমর ছবি মানব মানবীর স্বাভাবিক হৃদয়ের প্রতীক চিহ্ন রূপে।

কতক্ষণ কেটেচে এ ভাবে। কতক্ষণ তা জা'নতে পারিনি আমি,—জা'নতে পারেনি সে। নব ঊষার ধীরে—অতি ধীরে আগমনের মত, নব বধুর সলজ্জ মন্থর চরণ ফেলার মত কোরেই প্রেমাবেশ কেটে ধুলির ধরায় ফিরে এলো সম্বিত। চোখের মত্ত আবেশ ষোল আনা কাটেনি তখনো। মনমায়া একবার চোখে চোখে

মাতাল দৃষ্টিতে চাইলে। তারপর আবার রেখে দিলে শিরোভার আমার কাঁধের'পর। সে এখনো স্বপন দেখ্‌চে। সে নেই এ রাজ্যে। যেমন আমিও ছিলুম না এই তু'মূহুর্ত্ত পূর্ব্বে। কত রঙীন, কত পূর্ণ সে রাজ্য। ব্যথা নেই, বিচ্ছেদ নেই, শোক নেই, হাহাকার নেই, অভাব নেই। কল্পতরু জগত। যা কল্পনা করা যায় তাই সঙ্গে সঙ্গে ফলে যায়। মন ফিরে আ'সতে চায় না এ বাস্তব-কঠোর তুনিয়ায়। এখানে যা চাই তা পাইনে, যা পাই তা চাইনে। যা পেলে খুশী হই সে তো আমারই মনের গড়া,—কল্পনা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, মায়ামমতা দিয়ে। আমার মন-মায়াকে তো আমিই গ'ড়েচি, যেমন গ'ড়েচি আমার পিতামাতা ভাই বোনকে। তাই তো আমার মনমায়াকে, আমার পিতা মাতা ভাই বোনকে আপনি ততদূর ভালোবাসেন না যতদূর ভালোবাসি আমি। কই, আমার মত আপনি তো পাগল হন নি আমার মনমায়ার জন্যে? সে অর্দ্ধসৃষ্টি খোদার, বাকী অর্দ্ধেক আমার,—খোদাদত্ত শক্তি দিয়ে।

এখন আর সে শুধুমাত্র মানবী নয়,—ধ্যানের ছবি। ধ্যানের ছবি বটে।

কিন্তু আমার এই ধ্যান আর ঐ সাধু দরবেশদের ধ্যানে কতটুকু পার্থক্য আছে? তাঁরা যাঁকে ধ্যান করেন তাঁকে নিয়ে থা'কতে পারেন অগণিত সময়। আমিও পারি আমার ধ্যানের ছবিকে নিয়ে। ধ্বনিহীন কত কথাই হয় সেখানে জিভ্‌কে মুখগহ্বরে ঠোঁটের তালাচাবি দিয়ে বন্ধ কোরে। নইলে এতক্ষণ কা'ট্‌লো কি কোরে?

উর্দ্ধ আকাশে ভাব-বিভোর আঁখি তুটি তুলে ধ'রে দেখি, আকাশ ভুবন ছেয়ে গ্যাচে তুপুর সূর্য্যের অজস্র হাসির জ্যোতি ধারায়। আনন্দে উপচে প'ড়চে তার প্রাণের নর্ত্তন। বড্ড খুশী সে এক জোড়া প্রাণকে আজ একাত্ম ভাবে দেখে।

—::—

তাই ব'লে কি লিখবো, আব্বা, এখানে তোমার গুণধর পুত্র এক পাহাড়িনীর প্রে
প'ড়ে মাথা মুণ্ডু সব খুইয়ে ব'সেচে? তোমরা আছো কি নেই তাও তার ভু
হোয়ে গ্যাচে। তোমরা যে চিঠি দিতে পারো তাও তার মন মগজে আর ঢোকেনি
তবে হ্যাঁ, টাকা পাঠানো যদি বন্ধ ক'রতে তবে বাছাধনের মগজটা হ'য়তো এক
ঠাণ্ডা হোয়ে আ'সতো। কিসের আ'সতো! মনমায়ার বাড়ীতে একেবারে পা
হোয়ে যেতুম। তার বাবা মাকে বানাতুম বাবা মা। আত্মসমর্পণ ক'রতুম
নাড়ী-মরা ছোট্ট বাঙ্গালী পেটের চা'রটি ভাত কি জুটতো না পাহাড়ে? মন-
মায়া কিছুতেই ফেলতে পা'রতো না। আর তার খাতিরেই তার বাবা মাও কিছু-
তেই ফেলতে পা'রতেন না। অপরের গলগ্রহ? না। একেবারে গলগ্রহ হোতে
যাব কিসের জন্যে? এইতো কেবলি জা'নতে পারলুম উচ্চশ্রেণীর অনার্স সহ ডিগ্রি
লাভ কোরেচি। তবে? কিছু না হোক্, মাষ্টারিও কি জুটতো না একটা? তা
হোক্। পরের চিন্তা পরে হবে। আপাততঃ বিশ্বাসযোগ্য জবাব তো একটা দিতে
হবে বাপ মাকে। যে মাথা দিয়ে অনার্স লাভ কোরেচি সে মাথা দিয়ে মিথ্যের
অনার্সও কি একটা তৈরী কোরে নিতে পা'রবো না? যদি সত্যি বলি শরীর মন
আমার আশাতিরিক্ত ভালো হোয়ে গ্যাচে তা হ'লে তো কালই ছা'ড়তে হয় আমার
এ ভূস্বর্গ। আর ছা'ড়তে হয় ততোধিক প্রাণারাম আমার মনমায়াকে। অতএব
আমাকে লিখ্‌তেই হ'লো যে পরীক্ষার খবরে যদিও আমি খুশী কিন্তু শরীর মন
আমার এখনো তাজা হয়নি। ক'দিন সর্দ্দিজ্বরে খুব ভুগচি। তাই ঠিক সময়ে
চিঠিও পাইনি. জবাবও দেয়া হয়নি। মেহেরবানী কোরে নিজগুণে তিনি যেন তা
প্রিয় পুত্রের দোষ ক্ষমা করেন এবং আরও দু'শো টাকা সত্বর পাঠিয়ে দেন।
বোনদেক চাঙ্গা কোরে দিলুম যে আসার সময় তাদের জন্যে দার্জ্জিলিংএর ভাল ভাল
কমলা, আনারস নিয়ে আসবো আর আ'নবো ভালো ভালো পশমী কাপড়। বন্ধুকে
লিখলুম,—

"ভাই আতোয়ার,

তোমার ডানাকাটা পরী মামাতো বোনের রূপগুণ সম্বন্ধে কোনও দিনই আমি
সন্দিহান নই। তবে আপাততঃ অমন পরী আমি হজম কো'রতে পা'রবো না

আমার শরীর এখনো ভাল না। বিয়ে করার মতো মন তৈরী হয়নি। অমন হেন জিনিস এ অপাত্রে দান না কোরে কোনও সুপাত্র ছাখো। তবে নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত ক'রো না। নয়ন ভ'রে জোড় মানিককে দেখে তৃপ্তি সহকারে দোওয়া ক'রে আ'সবো, আর পেট পুরে বিয়ের খাওয়া খেয়ে আ'সবো। তোমার কানের গোড়া কাটা প'ড়লে আমারও প্রাণের গোড়া আস্ত থা'কবে না।"

জবাবটা কাট্-খোট্টা কাট্-খোট্টা মাফিক্ হ'লো। তা হোক্। কাউকে আশায় আশায় না রেখে একবারে নিরাশ করা ভালো। দাতার চেয়ে বখিল্ ভালো তুড়ন্ত জবাব দেয়।

আপাততঃ আমার বি-এ পাশের খবরটা দিতে হবে আমার স্নেহপরায়ণ অগ্রজ প্রতিম হিতাকাঙ্খী পরেশদাকে। সলাজ ও সবিনয়ে পেশ ক'রলুম খবরটি তাঁর কাছে। আনন্দে গদগদ পরেশদা হুঁকো রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমায় ঢুক্‌লেন হৃদয় অধিকারীদের ঘরে। "ওহে শুনেচো, আমাদের জাহাঙ্গীর বি-এ পাশ ক'রেচে। সেও আবার তুয়ে মুয়ে পাশ নয়। একেবারে উচ্চশ্রেণীর অনার্স সুদ্ধ। একটু আনন্দ ক'রতে হবে তো। বসাও আজ সন্ধ্যেয় গানের মজলিশ। জলছা শেষে চা পান। খরচ আমারই।"

সবই কানে আ'সচে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর আমার ভ'রে উঠ্‌লো। কিন্তু এ খবর সকলের আগে কাকে আমার দেয়া উচিত ছিলো? উচিত মানে প্রেম ধর্ম্মের কর্ত্তব্য। যাকে দেবার জন্যে প্রাণ আমার চঞ্চল হোয়েচে সে তো সিংমারীর সেই কাঠের বাড়ীতে এতক্ষণ নিশ্চয়ই আমাকেই ধ্যান কোরচে। তার কাছে আমার বি-এ পাশ হ'লেও চলে, না হোলেও চলে। সে তো আমার বি-এ পাশকে ভালো বাসেনি। বেসেচে আমাকে। তবু খুব খুশী হবে নিশ্চয়ই।

ভাবাবেশ পেয়ে ব'সেচে আমাকে। কত ঢেউ মনে জা'গচে। এবার সামনের কর্ত্তব্য? বাবা মা মনমায়া, সকলকে একসঙ্গে একই পরিবেশে জড়িয়ে মনের পর্দ্দায় সম্ভব অসম্ভব কত রকমের ছবির পর ছবি। এ আমি ছা'ড়তে পার-চিনে। মন আমার যে পরিমাণে চঞ্চল হোয়েচে ছুটে বেড়িয়ে যেতে, শরীরও সেই পরিমাণ ক্লান্ত হোয়েচে জড়তায়। কাজেই সে বিকেলও আমার ঘরের বার হওয়া হ'লো না।

সন্ধ্যের পরে ব'সলো গানের আসর। এবং শেষ হ'লো তাঁদের আ
উল্লাসের মধ্য দিয়ে অনেক রাত্রিতে।

ঘুম কিন্তু আমার হ'লো না। অভিমানীর অভিমান-সুন্দর মুং
কল্পনা কোরে ঘুম নিঝুম হোয়ে চুপিসারে পালিয়ে রইলো।

——::——

"নয়"

পরদিন সকালে।

কুয়াসা। এত কুয়াসা দার্জ্জিলিং এসে অবধি আমি দেখিনি। পাহা
পর্ব্বত, গাছপালা, বাড়ী ঘর দোর, ঘন কুহেলীর আসমানী রংয়ের বোর্খায় ঢা
প'ড়েচে। আমার মনের ভেতরেও আজ তেমনি কুহেলী। আমার সোহে
প্রেম পরশে, সুধাজড়িত কণ্ঠের কুজনে, নৃত্য গতি ভঙ্গিমায় সে কুহেলী কা'ট
না কি?

কাউকে কোথাও দেখা যায়নি। কাক পক্ষীও আজ আপন আপন বা
সুড়িসুড়ি হোয়ে চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কুয়াসার আবরণ ভেদ কো'রতে চাই
জা'নতে চাইচে তার রহস্য। আর অপেক্ষা ক'রচে সূর্য্যের সোনালী ম
ভরা সহস্র কিরণ জালের আশীর্ব্বাদ প্রতীক্ষায়। এ হেন সময়ে আমি একাই
মনুষ্য দেহধারী-জীব ঘরের বাইরে। পরেশদা'র দৃষ্টি এড়িয়ে বেড়িয়ে প'ড়ে
ঠক্ ঠক্ কোরে উত্তর পানে চ'লেচি। আর মানে না মন। সিধে গিয়ে ঠক্
কোরে ঘা দিলুম কাঠের দরজায় সেই সিংমারীর কাঠের বাড়ীটিতে। মাত্র দু'এ
ঘা, আর অমনি দরজা খুলে গ্যালো, মানে, খোলা হ'লো।

"কি ব্যাপার? এই ঠাণ্ডার মধ্যে? অসুখ ক'রবে না?" এক
প্রশ্ন মনমায়ার মায়ামাখানো মুখে।

"চাচ্ছি তো অসুখ। কিন্তু বহুদিন সে ব্যাটার দেখা নেই।" ব'লে ব'সলুম চেয়ারে।

"কি অলক্ষুণে কথা সকালবেলা। সাধ কোরে মানুষে অসুখ চায় ?"

"চাচ্ছি তো সাধ কোরে।"

"কেন ? দিন দিন তোমার হ'লো কি বলো তো ? ভালো লা'গছে না এসব কথা।"

"আমিও তাই ভাবি মায়া, দিন দিন আমার হ'লো কি ?" তার উদ্বিগ্ন মুখের পানে চেয়ে আরও ব'ললুম, "অসুখে তোমার হাতের সেবা পাবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হোয়ে উঠেচে।"

"কি সৃষ্টি ছাড়া সাধ। এখানে পার হোলেই তো পারো। সেবাযত্ন ক'রতে পাহাড়ী জংলী জানে কিনা দেখতে।"

"সে দেখার জন্যেই তো সৃষ্টি ছাড়া সাধ।"

"তা অসুখ না হোলেই কি আর সেবাযত্ন হয় না ? বহুদিন আগেই তো ব'লেছি।"

"একটা উপলক্ষ্য কোরে তো পার হোতে হবে। সে উপলক্ষ্য কই ?"

"থা'ক। অমন অশুভ উপলক্ষ্য কামনা কোরে কাজ নাই। কাল এলে না যে বড় ?"

"সে অনেক কথা। আসিনি মানে এ নয় যে ইচ্ছের অভাব ছিল। অভাব যা ছিলো তা দেহের। ক্লান্তিতে শরীর হ'য়েছিলো অচল। আর তারই টিক্ তুলচি আজ সাত-সকালে, ঘন কুয়াসার মধ্যে। আমাকে নিয়ে কা'ল খুব হৈহুল্লোড় ধুম্ ধাড়াক্কা হোয়ে গ্যালো স্যানিটারিয়ামে। আমার বি-এ পাশের খবর এসেচে মায়া।"

হাসিতে খুশীতে লাফিয়ে উঠলে মায়া, "সত্যি ?" ওটা তো প্রশ্ন নয়। সত্যি যে সেও তো বিশ্বেস করে মনে প্রাণে। কিন্তু প্রাণের উল্লাস ব্যক্ত করার আর ভাষা কই ? পরক্ষণে মিষ্টি অভিমানের সুরে ব'ললে, "কিন্তু যাও, বাসী খবর শুনতে চাই না। এটা আবার শুনাও গিয়ে তোমার স্যানিটারিয়ামে।"

কণ্ঠে সোহাগ ঢেলে ব'ললুম, "আরে পাগল, ঐ তো ব'ল্লুম, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হোয়ে এসেছিলো।"

"আমি হোলে কি ক'রতাম জানো? মরা শরীরটাকেও টেনে নিয়ে ফেলতাম তোমার কাছে, এ খুশীর খবর জানাতে। স্যানিটারিয়ামের সবাই শুনলো কা'ল, আর এহেন খবর আমার জন্যে আজ? ইচ্ছা থা'কলেই উপায় হয়।" ব'ললে সে।

"আমার অসুখ হওয়াও সইতে পারচো না। আবার অভিমান কোরেও লাল মুখ কালা ক'রচো। আমার ঘা'ট হোয়েচে লক্ষ্মী। আমার ক্ষিদে পেয়েচে খেতে দাও।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। মাকেও খবরটা দিই।"

"তাহ'লে ঐ সঙ্গে এ খবরটিও বুঝিয়ে ব'লো যে উচ্চ শ্রেণীর অনার্স পেয়েচি দর্শন শাস্ত্রে।"

"ও-ও, এ সুসংবাদটিও এতক্ষণ গালের মধ্যে চেপে রেখেছো? আচ্ছা মানুষ।" ব'লতে ব'লতে ভেতরে চ'লে গ্যালো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো চা বিস্কুট ফলমুল নিয়ে।

খেতে ব'সে অনুভব ক'রলুম রাজ্যের মমতা মনমায়ার মুখে ও মনে।

খাওয়া হোয়ে গ্যালো। মনমায়া 'আ'সচি' ব'লে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে কয়েক মুহুর্ত্ত পরে ওভার কোট গায়ে দিয়ে ফিরে এলো এবং ব'ললে, 'চলো, উঠো।' জিজ্ঞেস ক'রলুম, "কোথায়?"

চাপা দুষ্ট হাসি ঠোঁটে নিয়ে ব'ললে, "জাহান্নামে।" ব'ললুম, "আমি এসেচি ভূস্বর্গ কৈলাসে। যে জায়গার নাম কো'রলে শাস্ত্রে বিবরণ পড়েচি ও জায়গা মোটেই কারু পক্ষে সুস্থান নয়। না, ঠাট্টা নয়। সত্যি কোথা যেতে চাও?"

তেমনি দুষ্টমি ক'রেই ব'ললে, "তোমার সঙ্গে স্যানিটারিয়ামে। তোমার থা'কবার খাবার ব্যবস্থাটা একবার নিজে চোখে দেখে আসি।"

ভীত হোয়ে ব'ললুম, "সেখানে যাবে তুমি? সব লোক 'হাঁ' কোরে তাকিয়ে থা'কবে আর হাসবে।"

বেশ কিছুটা ক্ষুন্ন হোয়ে সে ব'ললে, "এখনই এত ভয়? পরে?"

ব'ললুম, "পরে আর ভয় নেই। তখন তাকিয়ে থা'কবার লোক থাকলেও হা'সবার লোক থাকবে না।"

ব'ললে সে, "আচ্ছা, হ'য়েছে, হ'য়েছে, উঠো।"

এই হুকুমের পরে আর জিজ্ঞেসার কিছু রইলো না। তাকে অনুসরণ কোরে রাস্তায় নেবে শুধু আবৃত্তি ক'রলুম রবীন্দ্রনাথকে,

"কোথা, কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুর হাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।"

শুনে আমোদ পেলে বেশ বুঝলুম। কিন্তু মুখে ব'ললে, "মনে যা আছে তা এখুনি জা'নতে পারবে। এসো।"

ব'ললুম, "তা যেন হ'লো। কিন্তু এ আবহাওয়ায় তোমারও তো অসুখ কো রতে পারে?"

হেসে ব'ললে, "আমাদের গা সওয়া হোয়ে গ্যাচে। তোমার তো এখনো তা হয়নি। কিন্তু সত্যি, দার্জ্জিলিং-এর এ কুয়াসা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় উপকারী। এর ভেতরে দিন কয়েক বেড়ালে তোমার লাল শরীর হবে আরও লাল। গাল দুটো হবে রুজ মাখানো। তখন পাহাড়ী কি বাঙ্গালী চেনাই হবে শক্ত।"

ব'ললুম, "বেশ তো, ভালোই হবে। দু'জনে এক সঙ্গে বেরুলে লোকে আর হাঁ কোরে তাকিয়ে থা'কবে না।"

সে হয়তো কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে শুধু ব'ললে, "হুঁ।"

আমরা 'লেবংস্পার'-এর দিকে পথ ধ'রেচি। কিছুক্ষণ চ'লবার পরে একটি সরু রাস্তা দিয়ে নীচে নেবে গেলুম। আরও কিছু দূরে গিয়ে একটি ছিম্‌ছাম্ বাড়ীর দরজায় মায়া টোকা দিলে। ভেতর হোতে একটি নারী কণ্ঠের

সাড়া পাওয়া গ্যালো। পাহাড়ী ভাষায় জিজ্ঞেস্ ক'রলে, 'কে ?' মনমায়া জবাব দিলে, 'মায়া।'

'খুট্' কোরে দরজা খুলে দিলেন যে সুন্দরী মহিলাটি তাঁর কোলে প্রায় বছর দুয়েকের একটি পুত্র সন্তান। মনে হ'লো এই মুহূর্ত্তে দুধে আলতায় মেশানো কোনো বা'লতী থেকে তাকে চুবড়িয়ে আনা হোয়েচে। মাথায় টুপি, গায়ে জামা, শুধু মুখটি খোলা।

মায়া ছোঁ মেরে খোকাকে কেড়ে নিয়ে বুকে চেপে তার চোখে মুখে চুমোর উপর চুমো দিয়ে তার রাক্ষুসী ক্ষিদে মেটাতে লাগলে। মহিলাটি স্মিত হাস্যে এ দৃশ্য উপভোগ ক'রতে লা'গলেন। এবং আমি সবিস্ময়ে মায়ার দিকে চেয়ে রইলুম।

মায়ার নিকট হোতে আমার দু'একটি কথার পরিচয় পেয়ে মহিলাটি হাত তুলে আমায় ছালাম ক'রলেন, এবং ভেতরের একটী কুঠরীতে নিয়ে গিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন এবং পরিষ্কার বাংলায় ভদ্রোচিত মৃদু হাস্যে ও বিনয়ে জানালেন যে আমি তাঁদের গরীবের কুঠিরে পায়ের ধূলো দেয়াতে তাঁরা ধন্য।

মায়া ব'ললে, "এসো দিদি, অত ভণিতায় কাজ নাই। বাদশাহ মানুষদের বেশী তোয়াজ ক'রলে ওঁদের অহংকার আরও মাথায় চড়ে।" ব'লে আমার দিকে কটাক্ষ ক'রলে। তারপর ব'ললে, "তোমার গল্পের লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ব'সো। আমরা চ'ললুম অন্দরে।" ব'লে হাসি খুশীর কুঙ্কুম ছড়াতে ছড়াতে, কোলে চাঁদ নিয়ে, এক হাতে দিদির হাত ধ'রে সত্যি সত্যি চ'ললে অন্দরে।

কে এই দিদি? এতদিন তো মায়া ঘুনাক্ষরেও বলেনি এদের কথা। যেই হোক্, প্রায় মায়ার মতোই দেখতে। মনে হ'লো পাহাড়ী। জানতুম মায়ার বোন নেই। নইলে তার মায়ের পেটের বোন ব'লে ভাবা বিচিত্র হ'তো না।

চিন্তাযুক্ত মনে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পর একজন পঁচিশ ছাব্বিশের যুবক, উন্নতকায়, গৌরবর্ণ, দাড়ি গুম্ফহীন, এসে আমাকে আচ্ছালামো আলায় কুম ব'ললেন, এবং হাত ধ'রে মোছাফাহ ক'রলেন। নিকটে একটী চেয়ার টেনে নিয়ে কথা শুরু ক'রলেন, "হুজরতের পরিচয় মায়ার নিকট তাড়াতাড়িতে সামান্য পাবার নছিব হ'লো। ছরফরাজ হলাম যে গরীবদের ঘরে তশরীফ এনেছেন।"

শিষ্টাচার দেখে তাঁরা যে যথেষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত এতে কোনও সন্দেহ রইলো না। ব'ললুম, "দেখুন, আপনাদের কথা কিছুই জা'নতুম না। মায়াও বলেনি কোনও দিন। এখানে নূতন এয়েচি আমি। পরিচয়ের লোকের অভাব। জা'নলে অনেক আগেই এসে পরিচয় জমাতুম। মাফ্ ক'রবেন, আপনারা কি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দে?"

ব'ললেন তিনি, "তা এক রকমের হোয়ে প'ড়েচি। আব্বাজান পেশোয়ারী। ক'লকাতায় ফলমূলের দোকান ক'রতেন। আমি ক'লকাতারই বাঙ্গালী মায়ের সন্তান। আম্মা মারা যান। আব্বাজান আমায়সহ আসেন এই দার্জ্জিলিংএ ব্যবসার খাতিরে। এবং কালক্রমে পুনরায় শাদী করেন এইখানে এক পাহাড়ী মেয়েকে। আমার দু'টি সতেলা ভগ্নি রেখে সে মাও মারা যান। কিছুদিন পরে আব্বাও। বোন দু'টিকে বিয়ে দিয়েচি। আর আমিও বিয়ে ক'রেচি এই পাহাড়েরই মেয়ে, কিছু আগেই যাঁকে দেখ্লেন। আপনাদের নেক্ দোওয়ার বরকতে একটি পুত্র সন্তানের পিতা আমি।"

সন্তানটির রূপ ও স্বাস্থ্যের সুখ্যাতি ক'রলুম। এতে সন্তান-গর্ব্বে-গর্ব্বিত যুবক-পিতার মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্লো

ইতিমধ্যে চা এবং তার আনুষঙ্গিক অনুপানাদি এসে প'ড়েচে।

চা পানের ছিপ্ ছিপ্ শব্দের সঙ্গে তাঁর কথা চ'লতে লাগলো, "দেখুন, এছলাম প্রচারশীল ধর্ম্ম। পূর্ণাঙ্গ তব্লীগ্ এদেশে কোনও দিনই হয়নি আমাদের। গৌরবময় যুগে যাঁরা এছলাম প্রচার কোরেছেন তাঁরাও কিন্তু হিমালয় প্রদেশগুলো ও দ্রাবিড় অঞ্চলকে অবহেলা কোরেছেন। অথচ এই জায়গাগুলোই ছিলো প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আঞ্জুমানের ক্ষীণ প্রচেষ্টা কোরেছেন বোধ হয়? কিন্তু too late. এখন টাকাওয়ালা বহু খৃষ্টান ও আর্য্য মিশনের প্রতিযোগিতায় এদের অস্তিত্ব রাখাই দায়। এক উপায় আছে পাহাড়ী মেয়ে বিয়ে কোরে বংশবৃদ্ধি করা। সে পথেও প্রতিবন্ধক আমাদের শিক্ষিত সমাজের সামাজিক মর্য্যাদার মনোবৃত্তি। তাঁরা সমাজে ভালো মেয়ে পান। তাই পাহাড়ী মেয়ে কেউ বিয়ে কোরতে চান না। অথচ পাহাড়ীদের মধ্যে রূপে গুণে শিক্ষায় বহু ভালো ভালো মেয়ে আছে।"

ভাবলুম একি তাঁর নিজের বিয়ের কৈফিয়ৎ এবং আমার প্রতি ইঙ্গিত?

ব'ললুম, "দেখুন, আপনিও স্বীকার ক'রবেন যে বিয়ে জিনিসটি জো কোরে হয় না। আর তা ছাড়া অনেক শিক্ষিত যুবক বিয়ে ক'রতে চাইলেও তাঁদে অভিভাবক রাজী হন না আভিজাত্যের অজুহাতে।"

সায় দিলেন তিনি, "সত্যি কথা। কৌলিন্য প্রথা যা হিঁদু সমাে প্রচলিত তা এছলামের জিনিস নয়। অথচ, দেখুন না, দু'টো পয়সা এবং কিছু শিক্ষা পেলে সকলেই সৈয়দ সেজে বসেন। আত্‌রাফের নামে নাক সিটকান তখনকার দিনের আরবগণ যদি চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশ গুলোতে নিজেদের আশরাফিয়াত্‌ নিয়ে কুণো হোয়ে থা'কতেন তো অবস্থাটা বি দাঁড়াতো আজ? আমার নিজের কথা ব'লতে পারি ছাহেব, পাহাড়ী মেয়ে বি কোরে অসুখী হইনি কোনও দিন। কিম্বা আব্বাকেও খুঁৎ খুঁৎ কো'রতে দেখিনি কখনোও। এই উদারতা আর পরিবেশ-সহনশীলতাই এছলামের।"

ভদ্রলোক কোথা হোতে কোথায় এসে প'ড়লেন। তাঁর উচ্চ আলোচনা আত্ম-কেন্দ্রিক। এবং আমার মনে একটি লোভনীয় অবস্থার সৃষ্টি করাও যে তাঁর উদ্দেশ্য তাও বুঝতে বাকী রইলো না। কিন্তু এও তো না বুঝে পা'রলুম না যে আলোচনার বিষয়বস্তু ইতিহাসের কষ্টি পাথরে ষোলো আনা সত্যি ব'লে প্রমাণিত না হোতে পারে, স্যায় শাস্ত্রের মাপকাঠিতে তাঁর যুক্তি তর্ক একদেশদর্শী হোতে পারে, কিন্তু এর ভেতরে সত্য যে অনেকখানি নিহিত আছে তাও তো কোনও বিবেকী মানুষই অস্বীকার কো'রতে পারেন না। সত্যি, এছলাম-গর্ব্বী মুছলমানের মন বড় সংকীর্ণ হোয়ে প'ড়েচে। আদিম ঔজ্জ্বল্য ও প্রাণশক্তি যেন কুসংস্কারের কুপ-মণ্ডুকতায় হারিয়ে ফেলেছে সে। মনে পা'ড়লো হিঁদুর কৌলিন্য সংজ্ঞা,

"আচারো, বিনয়ো, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণম্।"

আচার, বিনয়, বিদ্যা, সুনাম, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠ ও আলো চনা, তপস্য ও দান এই নয়টি গুণ কুলের লক্ষণ। আর আজ? কুলীন হিঁদু ঘরে অমিতাচারী, অশুদ্ধাচারী, কুখ্যাত সন্তানও কুলীন। মুছলমানও দেখাদেখি শা নড়ায়। পণপ্রথা, বরপণ, কন্যাপণের অভিশাপে সমাজ জীবন জর্জ্জরিত। প্রা এছলামীয় যুগের আরবদের মুমতো ছলমানদের জীবনে কন্যাভীতি প্রকট হো

উঠেচে। মোটা রকম টাকার অঙ্কে আজ বর খরিদ কো'রতে হয়। এ পাপে সমাজ জীবন বিষিয়ে গ্যালো। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা তুরুপের উপর তুরুপ দিয়ে বর খরিদ করেন, যেমন খরিদ করেন তাঁরা হালের গরু, দুধের গাই। অথচ এছলাম বলে কুলীন সে, আশ্‌রাফ সে, পর্‌হেজ গার্‌ যে। থা'ক্‌ সে দুঃখের কথা। নিজের দুঃখে বাঁচিনে, কী হবে সমাজের কথা চিন্তা কোরে?

মনমায়া ইতিমধ্যে সখীসহ এসে প'ড়েচে। কোলে শিশু, মুখে দুষ্টহাসি, ব'ললে, "দুই বন্ধুতে তো একেবারে মশগুল। বলি, আজ উঠা হবে, না এখানেই থাকা হবে?"

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "দুই সখীতে কি তোমরা এতক্ষণ কম মশগুল ছিলে মায়া?" আমাকে দেখায়ে ব'ললেন, "উনি তো গল্প ক'রলেন না। তুমি থা'কলে হয়তো আসর জ'মতো ভালো। আজ এই ঠাণ্ডার দিনে উঠারই বা দরকার কি মায়া? সবাই মিলে থাকো না?"

মায়া ব'ললে, "দার্জ্জিলিংএ আবার কবে গরম ভাইজী, যে আজই শুধু ঠাণ্ডার দিন আবিষ্কার কোরলেন? গরম শুধু তো আপনার গিন্নীর হাতের খাবার, আর মুখের চোখা চোখা ঝালবড়া।"

তাড়াতাড়ি ব'ললেন ভদ্রলোক, "ঐ শেষেরটি মাঝে মাঝে খেয়ে যেও ভাই। তাহ'লে আমার ভাগের বিরাট অংশটি তবু আংশিক কমে। নইলে একা একা খেয়ে বদহজম হ'তে চ'ল্লো, মায়া।"

শান্ত-শ্রী মহিলা মুচ্‌কি হেসে মায়াকে ব'ললেন, "কা'ল যদি আবার না আসিস্‌ বাঁদরী পোড়ারমুখী, তাহ'লে এবার কথার বদলে হাত চালাবো।"

ভদ্রলোককে সাক্ষী কোরে মায়া ব'ললে, "শুনলেন তো ভাইজী? বাঁদরের মতো পোড়ামুখ ব'লে তো এতটুকু কেউ ভালোবাসে না, তার উপর উনি আবার আমায় কিল মেরে ধ্যাবড়া মুখ ধ্যাব্‌ড়া ক'রবেন।"

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "ও ভয়টা তোমার নয় মায়া, আমার। তোমায় এতটুকু কেউ ভালোবাসেন না এটা তো আমাদের জানা ছিলো না। এই 'কেউ' বিশেষ কোনও 'কেউ' নন্‌ তো?"

তাঁর নজর আমার উপর প'ড়লো। মায়ারও, তার সখীরও। এতগুলো দৃষ্টির যুগপৎ ঝলকে মুখখানা আমার নিশ্চয়ই লাজ-রাঙা হোয়ে উঠেছিলো।

কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি মায়া পরক্ষণেই জবাব দিলে, "বিশেষ আপনি, সবিশেষ দিদি।"

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই হেসে উঠলেন। কৌতুকের মধ্যেও ছলনা ধরা প'ড়েচে হাসির কারণ মনে হ'লো তাই। ভদ্দর লোক ব'ললেন হেসে, "ওঃ, তাই বটে। কিন্তু love and cough cannot be hid, মায়া। দোওয়া করি তুমি ভালবাসার অক্ষয় ভাণ্ডারের অধিকারিণী হও।"

প্রাণের উচ্ছ্বসিত উল্লাস মায়া চেষ্টা কোরে গোপন ক'রতে চাইলে এবং ব'ললে, "বেশ্, বেশ্, হ'য়েছে। চলুম। পোড়া কপালে অতবড় দোওয়া সইলে হয়।"

দু এক পা সে চ'লতে লাগলে। আমিও উঠলুম। ভদ্দর লোক হাত ধ'রে অনুরোধ জানালেন, "মেহেরবাণী কোরে ঘন ঘন এলে সুখী হব।" তাঁর গৃহিণীরও সেই অনুরোধ।

ব'ললুম, "অবশ্যই। বিদেশে এতো আমার সৌভাগ্য।"

কী সুখী পরিবার! সব কথার ভেতরে মনে হ'লো এঁদের জীবনে নেবে এসেচে ঐ হিমালয়ের স্থৈর্য্য, তুষারের মত ঘন জমাট-বাঁধা প্রেম। বাইরে নেই উত্তাপ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে উষ্ণ-প্রেমে প্রাণ হোয়ে আছে বিভোর। আর এই প্রেম-তপস্যার সার্থক ফল ঐ কোলের শিশুটি। বিবর্ত্তন সার্থক হোয়েচে এঁদের কোলে এসে। ভুলবো না। ভুলবো না। এ চিত্র ভুলবার নয়।

রাস্তায় মায়া ব'ললে, "কী ভাবছো?"

ব'ললুম, "উঁ? হুঁ। এমন সুন্দর মানুষ এঁরা। কই, এতোদিন তো এঁদের কথা ব'লোনি?"

"ঢাক পিটে বেড়াবো নাকি কার কার সঙ্গে আমার পরিচয়, খাতির মহব্বৎ? এতক্ষণ ধ'রে ক'রলে কি? পরিচয় নিলে না কেন?"

"বেহায়ার মত আমি কি জিজ্ঞেস ক'রবো মশায়ের নামটা কি, কি করেন, কত মাইনে পান, আর কি কোরে অমন রূপে গুণে লক্ষ্মী স্ত্রী পেলেন, নাম কি, মায়ার সঙ্গে কোন্ সুবাদে জানাজানি হ'লো? সেটা তোমার মুখে শোনা কি ভালো নয়?"

"আমার মত অরূপা, অগুণী, অলক্ষ্মীর মুখে শুনবে যদি তো শোন।"

বাধা দিয়ে ব'ললুম, "কে তোমাকে ব'লেচে অমন কথা? তোমার মত সুন্দর কেউ না। আমার মায়ার কাছে সবারই হা'র মা'ন্‌তে হবে।"

সে ব'লে চ'ল্‌লে, "উনি আশরাফ ভাইজী। কোনও পাশ নন, তবে দু'এক বছর কলেজে প'ড়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে চা'করী করেন। মাইনে ঠিক জানিনে, শুনেছি মোটামুটি মন্দ না। একটি কাপড়ের দোকানও আছে। অন্য লোক দিয়ে চালান। দিদির পূর্ব্ব জন্মের পাহাড়ী-নাম ধীরা। নব-জন্মের ইস্‌লামী নাম মালেকা। মহারাণীতে আমি যখন সিক্‌ছে, দিদি তখন নাইনে। একই সঙ্গে যেতাম আ'সতাম। খাতির ছিলো খুব। ম্যাট্রিক পাশ।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? দিদির বাপ ছিলেন না। কাপড় কিনতে দিদি যেতেন ভাইজীর দোকানে। অলক্ষ্যে উভয়কে কোন্ অতনু তীর মেরে ঘায়েল ক'রলো। ভাইজীর ধমনীতে পেশোয়ারী রক্ত উদ্দাম হোয়ে উঠ্‌লো। দু'একটি বাধা বিপত্তিও যে দেখা দিলো না, তা নয়। সাহায্য ক'রলো কসাই বস্তীর মুছলমানরা, আর তাদের ইস্‌লাম-দীক্ষিতা স্ত্রীরা। উভয়ে পালিয়ে গেলেন ক'লকাতা। ফিরে এলেন স্বামী স্ত্রীরূপে। হৈ চৈ থেমে গ্যালো। ব্যস্।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মুখে আর কথা নেই। নীরবে পথ চ'লচি। মায়া কি ভা'বচে, জানিনে। আমি ভা'বচি আমার সুরাহার কথা। আর ভেসে উঠ্‌চে মনোশ্চখে একটি সুখী সুন্দর সসন্তান পরিবারের ছবি, কলকাকলীতে ভরপুর। পথ খাটো হোয়ে এলো।

——::——

দশ

মনই দেহের রাজা। রাজা দুর্ব্বল হোলে সিংহাসন আপনা আপনি দুর্ব্বল হোয়ে পড়ে।

রবি ঠাকুরের বিসর্প যখন হয় তখন নীচের ক্লাশে পড়ি। দুনিয়ার দিকে দিকে উৎকণ্ঠা। টেলিগ্রাম যা এলো তা দিয়ে নাকি পর্ব্বত তৈরী করা যায়। ব্যাধি ভালো হ'লে রবি কবি মন্তব্য ক'রলেন,—দেশশুদ্ধ সবাই নাকি তাঁকে ভালো-বাসে। কিন্তু এ ভালোবাসা মুখের কি মনের তার পরীক্ষার সুযোগ কোনোদিন মিল্‌লো না। সুস্থ-দেহীকে ভালোবাসা, তোয়াজ করা, বিশেষ কোরে বড় মানুষের, সাধারণ মানুষের অভ্যেস। পরীক্ষা হোয়ে যায় সেই বড় মানুষ মরণাপন্ন ব্যাধির কবলে গেরেফ্‌তার হোলে। জীবনে তাঁর কোনও বড় অসুখ হয়নি। মনে মনে চাইতে চাইতেই হটাৎ একদিন এই ইরিসিপেলাস্। তখন বোঝাগ্যালো দেশ-দুনিয়ার লোক সত্যিই তাঁকে ভালোবাসে।

আমারও মনে এই রকমেরই একটি ভাব মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠ্‌লো।

বই কেতাবে প'ড়েচি প্রেমিক হওয়া সহজ, স্বামী হওয়া মুখের কথা নয়। দুটো মিষ্টি প্রেমালাপ; রং ঢং, আহামরি, উহুমরি, বড় জোর দু'একটি শাড়ী ব্লাউজ, আল্‌তা পাউডারের মূলধন থা'কলেই মওশুমি প্রেমিকের দিব্বি ব্যবসা চলে। কিন্তু স্বামী হোতে গেলে বিয়ের দিন থেকে হয় মরণ, নয় তালাকের দিন, পর্য্যন্ত প্রতি মূহুর্ত্তে স্বামীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় তাকে। বিবাহিত জীবন-সমুদ্রে কত ডুবো-পাহাড়, কত বিপজ্জনক চোরা-প্রবাহ, কত গুপ্ত বালিচর স্বামী স্ত্রীর মিলিত জীবন-তরীকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে চুর্‌মার্ কোরে দিতে চায়। আর এই জন্যেই বিয়ে বহু-জনের ভাগ্যেই হোয়ে যায় অভিশাপ, স্বল্পের ভাগ্যে আশীর্ব্বাদ।

আমার কপালে অভিশাপ হবে কি আশীর্ব্বাদ, একবার পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে দোষ কি? সুস্থ সুন্দর দেহীর সঙ্গে প্রেমে পড়া আর ব্যাধি-বিকৃত দেহকে মমতার সঞ্জীবিত করার মধ্যেই আছে এই অগ্নি-পরীক্ষা। আমার প্রিয়তমা আমার আমিকে ভালোবাসে কিম্বা আমার দেহের রূপ লাবণ্যকে, একবার যাচাই হওয়া দরকার।

মনের জন্যে কি শারীরিক কারণে জানিনে, সুযোগ একদিন মিলে গ্যালো। যে যা আন্তরিক কামনা করে বাঞ্ছা-কল্পতরু নাকি তাই মিলিয়ে দেন। অন্তত: মন্দের দিকটা তাড়াতাড়ি ফলে। আমারও হ'লো তাই।

একদিন শীত কোরে জ্বর এলো। বিপদ! এখানে দেখবে কে? সেবা শুশ্রূষা ক'রবে কে? অসুখে প'ড়লে স্নেহ-পরায়ণা হাতের সেবা না পেলে কোনও দিনই আমার অসুখ ভালো হয় না। ব্যাধি-পীড়িত দুর্ব্বল মন সব সময় চায় এমন কাউকে চোখের সামনে পেতে, যাকে দেখ্‌লে সাহস ও শান্তি বুকে ফিরে আসে।

তাই সময় থা'কতে সাবধান হলুম। পরেশদাকে বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার নাম কোরে ফাঁকি দিয়ে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-ভার রিক্সায় চাপিয়ে হাঁকাতে ব'ললুম সিংমারীর সেই কাঠের বাড়ীটার দিকে।

পাহাড়ী মেয়ে যে এতো সেবাযত্ন জানে বিশ্বেস করতুম না হাতে হাতে প্রমাণ না পেলে।

জ্বরের কয়েকদিন একদণ্ডও স'রে থা'কতে চায়নি সে। সময় সময় জোর কোরে উঠিয়ে দিতুম তাকে নাওয়া খাওয়ার জন্যে। তবু ব'লতো আমার জিদ্‌কে প্রতিরোধ ক'রে, "আমি বেশ আছি, ভালো আছি। তুমি ভালো হও।"

ব্যাধি ভালো হলো; আধি পেয়ে ব'সলো। একি পাহাড়ী নারীর সেবাযত্নের স্বাদ পেয়ে? হবে হয়তো। কিন্তু তাও গড়িমসী কোরে যেতে যেতে দুর্ব্বল লোভী মনে কিছুটা র'য়ে গ্যালো। একদিন ব'ললুম মায়াকে, "মায়া, এ সময় স্ফুর্ত্তির জন্যে নূতন জায়গায় কিছুটা বেড়ানো দরকার। টাইগার হিলের সূর্য্যোদয়-দৃশ্য নাকি অতীব চমৎকার। ক'মাস হলো এয়েচি কিন্তু একদিনও যাওয়া হয়নি।"

"বেশ তো। বন্দোবস্ত করি?"

"তুমি?"

"নইলে কি তোমায় একাই ছেড়ে দেবো নাকি?"

"তাই'লে কা'লই। কেননা 'নলিনী দলগত জলমতি তরলম্‌, তদ্বদ্‌ জীবন মতিশয় চপলম।' এই পাখীর এক ফোঁটা জীবনের ভরসা নেই।"

রেগে গিয়ে ব'ললে, "দ্যাখো, খবরদার ব'লছি, ওসব অলক্ষুণে কথা ব'লো না আমার সামনে।"

ধমক্ খেয়ে চুপ মেরে গেলুম। কিন্তু বন্দোবস্তের ত্রুটি হ'লো না সব দিক বিবেচনা কোরে রিক্সা নেওয়াই ঠিক হ'লো।

এক সময় মায়া ব'ললে, "গ্যাখো, সেখানে যেতে হ'লে মাঝ রা'তে রওয়ানা হো'তে হবে। ঠাণ্ডা লেগে তোমার আবার অসুখ ক'রবে না তো?"

তার ভয় ভাবনাকে তিন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ব'ললুম, "কিচ্ছু না তুমি থা'কতে আবার অসুখের বাবার সাধ্যি আছে কাছে ঘেঁসে? সঙ্গে কম্ব থা'কবে ডাল, আর সম্বল থা'কবে তুমি। এর পর মরি যদি সেও ভালো তখন কিন্তু আমার মাথাটা কোলে নিও।"

বিরাশী ওজনের ধমক দিলে, "ফের্ ঐ কথা? যা শুনতে পারিনে দুঃ দেবার জন্যে তাই বারে বারে শুনাবে আমায়?"

একটু মুচ্ কি হেসে ব'ললুম, "ঘা'ট হ'য়েচে। ম'রে গেলেও আর ব'লবে না। তবে স্বভাব দোষে যদি দু এক মর . . . .। লোকে বলে, 'স্বভাব যায় ন ম'লে।" একটু থেমে ব'ললুম, "আমার সাহস আছে মায়া, তুমি থা'কতে য তো যম, তার গুরু ঠাকুরও কম্‌ছে কম্ হাজার বার সালাম ঠুকবে তোমার পায়ে তোমার সেবা দেখলে পাবার লোভ, তারও হিংসে হবে। সহস্রবার কাম ক'রবে অসুখ।"

মনে তৃপ্তির হাসি, মুখে ধমক্, "থা'ক্, হ'য়েছে। জগতে আমিই যে এক মেয়ে মানুষ।"

"আমার কাছে তো তাই।"

কত তৃপ্তি আমার মনে। নব উত্তেজনায় ঘুম ঘেঁস্‌চে না চোখে।

মায়া মায়ের কাছে। আমি কুঠরীতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে। শিয়রে টেবিলের উপর আলো মিট্‌মিট্ কোরে জ্বলচে। দুপুর রাতে আ'সবে রিক্সাওয়ালারা। কখন দুপুর রাত হবে? দুই ফ্লাস্ক ভর্ত্তি চা; ঢালচি, খাচ্চি আর ঘড়ি দেখচি। হটাৎ মেঘের গোঙানী। তারপর গুড়্‌গুড়্ দুড়্‌মুড়্। এরপর কড়্‌কড়্ কড়াৎ কড়্। তারপর লম্বা গোঁ-ও-ও গোঁ। মনে হ'লো একদল সার্কাসের সিংহকে একই সঙ্গে রিং মাষ্টার চা'বকিয়ে সিধে ক'রচে হুকুম না মানার জন্যে। বেয়াড়া সিংহের দল সাধ্য মত মুখ হা কোরে গর্জ্জাচ্চে চাবুক খেয়ে।

উত্তর দিকের জানালা খুলে দিলুম। চেয়ে দেখি, মরি, মরি! কাঞ্চন জঙ্ঘার বুকে অপরূপ কালো রূপের বন্যা খেলে যাচ্চে। দিনের বেলাকার উপমাহীন ধবলী কাঞ্চন, নিবিড়তম কালির পোঁচে পোঁচে ঘনতম মসীলিপ্ত প্রকৃতির বুকে সিলিউয়েত্ ছবির মত দাঁড়িয়ে র'য়েচে। যেন বিরাট কালো দত্যি সুযোগ পেয়ে সূর্য্য প্রিয়া শুভ্রা 'কাঞ্চনী'কে বুকে চেপে মনের সাধ মিটিয়ে নিস্‌পিস্ কোরে দিতে চাইচে। তার দুষ্ট হিংস্র ক্ষুধা দশন-দংশন রূপে দেখা দিচ্চে মাঝে মাঝে বিজলীর লক্‌লকে ঝলকে। তন্ময় হোয়ে দেখচি।

এমন সময় ঠক্‌ঠকঠ-ক্ ঠক্ লোহা বাঁধানো বুট জুতোর শব্দ শোনা গ্যালো বাইরের কাঠের মেঝেতে। "মাইজী,"—অদ্ভুত গলার স্বর। মায়াও বোধ করি জেগেই ছিলো। নইলে তুড়ন্ত কি কোরে জবাব দিতে পা'রলো, "যাই ব্যাটা।"

দরজা খুলে বাইরে এলো মায়া। আমার দরজা বাইরে থেকেই ভেজানো ছিলো। খুট্ কোরে ক্যাচার খুলে দিয়ে আমার কুঠরীতে ঢুকলে সে। "জেগে গ্যাছো" ব'লে জবাবের অপেক্ষা না কোরেই বহির্ব্বাটির দরজা দিলে খুলে। ঢুকলে এক বিরাট-কায় দত্যি। মাথার লম্বা বেণী কোমর পর্য্যন্ত ঝুলচে। গায়ে জোড়া তালি দেয়া আঁটসাট প'শমী জামা। পায়ে বুট জুতো। এমন দেখিনি আমি। মনে হ'লো এই মাত্র কাঞ্চন জঙ্ঘাকে বুকে নিতে দেখলুম যাকে সেই এলো নাকি আমার মায়াকে গ্রাস কোরতে। না, সে যে মাইজী ব'লে ডেকেচে। মোটা খোদ'ড়ে গলায় ব'ললে, "মাইজী, আকাশে দেওতার খুব ক্রোধ তুষার গিরতে পারে। এর মধ্যে যাবেন কি? আমরা প্রস্তুত।"

মায়া ব'ললে, "না ব্যাটা, যে জন্যে যাওয়া আজ গিয়ে লাভ হবে না। তার মধ্যে রোগা মানুষ। আজ যা। কা'ল দেখা যাবে।"

ছালাম কোরে চ'লে গ্যালো সে। ব্যস্। সে ব্যাটার যাবার কিছুক্ষণ পরে পরে সব ব্যাটাই গ্যালো চ'লে। না রইলো তর্জ্জন গর্জ্জন, না রইলো তার লক্‌লকে জিভ্, আর না রইলো দিগন্ত প্রসারিত কালো চুলের খাড়কী উল্লম্ফন। সব থেমে গ্যাচে। মিটে গ্যাচে মেঘ-দত্যির প্রণয় পিপাসা। আবার ফুটেচে তারার ফুল সারা আকাশ-আঙ্গিনা জুড়ে। ছিঁড়ে আ'নতে পা'রতুম অমনি একটি

ফুল আমার প্রিয়ার খোঁপার জন্যে। ভা'বতো সে, ব'লতো সে, 'আমার প্রিয়া আমার জন্যে কি না পারে।'

রাত শেষে শুভ্র নির্ম্মল সকাল এসে হেসে জানিয়ে গ্যালো তার কৌতুক চাহনি। কোনও চিহ্ন নেই তার মুখে গত রাতের মেঘ-দত্যির দুরন্তপনার। কোথায় গ্যালো সে দত্যি? এই পাহাড় পর্ব্বতের ঘন জঙ্গলে, কোপে ঝাড়ে লুকিয়ে র'য়েচে সে কি? লুকিয়ে র'য়েচে সে কি পাহাড় পর্ব্বতের উপত্যকায় সুযোগের প্রতীক্ষায়?

হ্যাঁ, হবে হয়তো। আবার এলো রাত্রি। একো দুপুর রাত। এবে দত্যিকায় তিব্বতী "শ্বেত্বা।" কিন্তু ঐয়ে, ঐযে শুরু হ'য়েচে আকাশ-জোড়া কালো দত্যির দস্যিপনা কাঞ্চনীর বুকে। মাঝে মাঝে বিজলীর কোড়া মেরে, হুঙ্কার ছেড়ে, শুভ্রা কাঞ্চনীকে ভীতা সন্ত্রস্তা কোরে তুলেচে সে। আর ভীত সন্ত্রস্ত কোরে তুলেচে সে আমাকে ও মায়াকে।

আজও ব'ললে মায়া, "শ্বেত্বা, হ'লো না। আজও আশা পূরণ হ'লো না। এরকম দুর্যোগ। বলা তো যায় না! ফের, কাল আসিস্।"

শ্বেত্বার আবার কি? বিনা খাটুনীতে রোজ যদি অমনি অমনিই 'রুবেয়া' মেলে তো শুধু কা'ল ক্যানো রোজই আ'সতে পারে সে তার রিক্সাটানা দল বল নিয়ে। নিকষ কালো প্রকৃতির কোলে মিটমিটে আলোতেও দেখা গ্যালো তার হাস্যোজ্জ্বল বত্রিশ পাটি দাঁত। লম্বা ছালাম ঠুকে চ'লে গ্যালো সে।

বহুক্ষণ আগেই মিলিয়ে গ্যাচে আমার মনের হাসি। তাহ'লে আমার কপালে মিলবে নাকি দেখা টাইগার হিলের সুযি মামার উদয় দৃশ্য? আবার কিছু পরে আজও পূর্ব্বরাতের পুনরাবৃত্তি হ'লো।

পরদিন সকালে মায়ার সঙ্গে দেখা হ'তেই ব'ললুম, "না মায়া, হ'লো না। ব্যাটা আকাশ ঠাট্টা মস্করা জুড়ে দিয়েচে আমাদের সঙ্গে। সে চায় না আমরা দু'জন বেড়িয়ে পড়ি। ছাখো না কি রসিকতা? আজ কিন্তু রাতের অভিযানে বেরুবো,—যা থাকে কপালে। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, কাঞ্চন জঙ্ঘা উড়ে যাক্, দার্জিলিং পাহাড়টা সমতল হোয়ে যা'ক,—যা খুশী তাই হোক্।"

"বেশ তাই হবে।" হাসি নেই কিন্তু মায়ার মুখে। সরল উদাসীন জবাব। হয়তো ভা'বছিলো সে আমারই দিক্‌টা। দু'দিন তুষারে-ঝড়ো-হাওয়া হয়নি। তাই ব'লে কি আজও হ'তে পারে না নাকি? কিন্তু এই জেদি উত্তেজনা-প্রবণ লোকটি জিদ্ একবার ধ'রেচে যখন তখন মেয়ে মানুষ হোয়ে তাকে খুশী না কোরে উপায় কি?

অতএব সব ঠিক ঠাক্ হ'লো। দুপুররাতে এলো রিক্সাওয়ালা থেকো। বাইরে সদর রাস্তায় রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েচে আরও সঙ্গী তিনজন। আকাশে তেমনি দুর্যোগের ঘনঘটার ঘণ্টাধ্বনি। কানে তালি লাগা চড়্ চড়্ চক্কাৎ বিকট শব্দ। চোখ ধাঁধানো বিজলীর ঝলক্।

এরই মাঝে চ'ড়ে ব'সলুম রিক্সায়। ডবল কম্বলে মুড়িয়ে দিলে আমার দেহখানি মায়া। কপালে একবার হাত দিলে। হাত ঠন্ ঠন্ কোরে ব'লে উঠলে, "ওরে, এ হাত তোর কপালে কপালগুণেই মিলেচে। ছাড়িস্‌নে এ হাত। শক্ত কোরে ধ'রে থাক।" থা'কলুমও নিজের হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ধ'রে। সেও রিক্সায় চেপে ব'সলে আমার পাশে। হাত কিন্তু ছাড়িনি। মুখে কথা নেই অনেকক্ষণ। হাত কত কথাই ব'লে চ'ললো।

আকাশ কালো, ধরিত্রী কালো। আর এই কালোয় মিশে ঐ ধারের গাছগুলো প্রেতের মত দাঁড়িয়ে। এই আঁধারের বুক চিরে চ'লেচে রিক্সা ঠুন ঠুন শব্দ কোরে। আরও কিছুদূর এসে পাওয়া গ্যালো মিউসিপ্যালিটি এলাকার বিজলীবাতি। জ্ব'লচে তারা লম্বা লোহার খুঁটিকে ভর কোরে। ছাখা গ্যালো মার্কেট স্কোয়ারের রাস্তা পেরিয়ে রক্‌ভিল্ রোড ধ'রে চ'লেচি আমরা। আরও কিছুদূর গিয়ে ক্যালকাটা রোডে বিজলীর আলোতে যা দেখলুম তাতে সেই প্রবল শীতের রাতেও ডবল কম্বলের ভেতরে রক্ত মাংস জমাট হোয়ে হাড় শুদ্ধ হিম্ হোয়ে যাচ্ছিলো। আমার সমস্ত সত্তাটাই ভ'য়ে কাঁপচে ঠক্‌ঠক্ কোরে। দাঁতে দাঁতে সত্তা বাড়ি খেতে চায়।

আজ যদি কোনও কুঘটনা, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক ঘ'টে যায়,—সে তো ঘ'টবেই দেখা যাচ্ছে,—তার জন্যে দায়ী আমার অবিবেকী, বল্গাহীন জেদ্। মায়ার মন তো আ'সতে চায়নি আজও। সায় দেয়নি সে সুমনে। শুধু আমাকে

খুশী করার জন্যেই পুরো বাধাও দেয়নি। বামে উঁচু খাড়া পাহাড়। পাশ কেটে পরিষ্কার ক্যালকাটা রোড। নীচে গ'ড়ে গেলেই পাতাল। এই রাস্তার একটি ব্রিজের দু'পাশের দুটি লোহার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে, বোধকরি গণ্ডাচারেক হবে, লাল মুখো গোরা সেপাই। পোষাকে হাইল্যাণ্ডারস্কচ মনে হ'লো। বোশেখী দৃষ্টিতে আমাদের দেশের লাল রংয়ের লোকের গায়ে ঘামাচি চুলকিয়ে রক্তারক্তি কোরলে যেমনটি দেখায় ব্যাটাদের মুখের রং সামনের বিজলীর আলোতে তেমনই দেখাচ্ছিলো। সন্দেহ রইলো না যে তারা এসেছিলো জলাপাহাড় কাটাপাহাড় ক্যান্টন্‌মেণ্ট থেকে দার্জিলিং-এ মদ খেতে। রি রি কোরে মুখ খুলে গান ধ'রেচে।—হৈ হুল্লোড়ও ক'রচে খুব। ওদের মুখের জোর শব্দে বাতাস ধাক্কা খেয়ে ভেসে নিয়ে আ'সছিলো মদের গন্ধ। হয়তো এত রাতে সঙ্গীহীন একটি রিক্সার সামনের পর্দ্দা ফেলা দেখে থেমেচে ওরা একটি মতলব এঁটে। উপায়? ধারে ধুরে কাছে দূরে নজর বরাবর কেউ কোথাও নেই। আমি বীরপুঙ্গব বাঙ্গালী;—সঙ্গে চির আকাঙ্খিতা নারী।

মায়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ কোরে ব'ললুম, "মায়া, তুমি যেন কথা ব'লো না। ওরা তো পশু।" আঁধারেও মায়ার দুষ্টুমি ভরা হাসি টের পেলুম। সেও আমার কানের উপর মুখ রেখে ব'ললে, "তুমি পুরুষ মানুষ সঙ্গে থা'কতে আমার ভয় কি?" কথা শুনে অত শীতেও ঠিক গা জ্বালা ক'রেচে কি মন জ্বালা কোরেচে তা আজ আর সঠিক মনে নেই। শুধু মনে পড়ে অত ভয়ের মধ্যেও আমার চাপা রাগ ফিস্ ফিস্ শব্দে বেড়িয়ে গ্যালো, "দ্যাখো, সব সময় তামাসা ভাল নয়। তার চেয়ে আগে থা'কতেই, এসো ঝাঁপিয়ে পড়ি ঐ পাতালের অতল তলায়।"

"খবরদার!" ব'লে সে আমার হাত চেপে ধ'রে রইলো। তারপর ব'ললে, "তোমার খোদাকে কি তুমি বিশ্বেস করো না?"

ইতিমধ্যে আমাদের রিক্সা এসে গ্যাছে ওদের কাছাকাছি। পাছে মায়া মুখ খোলে তাই ডান হাতে চাপা দিলুম ওর মুখ, এবং সাহস সঞ্চয় কোরে,—গলার স্বর কিছুটা কেঁপেও গিয়ে থা'কবে, মোলায়েম কোরে ইংরেজীতে অভিবাদন জানালুম, "গুড ইভনিং ফ্রেণ্ডস্, আমি একা চ'লেচি টাইগার হিলে সান্-রাইজ দেখতে। রিক্সাওয়ালাদের বড় কষ্ট হ'চ্চে। আমি দুঃখিত।"

সমস্বরে কয়েকজন ব'ললে, "গুড্ ইভ্নিং, ও-ও, কোয়াইট্ ওকে, থ্যাঙ্ক্ ইউ" ব'লে রিক্সাওয়ালাদের হাত থেকে রিক্সা নিয়ে সামনে পেছনে কয়েক জনে আসুরিক শক্তিতে টান'তে লা'গলে রিক্সা। মনে হ'লো রিক্সা ছুটে চ'লেচে সমতল ভূমিতে তীর বেগে। এমনি কোরেই এলো জলা পাহাড়। সেখানকার দল "গুড্ নাইট্," জানিয়ে হস্তান্তর ক'রলে রিক্সা কাটা পাহাড়ের দলকে। তারাও নিজেদের ক্যান্টনমেন্ট্ পর্য্যন্ত নিয়ে এলো তেমনি জোরে, উৎসাহের সঙ্গে। সারা রাস্তা মনের আনন্দে রিক্সা সর্দ্দার শ্বেতা ইংরেজী বকে "গুট্ সা'ব, গুট্, গুট্।" কাটা পাহাড়ের দলও কেটে প'ড়বার সময় জানালে আনন্দহিল্লোলিত "গুড্ নাইট্, গুড্ নাইট্।"

প্রতিধ্বনি ক'রলুম, ধন্যবাদও জানালুম। আর ধন্যবাদ জানালুম সকল সম্মানের মালিক আল্লাকে। এতক্ষণে আমার শুখিয়ে যাওয়া ক'লজেতে পানি এলো; যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গ্যালো।

কিন্তু মজা বাধলো মায়াকে নিয়ে। চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছিলো তার বুকখানা ও মুখখানা। "বাব্বাঃ, বীর পুরুষ বটে। দেখি ধরে প্রাণখানা আছে কি নাই" ব'লে সোজা চালিয়ে দিলে হাতখানা বুকখোলা কোটের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে। রেগে ব'ল্লুম, "ফের্ টিট্কিরি? আমি তো আমি, অমন অবস্থায় তারা যদি আক্রমণ চালাতো তাহ'লে ভীম ভবানী গামা ধানার বাপের সাধ্যি ছিলো তোমায় র'ক্ষে করে? তাদের লোভ তো আমার উপর হ'তো না। হ'তো তোমার মত চাঁদ-বদনীর উপর। মেয়ে মানুষ আর কিছু জানে না, জানে শুধু টিট্কারি দিতে, আর পুরুষকে রাগাতে।"

হাসি তার পুরো বন্ধ হ'লো কিনা আঁধারে দেখতে পেলুম না। "আমার মনের জোর ছিলো মশায়, এই দ্যাখো" ব'লে পাশ থেকে খাপশুদ্ধ বের ক'রলে ভুজালী-খুক্রী এবং আমার হাতে দিয়ে অনুভব করালে যে ও জিনিসটি আদি ও অকৃত্রিম ভুজালী ছোরা ছাড়া নকল কিছুই নয়। এবং ব'লে চ'ল্লে, "আর কিছু না পারি, অন্ততঃ এটুকু পা'রতাম যে এই সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পা'রতাম বেগাতক দেখলে। নয় তো নীচেই ঝাঁপিয়ে প'ড়তাম। কতজনে চেয়ে চেয়ে দেখ্তো সে মজা খানি।"

"আমিও দেখ্‌তুম, না ?" ব'ললুম ফুলে উঠে।

"কি জানি কী ক'রতে তুমি। প্রাণের মায়ার বাড়া নাকি মায়া নাই। লোকে তো বলে।" সহজ ভাবেই ব'ল্‌লে সে।

"লোকে তো বলে। নিমক্‌হারাম। মেয়ে মানুষ জা'তটাই এরকম।" বলে ফেল্‌লুম রাগের মাথায়। কত নিমকই যেন খাইয়েচি তাকে।

হটাৎ তার সুর নরম হোয়ে গ্যালো। ক্ষ্যাপা সন্তানকে মা যে সুরে তোয়াজ কোরে অভিমান ভাঙ্গায়, তেমন সুরেই ব'ললে সে, "না, না, মিছে কথা সোনা। তোমায় মিছি মিছিই ক্ষেপিয়ে দিয়েছি। তাই কি হয় নাকি ? আমি তোমার চোখের সামনে খুনোখুনি, রক্তারক্তি কোরে ম'রছি, আর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছো,—একি হয় কখোনো ? আমি জানি তোমার দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান থা'কতো না সে সময়। আমার সঙ্গে তুমিও ম'রতে। অন্যায় কোরে তোমার প্রাণে আঘাত দিয়েছি। এসো, ঠাণ্ডা হও। কী দুশ্চিন্তার ঝড়ই না ব'য়ে গ্যাছে এতক্ষণ তোমার বুকে। এসো, আমার বুকে দাও তোমার মাথাটা। এখনো রা'ত আছে। ঘুমোও একটুখানি।" ব'লে টেনে নিলে আমার মাথাটা তার বুকে।

এবার আমার চোখ ছেপে পানি এলো। ভ'রে গ্যালো দুনয়ন। ভ'রে গ্যালো মন। নীরব কান্নায় ভিজে গ্যালো তার বুক। আস্তে আস্তে মুছে নিলে সে চোখের পানি তার স্নেহ-সরস ঠোঁটের ও নরম-গালের পরশ দিয়ে। অনুভব ক'রলুম তার শান্ত বুকখানায় সমুদ্রের জোয়ার নেই। নেই সেখানে ঝড়ের বেগে উঠানামা। আছে হেমন্তের নিরুদ্দাম নদীর ধীর প্রবাহ আর প্রশান্তি।

আমার লম্বা চুলগুলির ভেতরে আঙ্গুল বুলাতে লা'গলে সে। আমার চোখ ধ'রে এসেচে।

ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে অন্ধকার। রিক্সার নীচের টিম্‌টিমে লণ্ঠনটির মিট্‌মিটে জোনাকী পোকার মত একটুখানি আলো শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েচে প্রকৃতির বুকের প্রাকৃতিক অন্ধকার। এরই মাঝে জ্ব'লচে শুধু দু'টি নরনারীর বুকে অনির্ব্বান জ্যোতিশিখা। আলোয় আলোময় হ'য়ে গ্যাচে দু'টি বুক। সে আলোয় রোশনাই হ'য়েচে এদের দুনিয়া। সে আলোর আলোকে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।'

এমনি অনুভূতির সঙ্গে ঘুমে ঢুলে প'ড়েচি মায়ার বুকে। কতক্ষণ ঘুমিয়েচি জানিনে। খুব বেশীক্ষণ নাও হোতে পারে। জেগেচি যখন দেখি আমার ডা'ন গাল ও গলা ভিজে। রিক্সার হুড্ থাকা সত্বেও এত পানি এলো কোথা হ'তে? প্রথমে আচমকা ঠাওর করতে পারিনি। পরে মনে হ'লো, 'ওহো আমার সঙ্গেই না র'য়েচে অশ্রুমতীর আবেগময়ী দুটি ঝর্ণাধারা। ব'ললুম না কিছু, জা'নতেও দিলুম না কিছু। শুধু চুপ্টিমেরে তেমনি ভাবেই প'ড়ে রইলুম। কাঁদুক সে। বুকটা খালি হোয়ে যা'ক্। এ পানিতে পলিদ নেই, নেই কোনও আবিলতা। এ পানি স্বর্গীয়। ঝড়ুক আমার মাথায়, গালে, বুকে। ধুয়ে নিক্ আমার যা কিছু মনের অশুচিতা, দুর্ব্বলতা। পূন্য-স্নাত হোয়ে যাই আমি।

টপ্টপ্ ক'রে প'ড়তেই থা'কলো পানি। ক্রমে যেন আর সইতে পা'রচিনে এ একটানা নীরব কান্না। এ কান্না সুখের, দুঃখের, না সন্দেহের? জিজ্ঞেস ক'রবো কি, কেন কাঁদে সে? এদিকে আমার শার্টের কলার ভিজে বুক অবধি এলো যে। ওর চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। নইলে উদ্বেলিত অশ্রু-সায়র নিঃশেষ না হওয়া অবধি চ'লবে এ অফুরন্ত অশ্রুধারা।

আর থা'কতে না পেরে ডাকলুম, "মায়া।"

সাড়া দিলে সে, যেন অনেক দূর থেকে কে জবাব দিচ্চে, "কী?" ভেজা তার কণ্ঠস্বর।

আবার ডা'কলুম, "গৌরী।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত কে যেন আরও দূর থেকে জবাব দিলে, "কী-ী-?" কাছে তো নেই মায়া, যে, কাছের-মায়ার মত জবাব হবে নিকটের। আসল মায়া সে তো এখন কতদূর, কোন্ রাজ্যে আনাগোনা ক'রচে কে জানে। কাছের মায়াকেই দেখলুম এতোদিন। আসল মায়ার ধারেধুরে ঘেঁসতে পা'রলুম না।

চির রহস্যময়ী যে, চির রহস্যময়ীই র'য়ে গেলো সে। স্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টি মানুষ, আর বিচিত্রতম সৃষ্টি নারী। এদের ভেতরে কি আছে আর নেই তার খেই-ও পেলে না ষোলোআনা নৃতত্ববিদ পণ্ডিতগণ আজ অবধি। বিবর্ত্তনে নয়, শুধু শিক্ষায় মজদুর বালিকা হোয়ে গ্যালো পিগ্ম্যালিয়ন বার্ণাড শ'র হাতে, আর আবর্ত্তনে ও পরিবেশে ফুলের মত শুভ্রা কাটুশা হোয়ে গ্যালো তাড়কা রাক্ষুসী ভস্তুয়েস

হাতে। কিন্তু মায়াতো শুধু আমার হাতেই প'ড়েচে। আমারই হাতে গড়া মায়াকে কি জা'নতে পা'রবো না আমি? জা'নতে পা'রবো নাকি তার মনোজগতের ছায় ছাবর বিচিত্র পদচারণ?

দেখিই না কি হয়। তাই ফের্ আসল কথাটাই জিজ্ঞেস ক'রলুম, "তুমি কাঁদচো?"

ব'ললে সে, "কই, নাতো।"

আমার হাতখানা দিলুম ওর চোখে ও গালে। ব'ললুম, "আমার হাতকে কি তুমি অবিশ্বেস ক'রতে ব'লচো?"

ব'ললে সে, "না।" কান্নায় কেঁপে গেলো তার কণ্ঠস্বর।

"তবে?"

"আমার চোখ দুটোকেই তুমি অবিশ্বাস করো বাদ্‌শাহ্।" বড় ভেজা তার কথাগুলো।

"আর এই পানি?" জিজ্ঞেস ক'রলুম।

"জানিনে কী এটা। হয়তো শিশির, নয়তো বুকের রক্ত।"

তখনো কাঁ'দচে সে।

"মায়া।" খাড়া হোয়ে টেনে নিলুম তার মাথাটি নিজের বুকে। আবেগের ধাক্কায় নিজের চোখ দুটোও টল্‌টল্ ক'রছিলো। গলার আওয়াজও ভাবাবেগে স্ফীত হোয়েচে। আমার বাম হাত তার বাম স্কন্ধে। ডান হাতে মুখখানি তুলে ধর'লুম নিজের মুখের কাছে। আবেগ-কম্পিত প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ললুম, "মায়া, ব'লবে না আমায় কি হ'চ্চে তোমার বুকের ভেতর? সোনার মায়া, বলো শীগ্‌গীর, আমি সইতে পারচিনে। আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলবো।"

মায়া সাক্ষাৎ মায়াই বটে। কণ্ঠে বিশ্বের মায়া জড়িয়ে ব'ললে আমার মুখটি বাম হাতে ধ'রে, "না সোনা, তুমি কেঁদো না। তুমি কাঁদবে কিসের দুঃখে? কই, আমি তো আর কাঁ'দ্‌ছিনা। বুকটা কেমন যেন ভারী হোয়ে গেছলো। এখন হাল্কা হোয়ে গ্যালো। তোমার মত ছেলে মানুষকে আমার মত যে মেয়ে নাড়াচাড়া কোরবে সে কত বড় রাজরাজেশ্বরী! হাল্কা মেয়ে মানুষের হাতে প'ড়লে তোমার সোনার প্রাণ মাটি হোয়ে যাবে। সে চিন্তা ক'রতেও আমার খুব কষ্ট হয়।"

ব'ললুম, "সে কথা কেন মায়া ? ও ধরণের চিন্তা তুমি কেন বার বার করো ? সে মেয়ে মানুষ কি তুমি নও ?"

ব'ললে সে, "হয়তো আমি। কিন্তু কে জানে ? মানুষের ভাগ্যলিপি লেখার কলম যার হাতে, সে তুমিও নও আমিও না। যাঁর হাতে কলম, তাঁকে তোমার মত সামনে পাই না যে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হোয়ে যাবো। কিম্বা মুখের প্রতিশ্রুতি আদায় কোরে তবে ছা'ড়বো। বাংলা বইয়ে প'ড়েছিলুম, 'সে যে অধর, রয় ধরাময়, অধর তারে কে ধ'রতে পারে।' ইংরেজীতে প'ড়েছিলাম, তুমিও প'ড়েছো, 'Ther's many a slip between the cup and the lip.' তাই, থেকে থেকে মন বড় দুর্ব্বল হোয়ে যায়, সোনা। কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি। তোমার মায়াডোর যে বড্ড দুর্ব্বল, সোনা। ভিখারিণীর ছিন্ন মলিন অঞ্চল কি পা'রবে এ দুর্লভ মানিককে গেরো দিয়ে রা'খতে ? তোমার বাপ মা এখনো বেঁচে। বেঁচে থাকুন তাঁরা। তোমার বড় বড় আত্মীয়-স্বজন। তোমার অনেক সম্পদ। তোমার নাই কি ? তোমার সমাজে ভালো ভালো মেয়ের প্রাচুর্য্য। তোমার মায়াবন্ধন হয়তো একদিন মাকড়-সার জালের মত এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। তার আগে তোমার কোলে আমার মরণ হোক্, সোনা।"

হাত সরিয়ে কোলের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠ্‌লে মায়া। বুকের সঞ্চিত কান্নার বেগ ফুলে ফুলে তুলছিলো তার পিঠখানা।

সন্দেহ নেই তার ভালোবাসার মধ্যে। নেই সন্দেহ তার আমারটির মধ্যেও। সে আমিও যেমন বিশ্বেস করি, বিশ্বেস সেও করে তেমনিই। তার শঙ্কা যা কিছু তা আমার ভালোবাসার স্থায়িত্ব নিয়ে। দুনিয়ার মানুষ সে। এ শঙ্কা তার অমূলক এ কথা বলি কি কোরে ? ভবিষ্যতের কোনও ছায়া যদি তার অমলিন মন-মুকুরে প'ড়ে থাকে তো তাকে দোষ দিই কি কোরে ? শেক্‌স্‌পীয়ারের মত মানব-মনাভিজ্ঞ ব্যক্তিও যখন ব'লে গ্যাছেন, "Two loves I have, of comfort and despair."

পাবার আশার মধ্যে যতো আনন্দ,—পেয়ে গেলেই সে আনন্দ আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃপ্তির আয়ু মানব জীবনে দীর্ঘ নয়, যেমন দীর্ঘায়ু তৃপ্ত হবার আশা।

একবার পেয়েছি তো বাসি হোতে আর দেরী নেই। আদর্শে পৌঁছে গেলুম আর রইলো না তা আদর্শ হোয়ে। নূতন মাণের আদর্শ স'রে গ্যালো অনেক দূ নূতন ভাবে তার পিছু ধাওয়া করার জন্যে। হাসিছে আছে, আশা ও ভয়ের মাঝখা বেহেশ তের স্থিতি। প্রেমরূপ বেহেশ্‌তের স্থিতিও কি ঐ উভয়ের মাঝখানে হ না? প্রিয়কে না-পাবার, হারিয়ে-যাবার-আশঙ্কা বেশী উদ্‌গ্রীব করে মনকে আর বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরার জন্যে। তাইতো মরণাপন্ন সন্তানের দিকে নাওয়া খাও ছেড়ে দিয়ে মা চেয়ে থাকে তাঁর অনিমেষ সজল দৃষ্টি দিয়ে। তাইতো দেখি মায়া আজকাল আমাকে—তার শঙ্কাপরায়ণ মন বুকের ভেতরে টিক্‌টিক্ ঠিক্‌ঠিক্ কোে কি ব'লে দিচ্চে জানিনে,—যেন চোখের আড়াল ক'রতে চায় না। তার সকৎ কাজের ভেতরেও যেন চোখ দুটি র'য়েছে আমারই দিকে। আমার অসুখের ভেতে যা দেখলুম সে তো আলাদা কথা। সেই মায়া যদি আজ তার চোখের পানির কার চিরন্তন নারীর মত বলে কবির ভাষায়,

"কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল এ নহে ভৎর্সনা।"—

"প্রাণ মন সব ল'য়ে ডুবিতেছি
আশা-আকাঙ্খা-পারাবারে,
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বদনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কেমনে পাবো
তাই ক্রন্দন এ।"—তাহ'লে কী জবাব দেবার আছে

আমার? কিন্তু তা ব'লে তাকে তো এমনি ভাবে কাঁ'দতে দিতে পারিনে। এ নীরব নিশীথ আর ঐ তারায়-ভরা আকাশ বিদ্রূপ ক'রচে আমাকে, এতোক্ষণও

চেপে ঘোড়দৌড় ক'রে নিচ্চিস্ আমার মায়াকে। আর দুশ্চিন্তার বেড়া-আগু লাগিয়ে দিয়ে পোড়াচ্চিস তাকে আর আমাকে।"

নয়তো সে মনটাকে এই হিমালয়ের বরফ-চাপা দিয়ে সব ঠাণ্ডা কোে দিতুম। রা'খতুম তাকে জম্-জমাট কোরে নিজের দেহের ভেতর। ইচ্ছেমং বের করতুম আর মনের সুখে নাড়াচাড়া ক'তুম। রইতো না আশঙ্কা, রইতো ন সন্দেহ।

তা যখন সম্ভব নয় তখন সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই ক'রতে হবে আমা সদাহাস্য লাস্যময়ী পূর্ব্বেকার মায়াকে ফিরে আ'নতে। এই তো ঘণ্টা কয়েব পূর্ব্বেও সে ছিল রঙ্গময়ী। তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য্য, তার প্রেম-রসেভর রসিকতা, মরা-প্রাণে বান ডেকে আ'নতো। আবার ফিরিয়ে আ নতে হবে ে ভাব। নইলে আমার এই বড় আশার নিশা-অভিসার যে সবই ব্যর্থ হোয়ে যায় ভালোবাসার ও'দিকটিও উপভোগ ক'রবার মত বটে। কিন্তু উপযুক্ত স্থান ও কা তো এ নয়। এখানে চাই প্রাণ-চঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল, দীপ্তিময়ী মায়ার বুদ্ধি-দীং কথার চোটে অস্থির হোয়ে উঠা,—পরাজয় মানা। আনন্দ-ভরা প্রাণে নজরুলবে ভেঙ্গে চুড়ে আওড়াতুম,

"ওগো বিজয়িনী, তোমার কাছে হার মানি
আজ শেষে।
আর এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে।
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।"
তোমার উপর জয়ী আমি
তোমায় ভালোবেসে।

যোগ দিলুম নিজের শেষ চরণটি। এদিকে ক্রমে ক্রমে পূব দিকটা আরং একটু ফর্সা হোয়ে আস্চে। কিন্তু ফর্সা হোয়ে আসচে না এখনো মায়ার মন করুণ হোয়ে আকাশে দেখা দিলো শুকতারা। তার সে দীপ্তি নেই যেনো। অ দিন হেসে দেখা দিতো পূব আকাশে। মনে প'ড়তো কবির কথা,

"শুকতারা নীলাকাশে ঐ যে উদিল হেসে
আমার পরাণ-প্রিয় সে তো ফিরে এলো না।"

আর তার হ'লো কি? সেও কি ডুবে ডুবে, আঁধারে লুকিয়ে থেকে দেখছিলো মায়ার বুকফাটা কান্না? মন-মায়ার সহজাতি ব'লে সেও কি সমব্যাথী আজ মনমায়ার দুখে? এরা দুজনেই যেন জোট ক'রেচে আমাকে কাঁদাতে। মাটি কোরে দিলে এ হেন সুখের রজনী। কি ভেবেই যে যাত্রা ক'রেছিলুম। আজ নেহায়েৎ কুযাত্রা হয় বুঝিবা। কথা আর খুঁজে পাচ্ছিলুম না যে মায়াকে চাঙ্গা কোরে তুলি। কত আশা কোরে বেড়িয়েছিলুম যে মায়াই আমাকে তার হাসিখুশী তার চমক-লাগানো সংক্রামক আনন্দহিল্লোল, কথারচটক্ দিয়ে তুলবে অসম্ভব রকম চাঙ্গা কোরে। নিজে হারিয়ে যাবো, ডুবে যাবো তার মধ্যে। আর কিনা কঠোর বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আ'সতে হ'চ্চে বারে বারে। তাই বুঝি হোয়ে থাকে, Man proposes, God or Woman disposes.

তবু আশার আশা খুঁজে ম'রছিলুম। খুঁজে ম'রছিলুম উপলক্ষ্য পেতে। হাতের কাছে নেই আর কিছু ঐ শুকতারা ছাড়া। তাই তুলে ধ'রলুম তার সামনে, "মায়া, ঐ দেখো, প্রভাতী তারা জেগেছে পূবাকাশে। রা'ত বুঝি আর বেশী বাকী নেই। কেমন লাগে তোমার শুকতারাকে? দ্যাখো না, কেমন জ্বল্ জ্বল্ ক'রে চেয়ে র'য়েচে আমাদের দিকে।"

মায়া তার দিকে চেয়ে হাত জুড়লে কপালে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে এসব কিছু নেই জানি। মনে হয় হিঁদু মেয়েদের সঙ্গে দীর্ঘ সাহচর্য্যের ফলেই ল'ভেছে এ অর্জ্জিত সংস্কার। হয়তো ওটা ক্ষণিক ভাবাবেগ। তারপর ব'ললে, "ওকে তো আমি তারকা ব'লে জানিনে। জানি ওকে আকাশ-কন্যা ব'লে। আমারই মত আছে ওর মন-ভরা আশা-নিরাশা। প্রতি রাতেই আসে ওর প্রিয়তমের খোঁজে। পায় না, তাই সকাল হ'লেই মলিন বদনে ফিরে যায় পিতৃগৃহে। কে যেন ওকে ভাল-বাসার স্বাদ চাখিয়ে পাগ্‌লী ক'রে ছেড়ে দিয়ে স'রে প'ড়েচে। বেচারী জীবন ভর খুঁজে ফির্‌চে তাকে। প্রাণ-মন স'পেছে একজনকে তো আর যায় কোথায়? জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্ব'লচে ওর চোখ ব'লছো? ও তো পাগলের একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। না, না, বহ্নিজ্বালা। ওর বুকটাও জ্ব'লচে তেমনি ক'রেই। ওর দেহটাও জ্ব'লে জ্ব'লে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আলোময় হ'য়ে গ্যাছে।"

মাঃ, কোনো দিকেই সুবিধে ক'রতে পা'রছিনে। আমি গেলুম কোন পথে আর সে গ্যালো কোথায়। কিছুতেই ওর মনটা আজ সুস্থ হোয়ে উঠচে না।

একটুখানি হাসির মৃদু রেখাও ফুটে উঠতো ওর চাপা ঠোঁটে তো ওর মাথাটা আমার কাঁধে ভর দিয়ে, ডা'ন হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে, আওড়াতুম কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়াম,

"শুনছো সখি, শুনছো সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক,
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেলো দিগ্বিদিক?
পূব গগণে দেব শিকারীর স্বর্ণ উজল কিরণ তীর
লা'গলো এসে রাজ প্রাসাদের মিনার যেথায় উচ্চ শির।"

পূব গগণে দেবশিকারী স্বর্ণ উজ্বল তীর নিয়ে এখনো দেখা দেয়নি। যাচ্ছি তাকেই দেখতে। কখন হবে সকাল? কখন দেখা দেবে সে?

ঠুন্ ঠুন্ শব্দ কোরে রিক্সা এসে থা'মলো আরও কয়েকশ' গজ উচু একটি পাহাড়ের পাদ মূলে। শ্বেতা ব'ললে, "হুজুর, আর তো গাড়ী চ'লতে পা'রবে না।" দেখলুম ওরা পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে গ্যাচে। ব'ললে মায়া, "টাইগার হিল পৌঁছে গেছি। বাকী খাড়া টুকুন্ চ'ড়তে হবে পায়ে পায়ে।"

কম্বল টম্বল শ্বেতার জিম্মায় জমা দিয়ে চ'ললুম দুজনে হাত ধরাধরি। পাহাড়ের মাথার ছোট্ট পর্য্যবেক্ষণ-ঘরে পৌঁছলুম যখন তখনও তেমন ফর্সা হয়নি। কিন্তু বহু নরনারীর পূর্ব্ব হোতেই ভীড় জ'মেচে। প্রায় সব দেশেরই দু'একজন আছে। এমন কি 'লালমুখ আজরাইলের ভাই' বোনও বাদ পড়েনি। কি আছে এই সূর্য্যোদয় দৃশ্যে যার জন্যে এত বরফ ঢালা ঠাণ্ডায় সারারা'তও কেটেচে এখানে কেউ কেউ।

কৌতূহল আমার বেড়ে গ্যালো শতগুণ। কোনও রূপে ঠাঁই কোরে নিলুম আমরা অবজারভেটিরিতে। আরও একটু ফর্সা হ'লে চা'র ধারে চেয়ে দেখলুম নীচে পালে পালে সাদা ভেড়া শুয়ে আছে গায়ে গায়ে ভিড়ে। এত ভেড়া এলো কোথা হ'তে পাহাড়গুলোর উপত্যাকায়? সে কথা জিজ্ঞেস ক'রলুম মায়াকে, "মায়া, তোমাদের পাহাড়ের মাথায় এত অগুণ্তি ভেড়া জ'মলো কি কোরে?"

চোখের ইশারা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলে সে, "জিজ্ঞেস করো না ভেড়াগুলোকে, কিসের আশায় জ'মেছে এরা এই ঠাণ্ডা কৈলাসে? না হয় তোমার তুমিকেই জিজ্ঞেস করো, সকলের জবাব মিলে যাবে তোমার মধ্যে।"

ব'ললুম, "আরে না না। তুমিও যেমন। ঐ উপত্যকার দিকে চেয়ে দ্যাখো না।"

ব'ললে, "ও, ওগুলো তো সাদা সাদা মেঘ। রাতের বেলা শুয়ে থাকে এখানে। দিনের বেলা রোদের চিকেশ্ পেয়ে উড়ে যায় যত্রতত্র।"

তাই তো। সাদা সাদা মেঘই বটে। পেঁজা তুলোর মত ফেঁপে উঠে গায়ে গায়ে ভিড়ে র'য়েচে। দৃষ্টি ভ্রম আমার। তারও ওপারে মনে হ'লো মহা-নীল সমুদ্দুর। নীলে নীলে নীলময় হোয়ে গ্যাচে তার পানির স্তর। সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে র'য়েচে পূব দিকে কার আগমন প্রতীক্ষায়, যেন প্রথম দর্শনের শুভ মূহুর্ত্তটি ফসকে না যায়। আরও কিছু পরে যেন সেই নীল মহাসমুদ্র দোলা খেয়ে উঠলো একটু তামাটে আলোর ঝলকানিতে। ধীরে ধীরে বেরুতে লাগলো 'দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজ্জ্বল কিরণ-তীর।' এর পর এক লাফে বেড়িয়ে এলো সেই মহানীলের উপরিভাগে দ্বিতীয়ার এক ফালি চাঁদের মত বিগলিত তাঁবার একটি চাঁদ। মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে কলাবৃদ্ধি হ'তে থা'কলো তার। প্রতি কলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে থা'কলো সে উপর দিকে, যেন পুরীর ঠুঁটো জগন্নাথমূর্ত্তি স্বক্ষমতায় লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশপানে ধাইচে। সত্যজীবন্ত ঐ সূর্য্য। নইলে অমন কোরে ছায়াবাজীর পুতুলের মত না'চতে না'চ্তে ঝম্প দিয়ে দিয়ে কেউ উঠতে পারে না আকাশে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পুরো হ'য়ে গ্যালো তার ষোলকলা বৃদ্ধি। ইতি মধ্যে উঠে প'ড়েচে সে বেশ কয়েকগজ উপরে। বোঁ বোঁ ক'রে বিষম চক্কর খেতে থা'কলো সেই তাম্র গোলক। এত চক্কর যে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। চক্কর খায় আর উপরে উঠে, উঠে আর চক্কর খায়। এক সময়ে তার ভোজবাজী, ভানুমতীর খেল স্তব্ধ হোয়ে এলো। স্থির আকাশে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে গ্যালো সে। এবার ফেরাও দৃষ্টি উত্তরে ঐ কাঞ্চন জঙ্ঘার দিকে। মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে পট পরিবর্ত্তন হ'চ্চে। রামধনুর সপ্ত রংয়ের খেলায় মেতে উঠেচে তার শিখরগুলো। সে ঝলক্ ঠিক্‌রে

এসে প'ড়চে চোখে। আরও উত্তর পশ্চিম কোণে দূরে—বহুদূরে ঐ দেখা য এভারেষ্ট। সেখানেও প'ড়েচে মহাজ্যোতির জ্যোতিশিখা অপরূপ আভায় বিস্ময়-বিমূঢ় চোখ দু'টী তাকিয়ে তাকিয়ে হয়রান হোয়ে যাচ্চে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব রংয়ে হোলিখেলার দৃশ্যে। এ কী খেলায় মেতে উঠেচে তুঙ্গতুহিন শিরের স্বর্গ অদৃশ্য জীবেরা পিচকিরি হাতে নিয়ে। রংয়ে রংয়ে রংময় কোরে দিলে পর্ব্বত চুড়ো গুলো। বহু প্রতীক্ষার পর পেয়েচে তারা রংরাজকে। খুশীর অভ্যর্থনার অন্ত নেই তাদের; অন্ত নেই তাদের রং নিয়ে ঢলাঢলির। এদিকে আমার মত জীব-ধারী যাঁরা তাঁদেরও লাফালাফির অন্ত নেই। বিস্ময় সূচক কথার চীৎকারে কানে তালা লা'গবার উপক্রম। যে রকম দাপাদাপি, তাতে হটাৎ দম বন্ধ হোয়েও আ'সতে পারে এদের। সবাইকে ছাড়িয়ে উঠচে মেম্ বেটিদের লাফালাফি আর চীৎকার। পাগল হোয়ে গ্যালো, পাগল হোয়ে গ্যালো এরা। উঁচু সরু গোড়ালীর জুতো লাফালাফির চোটে কখন এক সময় মু'মড়ে প'ড়ে না যায়। ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দে ফটো নেবার চেষ্টা চ'লচে অনেকের হাতের ছবি-ধরণ ছোট্ট বাক্সগুলোতে। দূরবীক্ষণ নাকের ডগায় ধ'রে ঘুরে ফিরে মুখ হাঁ কোরে এধার ওধার দেখচে কেউ কেউ। আবেগ ও উৎসাহের আতিশয্যে শিষ্টাচারের গণ্ডী এক লহমায় তুড়ে কেউ কেউ কেড়ে নিচ্চে অপরের চোখ থেকে দূরবীক্ষণ। মন সকলেরই হাল্কা। দোষ এতে ধ'রচে না কেউ। বরং আনন্দই পেয়ে থা'কবে।

এ সবের মাঝখানে একটি নারী মুর্ত্তি স্থির—অতিস্থির। ব্যবহারে ও মুখে নেই কোনও আবেগ ও উত্তেজনার চিহ্ন। বিস্ময়াহতও নয় সে। মনে হয় কোনও বিষাদ-শিল্পীর হাতের কোনও করুণ মৃন্ময়ী-মূর্ত্তি এক ঠাঁই খাড়া হোয়ে ইঙ্গিত-শূন্য উদাসীন-চোখে দাঁড়িয়ে র'য়েচে মাত্র।

এক সময়ে আমি আমার দূরবীন্ দিতে গেলুম তাকে। "মারা, সবাই দেখচে, তুমিও ছাখো না একবার।" উদাস কণ্ঠে জবাব দিলে সে, "তোমার দেখারই প্রয়োজন বেশী। আমি তো ভিন্-দেশের লোক নই।"

সত্যিই তো। কিন্তু তবু ক্ষুণ্ণ হ'লো মন। আমাকে খুশী করার প্রয়োজনেও তো তার প্রয়োজন ছিলো আমার প্রস্তাব গ্রহণ করার। আমার দূরবীন একবার ছুঁয়ে দিলে না কেন সে? আর কিছুই ব'ললুম না। এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

এদিকে ঠাণ্ডা হোয়ে এলো সব। পূবগগণের দেব-শিকারী অনেক উপরে উঠে রাজপোষাক খুলে ফেলে নিত্যিকার সাধারণ বেশে অবিরাম চ'লচে কাকে যেন শিকার ধ'রতে। কবিরা বলেন, নিশিরাণীর প্রেমে প'ড়ে এর ছুটোছুটীর আর অবধি নেই। নিশিরাণীও রঙ্গময়ীর ঢং নিয়ে প্রলুব্ধকারিনীর বাঁকা-দৃষ্টি ফেলে ফেলে সা'মনে দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর হা'সচে। রাগে দুঃখে এ্যাপোলো ছুঁড়ে মা'রচে তার রূপের তীর। তবু শ্যাম-সুন্দরীর আহ্লাদের অন্ত নেই। দিচ্ছে না ধরা, দেবেও না কোনও দিন। অনন্তকাল চ'লবে এ অনুরাগের রসলীলা।

যাকে দেখতে আসা দেখা হ'য়ে গ্যালো তাকে। সাধ মিটেচে সবার। যেমন রমজানের প্রথম-চাঁদ দেখার আগ্রহ মিটে যায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে। তৃপ্ত মনে হাসি মুখে পরস্পর ছালাম কোরে চ'লে যায় যে যার ঘরে। সূর্য্য তো তখনো আকাশে বিরাজমান। কিন্তু আর দেখচে না কেউ ;— ভুলেও উপর দিকে নজর ফেলচে না কেউ। ভোজন শেষে এঁটো কলাপাতের দিকে লোভ নেই কারো। দূর্ দূর্ কোরে নেবে গ্যালো সবাই,—হয়তো অবিস্মরণীয় একটী স্মৃতি মনের কোঠায় জ'মে নিয়ে। যতদিন থা'কবে জীবন, থা'কবে টাইগার হিলের এই জীবন্ত-দৃশ্য স্মৃতি-জ্যান্ত হোয়ে!

নেমে আমিও এলুম সকলের শেষে মায়ার হাত ধ'রে। নীচ থেকে উপরে ভেসে আ'সচে কতকগুলো উড়ন্ত ধূসর বর্ণের কার্পেট। আলাদীনের ম্যাজিক্ কার্পেটই হবে হয়তো। গা ঘেঁষে ঘেঁষে উপরে উঠে গ্যালো গুটী কতক ধূম্রাকারে। মায়কে ও আমায় স্বর্গপানে তুলে নিয়ে যায় বুঝি বা। সমতলভূমি থেকে মেঘের রাজ্যের বাসিন্দাদের নিয়ে কত কল্পনাই ক'রেচি। আর সেই মেঘ আজ পায়ে ছালাম কোরে হাসি মুখে উড়ে যায় গা ঘেঁষে। মেঘের রাজ্যেরও উপরে উঠেচি তাহ'লে। কিন্তু নিয়ে যেতো মেঘ দূতরা—যুগল-প্রণয়ীর মনের বেদন পৃথিবীর চারি ধারে! নয় তো ওদের ধূঁয়োর কোলে উড়ে নিত আমাদের উভয়কে এ দুনিয়ার নিরাশার হাত থেকে ছিনিয়ে! লাইলী-মজনু যেমন নাকি এমনি কোরে একদিন কবর থেকে জোড় বেঁধে উঠে গিয়েছিলো মেঘের কোলে।

"তোমাদের দেশের মেঘগুলোর কি আক্কেল দ্যাখো তো? দুষ্টু মেয়েদের মতো যেন গায়ে প'ড়ে রসিকতা ক'রতে চায়। আমাদের গা ঘেঁষে না গিয়ে একটু স'রে গেলেই তো পা'রতো।" ব'ললুম মায়াকে।

তেমনি নিরানন্দ উদাস মুখে রসিকতা কোরেই জবাব দিতে চাইলে (
কিন্তু জ'মে উঠ্‌লো না। কেন উঠবে? কথাই তো সব নয়। বহিরাঙ্গে প্রকা
মনের ছবি জানিয়ে দেয় তার আসল রূপ। তাই টেনে-আনা হাসি ও কথাতে কা
হাসির উদ্রেক করে না।

ব'ললে মায়া, "সত্যি, আক্কেল নাই মেঘগুলোর। ওরা খুলনার দক্ষিণে
সাগর থেকে এসেচে কিনা। পাহাড়ে এসে প্রথম প্রথম একটু রসিকতাই করে
বটে। হয়তো নিজেরাও একটু রসিয়ে যায়। তাই তো আবার ফিরে যায় খুলনা
সরস হোয়ে।"

কথাটা যেন হুল-মেশানো মনের আশঙ্কা ও খেদ ব'লেই মনে হ'লো
কথার পৃষ্ঠে কথা ঝা'ড়লুম, "মায়া, মেঘ আর মানুষ সমান নয়। মেঘ রসিকত
ক'রে উড়ে যায়। খুলনার মানুষ ভালোবেসে থেকে যায়। তারা ভালোবাসতে
জানে। সন্দেহ ক'রতে জানে না।"

কষ্ট হাসি হেসে ব'ললে মায়া, "তোমার ভালোবাসায় সন্দেহ তো করিনি
বাদশাহ। সন্দেহ নিজের উপর। ওগো, তোমার মায়া আজ তোমার জন্যে
গরবিণী। এত সুখের মুখ জীবনে দেখেনি সে প্রেম-কাঙালিনী। তাই তো
থেকে থেকে মনে হয় এত সুখ অভাগীর কপালে সইবে তো! যেখানে খুশী আজ
তুমি আমায় নিয়ে চলো। তুমি কাছে থা'কলে আমি সব দুঃখ হাসি-মুখে বইতে
পা'রবো।"

সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ। বুকের কোন খানটায় তার খচ্ খচ্ ক'রে কাঁটার
মত বিঁধচে সে আমি টের পেয়েচি। টের পেয়েচি তার মনের অমৃত ধারার
সমান্তরাল বিষ-নদীর গুপ্ত-প্রবাহ। বিয়ে না করা পর্যন্ত এ দুষ্ট প্রবাহ বোধ করি
থা'মবে না। মন ব'লচে, 'ওরে, তোর বুকটা চিড়ে ফেঁড়ে একবার দেখা তোর
প্রেমময়ীকে। শান্ত হোক সে।'

রাস্তায় তখনো দু'চারজন লোকের নেবে আসা শেষ হয়নি। আবেগাতি-
শয্যে এ রাস্তায় কিছু করা অর্দ্ধ-পাগলের পক্ষেও বোধ করি সম্ভবপর নয়।

পাহাড় থেকে নেবে রিক্সায় চাপলুম দু'জনে। সামনের পর্দ্দা ফেলে দেয়া
হ'লো। এবার তার মুখখানা দু'হাতে ধ'রে চোখে চোখে তাকিয়ে আবেগভরে

ব'ললুম, "মায়া, ভালো ক'রে তাকাও আমার মুখের দিকে। পড়ো এ মুখখানায় কি লেখা আছে। আমার মনের কথা ফুটে উঠেচে এ মুখে। প'ড়তে কি পা'রছো যে তোমায় ছেড়ে একদিনও আমি বাঁ'চবো না ?

দেখতে দেখতে এলিয়ে প'লো সে আমার বুকে। শুনতে পাচ্চি তার বুকের শব্দ। ফুঁপিয়ে সে ব'ললে বুকে মুখ রেখে, "আমার মন আজ বরাবর ভারী দেখছো। তুমি দুঃখ পাচ্ছো। আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে। ঐ সূর্য্য ঠাকুর আমাকে কি ব'ললে জানো ? ব'ললে, "ওরে বোকা মেয়ে, আমার আজকের এই উদয়-দৃশ্যের মতই তোর জীবনটাও একটি মায়াময় ভ্রমমাত্র। আমার মন ভেঙ্গে প'ড়েছে। কিসের যেন অজানা এক আতঙ্ক আমার মনকে ঘিরে ধ'রেছে। বাদশাহ, দোহাই তোমার ধর্ম্মের, আমার জীবনটাকে যেন ঊষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ ক'রে দিয়ো না, বাদশাহ।"

কান্নায় ফেটে প'লো এবার। শেষের আবেদনটি আমার বুকে বোমার মত আওয়াজ কোরে উঠ্‌লো। চ'ম্‌কে উঠলুম নিজে। কিছুক্ষণের জন্যে কথা ফুটলো না মুখে। তারপর পাগলের মত ব'ললুম, "না, না, না, না। ধর্ম্ম সাক্ষী, আল্লাহ সাক্ষী, মায়া, ধর্ম্ম সাক্ষী, আল্লাহ সাক্ষী। ব্যর্থ হ'তে দেবো না।"

বুকে চেপে ধ'রে রাখলুম তাকে জোরে। স্তব্ধ হ'য়ে এসেচে মুখের ভাষা। শতমুখী হোয়েচে দু'জনের বুক।

এগারো

বেশ কয়েকদিন যাইনি স্যানিটারিয়ামে। যাওয়া তো টাকার খোঁজে। টাকা এখন না হ'লেও চ'লে। দরকার যার খরচ ক'রবার ক'রচে সে। নবাযুগের যুবক হোয়েও বিড়ি সিগারেট পান তামাকের সুঅভ্যাস ক'রবার সুযোগ পাইনি। বন্ধু বান্ধব দু'চার জনা ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা ক'রেচে বহুপ্রকারে দলে টা'নবার, "একটা

টান্ দিয়েই ছাখো না, ক্যামন মজা লাগে।" তাদের মজাকে ছালাম কোরে মজার লোভ সা'মলে নিয়েচি। মনে পড়েচে আব্বাকে। আমার সেই কঠোর সংযমী আব্বা। আচারে ব্যবহারে কথায় সংযম-শিথিলতার অবকাশ নেই কোনখানে। তাই বেঁচে গেচি বাণ্ডিল বাণ্ডিল আকাশে ধুঁয়ো ছোঁড়ার মোটা খরচ থেকে। আর র'ক্ষে ক'রেচি লাল ঠোঁট ছ'টোকে কালো হওয়ার হাত থেকে। দানা পানি চা;— সে তো মিলচে মায়ার মায়াময় হাতে। হাত তার হ'য়ে উঠেচে দরাজ, যা নাকি সচরাচর হিসেবী পাহাড়ী মেয়েদের হয় না। বাপের দেয়া টাকা গুলোর এতদিন পরে সদ্‌গতি ক'রচে সে। জমানোর চেয়ে খরচ করার আনন্দ যে এত বেশী, এ অভিজ্ঞতা তারও তো হয়নি এতদিন। হাত পুড়ে রান্না করার এত সুখ, তাও তো জা'নতো না সে কমলামুখী। উনুনের ধুঁয়োয়, আগুনের তাপে কমলা বরণ মুখখানি হোয়ে যেতো তাঁবা বরণ। দুঃখ করতুম দেখে। ব'লতো সে "মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মালে ছা'ড়তে চাইতে না এ সুখ। এ সুখের তুলনা নেই।" না থা'ক তুলনা। তার তো সবই অতুলনীয়। কিন্তু পিতাঠাকুর এসে এখন হিসেব চাইবেন, দেখতে চাইবেন টাকার থ'লে, তখন কোথায় লুকোবো এ বেহায়া মুখ আমার? অথচ আমি নিজে ট্যাঁকের পয়সা খরচা কোরলে অভিমানের আর অন্ত থাকে না। ভারী তো মুস্কিলে পড়া গ্যালো! বলে মায়া, "জবাব দেবার আমার; তোমার তো নয়? আসুন তিনি, তোমার সামনেই দেবো জবাব, যদি দরকার হয়। হবে না গো, হবে না। বিশ্বাস করো তোমার মায়াকে। মিথ্যা বলে না তোমার মায়া। বুড়ো বাপ-মায়ের এখন আমিই টাকা, আমিই জীবন। আমার সুখেই তাঁদের সুখ।"

মুহূর্ত্তেই বুঝে ফেলি সব। আবার ভুলিও। ভুলায় আমার সহজাত সঙ্কোচ। কিন্তু এখন থেকে সে সঙ্কোচ থা'কতে বাধ্য হয় শুধু তার আদিম জন্ম-স্থানে,—মনে।

আমি এসে অবধি দেখা হয়নি সে বুড়ো ফরেষ্টরেঞ্জারের সঙ্গে। চিঠি এসেচে মায়ার কাছে, কোন্ জঙ্গলে নাকি গাছ কাটা শুরু হ'য়েচে এখন। তাই দেরী হবে তাঁর আ'সতে আরও হপ্তাখানেক। মন্দ সংসারে ঠাঁই নিইনি! উদাসীন ধর্ম্মপন্থা-মনা বৃদ্ধা মা জন্মান্তরের চিন্তায় অহরহ অস্থির। নির্ব্বাণ এক জীবনেই মিলে

কিনা এমন তপস্যাই শুরু ক'রেচেন মা। জওয়ান ছেলে ম'রে গ্যালো। তিনিও এখনি মরেন যদি ? কাজেই শিক্ষিতা বয়স্থা মেয়ে নিজের নির্ব্বাহের ব্যবস্থা নিজেই করুক তাতে পারের পথযাত্রীর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি ? বুড়ো বাপের গর্ব্ব আছে, তাঁর বংশে বংশের মুখে চুন কালি লেপে দেয়নি কেউ। মায়াও তাঁরই বীজে পয়দা তো ? যাই-ই করুক বাপের নাম ডুবোবে না সে। এ বিশ্বেস কত বড় বিশ্বেস। তুনিয়া ওজন ক'রে দিলেও এর সমান তৃপ্তি নেই।

আর বাস্তবিকই আশ্চর্য্য মায়ার মনোবল ও রুচি। চা'রধারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা তার মনোত্বর্গ,—সেখানে বন্দী হোয়ে রয়েচে তার কাম বাসনা। উচ্ছল হাসি, উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য, কথার ফোয়ারা, সবই আছে ;—নেই শুধু চপল কামনার সামান্য মাত্র প্রকাশ। আশ্চর্য্য নারী! পরিচয় না পেলে প্রত্যয় হয় না শুধু যৌন-বিজ্ঞানের চোখে বিচার ক'রলে। অবৈধ মাতৃত্বের ভয় ? না, না, মিছে কথা। টের পেতুম তাহ'লে। এতোদিন সঙ্গে লেগে রইলুম আর বুঝতে পারতুম না আমি ? শুদ্ধ-প্রেমকে সংস্কারই বলুন আর যাই বলুন, প্রবৃত্তির আকর্ষণ যে এ নয় এ-সত্যি নিজে প্রত্যক্ষ না করলে আমারও প্রত্যয় হ'তো না। আমিও প'ড়েচি যুবতী নারীর বন্ধু একদিন হ'তে চায় স্বামী, হ'তে চায় সন্তানের পিতা। স্বামী আমি হ'তে চাই। কিন্তু [সন্তানের পিতা হওয়ার আশু খেয়াল জাগেনি এখনো। ঠোঁটের নেশা বেশ আছে স্বীকার ক'রচি। কিন্তু সাহস নেই ইচ্ছেমত সে শরাব পান কোরতে। মায়ার ব্যাক্তিত্ব প্রাচীর হোয়ে দাঁড়ায় মাঝখানে। হ্যাংলাপনা চ'লবে না সেখানে।

খানাপিনা থাকার চিন্তে ঘুচে গ্যাচে আমার। ঘোচাতে চাইলেও ঘোচে না একটি চিন্তা। সেটি বাপ মা ভাই বোনের। আছি তো বেশ মায়াকে নিয়ে। কিন্তু তবু অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ভেতরে ভেতরে ব'য়ে চ'লেচে আর একটি ক্ষীণ চিন্তাস্রোত। খবর তো নেয়া হয়নি আমার জন্মদাতার, গর্ভধারিণীর আর সহোদরাদের। রক্তের টান ব'লে একটি কথা আছে। সেটি তো ক'রবেই আমাকে আকর্ষণ।

চিঠির খোঁজে ধীরে ধীরে রওয়ানা হলুম স্যানিটারিয়ামের পানে। যাচ্ছি আর ভা'বচি আজ কোন নুতন তৈরী-করা কথা শুনাবো পরেশদাকে। কি কৈফিয়ৎ দেবো এ ক'দিন দেখা না করার ? যা হয় ব'লবো একটা। এতবড় তো ছাঁকা সৈয়দ

সেজে বসিনি যে প্রয়োজন হ'লে একের জায়গায় একশোটা মিথ্যে বলা আমার স্বভাবে সইবে না ? সে কথা ব'লতে পারেন সৈয়দ আকবর হোসেন। তাঁর গুণধর পুত্র আমি। গুণধর হবো না কেন ? আমার মতো অবস্থায় পড়েননি তো তিনি ? এ যুগের গুরুঠাকুরদের জ্ঞানের ভাষায় বলে, সুযোগ মানুষকে চোর বানায়।

সকালে মল চৌরাস্তা পেরিয়ে যেতেই দেখা হলো হরেকৃষ্ণ হরেরাম পরেশ-দার সঙ্গে। হাতের লাঠি শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্চেন। ঠোঁটে গুন্ গুন্ গুঞ্জনধ্বনি। দেখা হ'তেই চেঁচিয়ে বল্লেন, "আহে, যাও যাও পোষ্ট অফিসে। একখানা টেলিগ্রাম বাসী হ'য়ে গ্যালো। কোথায় যে থাকিস্! ঠিকেনাও দিয়ে যা'স্ নি।"

হন্তদন্ত হোয়ে ছুটলুম পোষ্ট অফিসে। বুকখানা তখন আমার কামারের হাফরের মত উঠানামা ক'রচে। হ্যাঁ, টেলিগ্রামই বটে।

কম্পিত হস্তে খুললুম, আর আশঙ্কাপরায়ণ মন নিয়ে প'ড়লুম, 'হ্যাপি নিউজ্। কাম্ শার্প।' নীচে—"আব্বা।"

'হ্যাপি নিউজ্—সুখবর।' ভালো কথা। কিন্তু কিসের সুখবর ? কার পক্ষে সুখবর ? আমার না আব্বার ? হায়রে পোড়া কপাল! আজ আমার পক্ষে যা সুখবর তা এই মুহূর্তে জা'নবার সাধ্যি এক আলেমুল্ গায়েব আর আমি ছাড়া সৈয়দ আকবর হোসেন,—হও না তুমি জন্মদাতা ও পালক,—তোমারও নেই।

'কাম শার্প—তাড়াতাড়ি রওয়ানা হও।' এই জায়গায় তো গোল বেধেচে বেশী। সুখবর তো এত সাত তাড়াতাড়ি কেন ? টেলিগ্রামের ভাষার মা'রপ্যাঁচ্ অনেক। কি জানি উল্টো মানে ধ'রে নেবো নাকি! যেতে হবে। হ্যাপি হোক্, আন্-হ্যাপি হোক্, যেতেই হবে।

এই হ্যাপি নিউজে আমার মত আন্-হ্যাপি আজ আর দুনিয়ায় কেউ নেই।

ছা'ড়তে হবে এ ভূস্বর্গ কৈলাস। ছা'ড়তে হবে এর গিরিদরি বন উপবন, এর পথ, এর আকাশ বাতাস যেখানে,—

"শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখ নিদ্রারত

সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।"

কৈলাসের জন্যেই কৈলাসকে এত মমতা নয়। এর জঙ্গলে পথে জড়ায়ে র'য়েচে দুটি মনের মন-জানাজানি, আর চা'রটি চরণের পদচারণ-স্মৃতি। শতকণ্ঠে আজ হায় হায় ক'রে উঠ্‌চে এর আকাশ বাতাস, এর গাছপালা তৃণলতা।

"চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি,
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন।"

সেই সঙ্গে ভেসে উঠ্‌লো মনের পর্দ্দায় আর একটি মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দের ছবি। শত শঙ্কায়ভরা পরাণ, বিচ্ছেদ-কাতরা, সজল-চক্ষু, রুক্ষকেশী, মলিন-বদনী করুণ কণ্ঠে কইচে,

"বাদশাহ্, আমার জীবনটা যেন উষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ কোরে দিও না বাদশাহ্।"

পা'রলুম না আর দাঁড়িয়ে থা'কতে। ঝিম্ ঝিম্ কোরে এলো মাথা। দুহাতে মাথাটা চেপে ধ'রে ব'সে পড়লুম পোষ্ট অফিসের সেই ঠাণ্ডা বারান্দায়। কালো হোয়ে এলো দিনের আলো। অসাড় হোয়ে এলো অনুভূতি। বহুক্ষণ আর কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরে পেলুম যখন, তখন দিনের সূর্য্য অনেকখানি পথ হেঁটেচে। চ'ল্‌তে গিয়ে দেখি দু'পায়ে বল নেই। মাতালের মত ট'ল্‌তে টল্‌তে সিংমারীর সেই কাঠের বাড়ীটায় যেতে দুঘণ্টার উপর লেগে গ্যালো। সূর্য্য তখন পশ্চিম দিকে মোড় ফিরেচে।

সা'মনেই মনমায়া দাঁড়িয়ে। অভিযোগ ক'রতে যাচ্ছিলো বোধ হয় এই অপ্রত্যাশিত দেরীর জন্যে। আমার মুখের চেহা'রা দেখে ছুটে পা'লিয়ে গ্যালো সে ভাব। উৎকণ্ঠিত মুখে ছুটে এসে ধ'রলে আমার হাত। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কী হ'য়েছে কি তোমার বাদশাহ্? অমন ক'রে ট'ল্‌ছো কেন? মুখ চোখ অমন ফ্যাকাশে হ'য়েছে ক্যানো? বলো,—বলো,—হঠাৎ এমন ধারা বদ্‌রং হ'লো ক্যানো তোমার?"

রসকষ্ শূন্য জিহ্বায়,—মনে হ'লো যেন একখণ্ড মোটা রবারের টুক্‌রো জড়ি র'য়েচে শুক্‌নো মুখের মধ্যে,—সংক্ষেপে জবাব দিলুম, "আমার হঠাৎ অসুখ ক'রে মায়া। আমায় শীগ্‌গীর্ বিছানায় শুইয়ে দাও।"

তার হাত-পা কাঁপচে। আমার হাত তার কাঁধে দিয়ে বাম হাতে মাজা ধ'রে নিয়ে গ্যালো বিছানায়। সযত্নে শুইয়ে দিয়ে, কাছে ব'সে, মুখ মুখের কাছে নীচু ক'রে এনে, জিজ্ঞেস ক'রলে, "সোনা, মাথা কি ধ'রেছে তোমার?"

ব'ললুম, "সব ধ'রেচে। মাথা বুক সব।"

উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গ্যালো তার মুখ, "বুকও ধ'রেছে? হায় কপাল! জ্বরও দেখ্‌ছি। তাইতো নিষেধ করি তোমায়, এখনো শরীর ষোল আনা ভালো হয়নি, ঠাণ্ডায় বেড়িয়ো না। কথা তো শুনবে না। যাই, ডাক্তার ডেকে আনি। রিক্সায় যাবো আর আ'সবো। আর কে আছে যে পাঠাবো।"

উঠে যেতে চাইছিলো সে। শাড়ীর আঁচল চেপে ধ'রলুম। "ব'সো আমার কাছে। যেও না।"

"না, না, সোনা, আমার দেরী হবে না। দেরী ক'রতে আমি পা'রবো না। ডাক্তার যা নিন্ তাই নেবেন।"

ধীরে ধীরে ব'ললুম, "কথা শুনো। দুনিয়ার সব ডাক্তার মিলেও আমার এই বুক-ধরা আর মাথা-ধরা সারাতে পা'রবে না।"

কাঁদ কাঁদ সুরে জিজ্ঞেস ক'রলে, "তার মানে?"

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে টেলিগ্রামটি বের কোরে তার হাতে দিলুম আর শুয়ে শুয়েই চেয়ে রইলুম তার মুখের পানে। তার হাত দু'খানা থর্‌থর কোরে কাঁপচে। চোখে মুখে বিশ্বের উৎকণ্ঠা। কতক্ষণ ধ'রে প'ড়ে চ'লে কাগজের বুকের ঐ ক'টি সীস্-পেন্সিলের কালো কালো অক্ষর। হয়তো কালো হোয়ে এলো তার চোখের সামনের আলোময় দুনিয়া। সামান্য ঐ ক'টি অক্ষর খবর যা ব'য়ে এনেচে তা'ও সাধারণ বুদ্ধিতে খারাপ নয়। কিন্তু ভালো আর মন্দ, সুখ আর দুখ, সে তো একান্ত নয়, ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়, একান্তই আপেক্ষিক যে।

টেলিগ্রামশুদ্ধ শিথিল হোয়ে এলিয়ে প'লো তার হাত বিছানার উপর।

ধীরে ধীরে টেনে নিলুম তার হাত বুকের উপর। ব'ললুম, "মায়া, আমি যাব না ঠিক্ ক'রেচি। তুমি টেলিগ্রাম ক'রে এসো, আমার শরীর ভালো নয়। এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

"যাওয়ার তাগিদ দিয়ে আরও খান কয়েক চিঠি এসেছে শুনেছি?"

"হ্যাঁ। তাতেই বা কি হ'লো? না-যাওয়ার তাগিদ দিয়ে একটিও নেই।"

"যাবে না?"

"না।" দৃপ্তকণ্ঠে ব'ললুম, আশ্চর্য্য নারীর সবই আশ্চর্য্য। নেই আর সেই ক্ষণিক পূর্ব্বের কারুণ্য-ভরা কণ্ঠস্বর। ঝড়ের পরেও হিমালয় তেমনি অটল রয়েচে। একদিন দেখেছিলাম তার প্রেম-কাতর শঙ্কা-বিহ্বল রূপ। সে ঝড় কেটে গ্যাচে। এখন হিমালয়ের মত দৃঢ় তার মূর্ত্তি, দৃঢ় তার কথা।

"ছি। বাপ মাকে ব্যথা দিবে? তুমি যাও।"

অভিমান-ভরা কণ্ঠে ব'ললুম,—রাগের মতই শুনালো বোধ হয়, "তোমার ভার হ'য়েচি আমি? আমায় ঠেলচো?"

আবার দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন। বজ্রের আঘাত সইতে পারে যে, এ ফুলের আঘাত সইতে পা'রলে না সে। হটাৎ লুটিয়ে প'ড়লে আমার প্রসারিত দুখানি পায়ের উপর। কাটা-পাঁঠার মত গড়াতে লাগলো তার মাথাটি। করুণ ক'ন্নায় ফেটে যেতে লা'গলো তার প্রেমসিক্ত কোমল বুকখানা।

কাঁদো, কাঁদো, খুব জোরে কাঁদো। তুমিও কাঁদো আমিও কাঁদি। সব চেয়ে দুর্দ্দিন আজ তোমার আমার।

কোমর পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে তুলে, ব'সে ব'সে আঙ্গুল বুলাতে লাগলুম তার রেশম-চিক্কণ সুদীর্ঘ কালো কেশরাশির ভেতর। পা ভিজে যাচ্ছে তার বুকের রক্ত-নিঙ্ড়ানো চোখের পানিতে। বাইরের রাস্তা-দিয়ে-চলা পাহাড়ী মেয়েদের গানের রেশ্ গুলো ভেসে আ'সচে কানে। সে গানে কান্না আরও বেশী জোরে টেনে আ'নচে মনে। আনন্দ-মুখর এই ধরায় নির্জ্জন গৃহকোণে দু'টি বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেবে এসেচে সারা বিশ্বের নিরানন্দ। এ খোঁজ নেবার কেউ নেই। সান্ত্বনার ভাষা নেই। বহু বিপদে সমব্যথী মিলে। এ রকম বিপদে কারো সহানুভূতি মিলে না। শুনলে হা'সবে সবাই।

অনেকক্ষণ পরে তুলে ধ'রলুম সেই অশ্রু-নির্ঝরিণী। কান্নায়-ভেজা কণ্ঠস্বর নিয়ে ব'ললে সে, "আমায় তুমি ভুল বুঝলে, সোনা? এতো দিনও কি আমায় চেনো নি? আমি জানি বাপ মায়ের অভিসম্পাত নিয়ে কারো কোনও দিন শেষ পরিণাম ভালো হয়নি। তোমার অকল্যাণ হবে এ আমি সইতে পা'রবো না। আমার যা হয় হোক।"

"তুমি ঠিক্ জানো মায়া, বাপ-মার অভিসম্পাত নিয়ে কারুর কোনোদিন শেষফল ভালো হয় না?"

"জানি আমি। আর এও জানি এমনটি একদিন ঘ'টবে। তাইতো কিছুদিন ধ'রে আমার মনের কোণে সদা সর্ব্বদা একটি আশঙ্কা আমাকে বিঁধতো। মনে আমার সুখ ছিলো না। তাইতো তোমাকেও কষ্ট দিতাম।"

"তাহ'লে এখন আমার কর্ত্তব্য?"

"যেতে হবে।"

"আর যদি তাঁরা আ'সতে মানা করেন? যদি বলেন বিলেত যাও? যদি বলেন বিয়ে করো?"

"শুন্‌তে হবে বাপ-মার কথা।"

"তোমার তবে কি হবে?"

"আমার?" একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললে, "শুধু আমাকে মাঝে মাঝে মনে ক'রো। মনে ক'রো মায়া রূপান্তরিত হোয়েছে সুখ্ বাহাদুরে। আমিও ভা'ববো এখন থেকে আমি বাপ-মা'র মেয়ে নই,—ছেলে।"

ভারী মনে নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললুম, "তুমি পাষাণ দিয়ে তৈরী মায়া।"

ব'ললে সে, "পাষাণের দেশেরই মেয়ে আমি, ভুলে যাচ্ছো? তুমি আমার সতীন নিয়ে ঘর ক'রবে, সুখী হবে। ছেলেপুলে নিয়ে আবার আ'সবে একদিন তোমার মায়ার দেশে হাওয়া খেতে। আমিও বুড়ী হোয়ে আ'সবো। সেদিন খবর দিও আমাকে, তোমার ছেলে মেয়ের আয়া হোয়ে কাটাবো দিন কতক। তাদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে মাতৃ-তৃষ্ণা মেটাবো।"

আর বুকে সহ্য হয় না। সহ্য হয় না ঐ আপাতদৃষ্ট শান্ত মানবীর রক্ত-ঝরা কথাগুলো। ব'ললুম উত্তেজিত ভাবে, "না মায়া, তোমার কোনও সতীনেরই

দরকার নেই। আমি চাইনে সে ছেলে মেয়ে, যাদের মা না হোয়ে আরা হবে তুমি। তোমার পেটেরই সন্তান চাই আমি। এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হোক্। আমি মন স্থির কোরেচি।"

"উত্তেজিত হ'য়ো না সোনা। বাদশাহ্, তুমি বি-এ পাশ করেছো। এতটা উতলা হওয়া তোমার সাজে না। আমিও মন স্থির ক'রেছি। আশরাফ ভাই-জানের আর তোমার অবস্থা এক নয়।"

"তুমি কি বলতে চাও আমার নিজের সুখ সুবিধে ব'লে কোনও কথা নেই?"

"হ্যাঁ আছে। আছে ব'লেই তো বাপ মা সে চিন্তা করেন। এখনই আমরা এতো নিরাশ হচ্ছি কেন? আগে তোমার মত ক'রে আমিও ভাবতাম। ভাবতাম যাকে এক দণ্ড দেখতে না পেলে দুনিয়া আঁধার হোয়ে যায়, তাকে না পেলে বুক ফেটে ম'রে যাবো।"

মাঝখানেই জিজ্ঞেস ক'রলুন, "আর এখন?"

"এখন তোমাকে তো পেয়ে গেছি। সেবা করার ভাগ্যও আমার দিন কয়েক হ'য়েছে। নাই বা পেলাম তোমার শরীরটা চোখের সামনে। যদি পাই ভাগ্যগুণে, বাপ মা'র আশীর্ব্বাদ নিয়ে, তাকেও পরম আশীষ রূপেই গ্রহণ ক'রবো। চিরকাল বেঁচে থা'কতে তো আসিনি। ভাইও তো ম'রে গ্যালো অল্প বয়সে। একদিন এই কামনার দেহটাও পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে।"

একটু ভেবে আবার ব'ললে, "তা হোক্। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার খবর কিন্তু দিতে ভুলো না।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হতভম্বের মত চুপ কোরে চেয়ে রইলুম তার দিকে।

——::——

বারো

"ম্লান হোয়ে এলো কণ্ঠে মন্দার মালিকা
হে হিমাদ্রি ... ...
... ... পূণ্য বল হ'লো ক্ষীণ
আজি মোর স্বর্গ হোতে বিদায়ের দিন।"

মনের মধ্যে আবেগের নিরাকার ছন্দ কথাহীন সুরের মত ঘুরে বেড়ায়। ভাষা নেই। তাই রবি বাবুর কাছ থেকে ধার কোরে নিজের মনমতো দু'একটি কথা জুড়ে সকালেই চিন্তা কোরতে ব'সেচি।

তাহ'লে ছা'ড়তে হবেই এ ভূস্বর্গ কৈলাস। আর ছা'ড়তে হবে মনমায়া গৌরীকে। আবার কবে ফিরবো? কবে ফিরে পাবো গৌরীকে? যদি ফেরা না হয়? পাগল হোয়ে যাব। এমনিতেই পাগল হওয়ার বাকী কোথায়?

একজন তো নারী-বুদ্ধ নির্ব্বিকার পরমহংসী হোয়ে গ্যালো। কী পেলো মনে সেই জানে। যার জন্যে এমনটা হিমালয় হোয়ে গ্যালো তার উত্তপ্ত ভালো-বাসার আবেগ। অমনি হোতে পার'তুম আমিও! জ্বালা চুকে যেতো।

কিন্তু আমার যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কান্না আ'সচে। কাঁদি যদি তো সে, যার জন্যে কাঁদি, ছি ছাক্কার কোরে ধমক দেবে, "ছিঃ! পুরুষ মানুষ হোয়ে মেয়ে মানুষের মত কান্না!" বেদনা জানিয়েও তো না মিল্‌লো আশ্রয়, না মিল্‌লো প্রশ্রয়। উপরন্তু পেলুম এক গাদা ধর্ম্মোপদেশ, যেন গুরু ঠাকরুণ।

যাবার পূর্ব্বে দেখি, যাই একবার আশরাফ ভাইজানের কাছে, আর তাঁর পাহাড়ী বিবির কাছে। অনেক দিনই তো হ'লো আর দেখা করিনি তাঁদের সঙ্গে। আমার মনে স্বপন-জাল বুনবার চাক্ষুষ-আদর্শের চটক্ ধরিয়ে দিয়ে যে স্বামী স্ত্রী পাহাড়ের কোলে—মায়ের কোলে ছা'-এর মতো—লুকিয়ে আছেন দেখি তাঁরা কি বলেন আমার এ বিপদে।

একাই যাবো, না মায়াকেও সঙ্গে ধ'রে নিয়ে যাবো? নাঃ। দরকার নেই মায়াকে সঙ্গে নিয়ে। হয়তো সে জ্যাঠামি-তর্ক জুড়ে দেবে তাঁদের প্রতি কথায় তার নবলব্ধ অনুভূতির অনুজ্ঞা পেয়ে।

বাড়ীর মধ্যে এক পলক নজর ফেলে দেখি উনুনে কী যেন রান্না চাপানো হ'য়েচে। আর ধারে ব'সে আছে একজন উদাসিনী বৈরাগিনীর বিষাদ মূর্ত্তি গালে হাত দিয়ে চুপ্‌চাপ শূন্য দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে। চাপানো রান্নার বস্তু হ'লো কি গোল্লায় গ্যালো, বুঝা গ্যালো সে দিকে খেয়াল নেই তার। চামড়ায়-ঢাকা বুকখানার ভেতরে কি বইচে এখন সেই জানে।

অভিমান এমন এক বস্তু যে অবিশ্বাস্য বিষয়কেও অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে বিশ্বাস্য কোরে তোলে। আমার চাপা-অভিমানও একটি মতলব এঁটে এই সুযোগে মায়াকে কিছু না ব'লে বেড়িয়ে পড়ার জন্যে তাগিদ্ দিলে। আল্‌গোছে বেড়িয়ে প'ড়ে ধর'লুম লেবং স্পারের দিকের রাস্তা। কতক্ষণ পরে পৌঁছলুম দুধে আল্‌তায় মেশানো নধরকান্তি এক ফোঁটা শিশুকে আর তার বাপ মাকে দেখবার জন্যে। মনটা আজ ঐ শিশুটির জন্যেও বড্ড উতলা হ'য়েচে যেন। কচি কচি ছোট্ট দু'বাহু বাড়িয়ে আধো আধো বুলিতে ব'লচে যেন, 'মায়া-বেটি যা ব'লে বলুক, তুমি কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেও না চাচা।'

পৌঁছে গেলুম। বাইরের ঘরের শেকল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি আর দুর্ব্বল মনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রচি। হাত নিজের কাজ ক'রে গ্যালো। দিলে নাড়া শেকলটায়।

দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রলেন ভাবী, "আসুন ভাই, ভেতরে এসে বসুন। আপনার ভাই গ্যাছেন বাজারে। এখুনি এসে প'ড়বেন।"

খাটের উপর কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলায় মেতে ছিলো খোকন। সব ভুলে দৌড়ে এসে বাহু বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে চাইলে কোলে। ধ'রে ফেললুম খাটের কাছে গিয়ে। আঁকড়ে ধ'রলে সে মাখনের মত পেলব দুখানি ব্যাগ্র ও দুর্ব্বল হাত দিয়ে আমার গলা। বুকের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলে একেবারে। গালে গাল রেখে বিশ্বের মিষ্টি জড়িয়ে ডা'কলে, 'তাতা মিয়া।'

আদর ক'রে জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠ জড়িয়ে গ্যালো আমার, 'হ্যাঁ বাবু, চাচা মিয়া। খোকন্, সোনার মানিক, তোমাদেক ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি আমি।'

শেষ শব্দটির প্রতিধ্বনি ক'রে ব'ললে সে, 'আমি?'

ব'ললুম, 'না বাবু, তুমি নও। বাপ মার কোল জুড়ে থাকো তুমি।'

আবার বল্লে সে, "তুমি ?"

ব'ললুম কষ্ট হাসি হেসে, "হ্যাঁ বাবু, আমিও যাচ্ছি এবার বাপ মা কোলে।"

আমায় একটি চেয়ার টেনে ব'সতে দিয়ে আমাদের দুই বড় খোকা আর ছোট খোকার গল্প স্মিত হাস্যে কাছে দাঁড়িয়ে উপভোগ ক'রছিলেন ভাবী। এবার ব'ললেন তিনি, "কি ব্যাপার ? সত্যি নয় তো ?"

"কি সত্যি নয় ভাবী ?"

"এই যেমন খোকাকে যে সংবাদটি দিচ্ছিলেন বাড়ী যাওয়ার ?"

"হ্যাঁ, সত্যি ভাবী।"

"কেন, হটাৎ ?"

"যখন ঘটে তখন হটাৎ-ই সব ঘ'টে যায় ভাবী। আপনাদের চা'র চক্ষু মিলন কি দার্শনিকের মত ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে ঘটেছিলো ভাবী ?"

"আর নিজেদের কথা বাদ দিলেন ক্যানো ? নিজের স্বপন বুঝি পরের চোখে দেখছেন ?"

"তা ধ'রে নিন্ না একটা। আমাদের মিলন তো চা'র চোখে হয়নি ভাবী, হ'য়েচে তিন চোখে।"

"মানে ?"

"মানে, তার একটিতে আর আমার দুটি।"

"অর্থাৎ মায়া শুধু এক চোখেই দেখেচে আপনাকে ? অর্থাৎ আধখানা ভালোবেসেচে সে ?"

ব'ললুম, "বোধহয় তারও অর্দ্ধেক।"

"কী, ব্যাপার কি খুলে বলুন তো ? মুখখানাও আজ আপনার বেশ ভার ভার। কথাগুলোও হেঁয়ালী হেঁয়ালী। আর যে একদণ্ড আপনাকে দেখতে না পেলে বুক ফেটে মরে, কোথাও একা ছেড়ে দেয় না, সে মায়া রাক্ষুসীই বা আজ কোথায় ?"

"রাক্ষুসেরও বাড়া ভাবী। আপনি বসুন ঐ চেয়ারটায়। ওর মনে আমার মতো দয়ামায়া নেই। এতদিন আমায় নিয়ে খেলছিলো সে। পুরুষ-নাচানো মেয়ে মানুষদের একটি সখ।"

হেসে ফেললেন তিনি। "তাহ'লে মেয়ে মানুষের মন মেয়ে মানুষের চেয়েও বেশী জানেন বুঝি? আগাগোড়া শুনিতো ব্যাপারটি?"

ধীরে ধীরে অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলুম যে এ সময় মায়া যদি একটু আশ্বাস দিতো তাহ'লে—খুলনায় আর যেতুম না আমি।

ব'ললেন হেসে, "ও:। এই কথা। এতেই ধ'রে নিলেন মায়া প্রাণ দিয়ে আপনাকে ভালোবাসে না? আমি জানি এ সংবাদে এই মূহুর্ত্তে ওর বুকখানায় কি প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে যাচ্চে। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ব'লেই আজ অমন কথা সে ব'লতে পেরেছে। ও নিজের জান দেবে কিন্তু আপনার অকল্যাণ সে সইতে পা'রবে না।"

কথা শুনে ধুন্ ধ'রে ব'সে রইলুম। ভাবী গেলেন খাবার আনতে। এমন সময় বাড়ীতে ফিরে এলেন আশরাফ ভাইজান।

আশরাফ-গিন্নী হাতের বাজার নিয়ে ব'ল্লেন, "মায়ার মায়া এসেছেন যে। ও ঘরে ব'সে। যাও তুমি, আমি খাবার আনি।"

"তো মায়ার গলা তো শুনতে পাচ্ছি না। এখানেও কি দুজনে গল্পে মশগুল? বাব্বারে বাবা। এ্যাতো গল্পও জানে ওরা। দিন রাত এক সঙ্গে থেকে গল্প ক'রে পেট ভরে না ওদের?"

"নাগো না। অভিমান কোরে মায়াকে আনা হয়নি। শুধু এসেচেন তার তিনি, একলাই।"

"ও:, তাই কও। নইলে এতক্ষণ সে হতচ্ছাড়ি কথার জ্বালায় অস্থির কোরে দিতো। তা হ'য়েছে কি? অভিমানটা কিসের? তা অমন একটু আধটু অভিমান সবারই জীবনে হোয়েই থাকে। অভিমান না থা'কলে মহব্বত তো মিষ্টি হয় না।"

"হ'য়েচে, হ'য়েচে; একা একাই বক্তৃতা। এবার যাও সেখানে। ভদ্র-লোক একাই ব'সে আছেন।

ধমক্ খেয়ে এলেন তিনি ঘরের মধ্যে। খোকাকে আমার কোলে গল্পরত দেখেই হেসে ব'ল্লেন, "এই তো আমাদের দার্শনিক পণ্ডিত ওর চাচার কোলে। তাই তো বলি খোকার গলা পাচ্ছি না, বোধহয় ঘুমিয়ে প'ড়েছে। অনেক ক'দিন

পর সোহাগ-চাচাকে পেয়েছে কিনা। এখন বাপ-মার কথাও ভুল হোয়ে গ্যাছে তা ভায়া, খবর সব ভালো তো ?

"খুব ভালো ভাইজান। হ্যাপি নিউজ। দেশে চল্লুম।"

"কবে ? কি ব্যাপার ?"

"আগামী কাল। ব্যাপার টেলিগ্রাম।"

"তা না হয় হ'লো। কিন্তু বলি, প্রাণে-মরা প্রাণীটিকে সঙ্গে নিয়ে তো

'না, তিনি যাবেন না। নিয়ে তো যেতেই চাই।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। বুদ্ধির মধ্যে যেন সব গোলমাল হোয়ে যাচ্ছে। কি রকম কথা হ'লো ? নিয়ে যেতে চান সে যেতে চায় না ? আমরা দুজন যা জানি তাতে তো মনে হচ্ছিলো শুধু খুলনায় কেন, বোধহয় মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যেতে চাইলেও না ব'লবার আর ওর কোনও সত্বাই নাই।"

"খুলনায় নয়। ওকে নিয়ে যেতুম ক'লকাতায়। নয় তো নিজেই থেকে যেতুম দার্জ্জিলিং।"

খাবার নিয়ে ভাবী এলেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন ভাইজান, "কি বলে সে ?"

"বলে বাপ মার মনে দুঃখ দেয়া হবে না। আমার দুঃখের কথা সে চিন্তা করে না। বাপ মা দুদিন দুঃখ ক'রবেন, আবার ভুলেও যাবেন। সে কথা ও বুঝতে চায় না।"

জবাব দিলেন ভাবী। ব'ললেন, "ও তো ঠিকই বুঝেছে। 'যদি থাকে মনে এড়াতে পারে না ত্রিভুবনে।' আপনি গিয়ে দেখে শুনে আবার আ'সবেন।"

সায় দিলেন ভাইজান, "হ্যাঁ। ঠিকই তো। তাই করো ভাই, তাই করো। দিন কতক থেকে আবার এসো। পুরুষ মানুষ। তোমাকে আটকায় কে ?"

এর উপর আর কথা চলে না। খানাপিনা ক'রে বিদেয় আদায় নিয়ে খোকাকে আর একবার আদর ক'রে বেড়িয়ে এলুম।

——::——

তেরো

সিংমারীর সদর রাস্তায় কয়েক কদম এসেচি। রাস্তায় তো চ'লচি নে। যেন রাস্তা ঘাড়ে কোরে ব'য়ে নিয়ে যাচ্চি। আর সে রাস্তার ভারে ভারী হ'য়ে গ্যাচে আমার ছ'পা; কাঁধ গ্যাচে নুয়ে, আর নজর নিজের পায়ের দিকে ছাড়া উঠাবার যো নেই। মনটাও চিন্তার ভারে ভারী, ক্লান্ত, অবসন্ন হোয়ে আ'সচে। যে কাঠের বাড়ীটার আকর্ষণ ছিলো আমার নিকট এতোই প্রবল যে দিনে রাতে অন্ততঃ একবার না এলে খাওয়ার রুচিতে ধ'রে যেতো অরুচি, ঘুম চোখ ছেড়ে পালিয়ে যেতো নিঝঝুম হোয়ে, মন দেহখানা ছেড়ে উড়ে যেতো অদেহী হাল্কা ডানায় ভর কোরে, আর প'ড়ে থা'কতো দিনরাত সেই কাঠের বাড়ীটাতে, অবশেষে স্থায়ী বাসা বাঁ'ধলে সেখানে, আজ সেই কাঠের বাড়ীটার চিন্তাও হোয়ে উঠেছে একটি তিক্ত ছশ্চিন্তা। তাই পা আর চ'লে না। যার জন্মে কাঠের বাড়ীটা ছিলো অমৃতের চেয়ে মধুর সেই-ই যে একটি কথায় সব তেতো ক'রে দিলে।

'বাপ মা'র অবাধ্য হোয়ো না' কথাটার মানে কি? মানে কি এই নয় যে তাঁরা যদি আমাদের বিয়েতে গররাজী হোন তো তারও ইচ্ছে নেই তেমন বিয়েতে? ভালোবাসা নাকি অন্ধ। আমি তো অন্ধই হোয়েচি। আর এই কি তার ভালোবাসা? না, না, এ নিছক ছদিনের খেলা তার! এক পুতুল যাবে আর এক পুতুল আ'সবে। খেলোয়াড়ের কি ক্ষতি তাতে? আর এই যে কথার আর কান্নার অভিনয়? ওটা নেহায়েতই ছলাকলা।

হ্যাঁ, ভালোবাসা দেখেচি রহীমের স্ত্রী পরী বানুর। রূপ কথার পরীর মতোই রূপ তার। শ্যামাঙ্গী, তেল কুচ্‌কুচে গরীব রহীম প'ড়তে গ্যালো কানপুরে। অবস্থাপন্ন ঘরে জায়গীর পেলে তার মনজয়ী বিনয়-নম্র শিষ্টাচারে। পড়াশুনো দেখিয়ে দিতে হ'তো অনূঢ়া পরীবানুকে। বেশ কয়েক বছর বাড়ীর কথা ভুলে রইলো রহীম। কিশোরী পরীবানু কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে পা দিলে যৌবনে। তার বাপমায়ের তরফ থেকে খোঁজ খবর নেয়া হ'লো রহীমের সাংসারিক অবস্থার। পেছিয়ে গেলেন তারা। কিন্তু পেছুলে না পরীবানু। দানাপানি বন্ধ ক'রে গলায়

দড়ি দেয়ার ভয় দেখিয়ে, বহু নির্য্যাতন সহ্য ক'রে অবশেষে স্বামী স্ত্রীরূপে পৌঁ
গ্যালো তারা সুদূর খুলনায়। বেশ আছে তারা। বিরাগী বাপমা'র জন্যে একদি
ঢেঁকুরও তোলে না পরীবানু। এখন বেশ বাংলা ব'লে পুরো বাঙ্গালিনী সেজেচে
বলে রহীম মাঝে মাঝে, "যাবে একবার বাপমা'র বাড়ী বেড়াতে? নাই-ইবা আসু
তারা। চলো না একবার, বেড়িয়ে আনি তোমাকে?" পরীবানু ঠোঁট মে
হাসে, সংসারের কাজ কাম কোর্‌তে কোর্‌তে জবাব দেয়, "ওরে সর্ব্বনাশ! এখ
যাওয়া হোতে পারে কি কোরে? সংসারে দু'টো ধান, পাট, কলাই, তিসি, স'র
উঠ্‌বে। ওগুলো সা'মলাবে কে? খোকার সা'মনে পরীক্ষা, খুকীর আমপা
পড়া। যাওয়া ব'ললেই যাওয়া? ঝামেলা মিটুক আগে। তখন না হয় একদি
সকলে মিলে যাওয়া যাবে। বরং আচ্ছা ক'রে একটা চিঠি লিখে দাও, ওঁরা এ
বেড়িয়ে যান।"

ঝামেলারই সংসার। এ সংসারের ঝামেলাও মেটে না, পরীবানুরও যাওয়া
হয় না। যাওয়া কোনোদিন হবেও না হয় তো। একদিন যাবে পরীবানু, এমন
যাওয়াই যাবে সংসারের সকল ঝামেলা চুকে বুকে, যে দিন রহীম চোখের পানি
ফেলবে আর ব'লবে, "হ্যাঁ, ভালোবেসেছিলো বটে পরীবানু। হিন্দি কবি তুলসী
দাসের কথা সার্থক হোয়েচে তার জীবনে,

"পীরিত্‌ করো তো এ্যায়্‌ছা করো জিস্‌ কেলাকি পাত্‌
টুট্‌ টুট্‌ ফাট্‌ হো যায়্‌ই তব্‌ না ছোড়ো সাথ্‌।"

আর এই মায়া। আমার প্রাণের চেয়ে মায়া তোমার বেশী হ'লো আমারই
বাপমা'র প্রতি! আসল কথা, তোমার বুড়ো বাপমা'কে ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবন
তোমার প্রাণে প্রেমের উদ্দাম উন্মাদনা আন'তে পারে না। কথার ইন্দ্রজালে
বৃথাই আমায় ভুলোতে চাও, মায়া। বাপমা ভাইবোন আত্ম'স্বজনের স্নেহ প্রীতির
চাইতেও প্রেমের আকর্ষণ শতগুণে অধিক। প্রেমই তো সংসারের মাধ্যাকর্ষণ
সে মানে না বাপমা ভাইবোনকে, চেনে না আপনাকে। পরকে করে সে আপন
তাই তো স্বাধীন ইচ্ছে তার বিলীন হোয়ে যায় প্রেমাস্পদের মধ্যে। আর কিনা
আমার বুকখানার দিকে না চেয়ে জাতকের বুলি আওড়াতে চাও তুমি? এতোদিনে

তোমায় আমি চিনেচি মায়া। তোমার ভালোবাসা একটি মোহ মাত্র। তবে জেনে রেখো মায়া, ...

"আচ্ছা মানুষ তো। খাবার নিয়ে এসে দেখি ঘরে নাই। নাই তো নাই, কোথাও নাই। দৌড় মেরে বাজারে গেলাম, হয় তো বাড়ীর জন্যে কিছু কিন্‌তে গ্যাছে, তন্ন তন্ন ক'রে খুজ্‌লাম, নাই সেখানে। মল চৌরাস্তায় যেতে পারে, নাই সেখানে। অভ্যাসবশত: পার্কেও যেতে পারে, নাই সেখানে। হটাৎ মনে হ'লো দিদির বাড়ী যায়নি তো? কি পেরেশানটাই না ক'রে নিলে আজ যাবার দিনে। ভালোই মানুষ যা হোক্। ব'লে তো আ'সতে হয়?"

চিন্তার দরিয়ার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিলুম যখন পায়ের দিকে নজর ক'রে, এমন সময় অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে চেয়েই স্তব্ধ হোয়ে রইলুম। না সরে পা, না সরে জিভ্। তালু জিভ্ আ'ট্‌কে গ্যাচে। পথ চ'লতে চ'লতে হঠাৎ দুপুর রাতে ভূত দেখার মত অবস্থা আমার। সামনে মায়া; বিস্ফারিত চোখে বিশ্বের উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়; চোখ মুখ ব'সে যাওয়া, রুক্ষ চুলের রাশি অযত্নে পালিত সংসার ঘরের সন্তানদের মতো প'ড়ে র'য়েচে এখানে সেখানে। দেখে মমতা হ'তে যাচ্ছিলো। সজোরে ঝেড়ে ফেললুম মন থেকে। এবং সজোরে ধাক্কা দিয়েই জবাব দিলুম। সে জবাবে রসের নাম গন্ধ ছিলো না।

'কী দরকার ছিলো হয়রান পেরেশান হওয়ার? আমি তো তোমাকে হ'তে বলিনি তা?" ব'লে মুখ অন্য দিক ফিরিয়ে নিলুম।

এ রূঢ় আঘাতের কিচ্ছু জবাব দিলে না সে। জবাব দিলে তার চোখ। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই সদর রাস্তার উপরেই আমার মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি ফেলে পাষা-নের মতো অচল হোয়ে গ্যাচে মায়া। দুচোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে প'ড়চে অশ্রু-নদী; গাল বেয়ে ঢুক্‌চে কম্পিত দুই ঠোঁটের কোণ দিয়ে মুখে; অতিরিক্তটা ছুটেছে গলার দিকে বুকের দিকে, যেখানে এ নদীর আদি উৎপত্তিস্থল। সাগরের পানি আকাশ পাহাড় ঘুরে পুনরায় সাগরেই যায়।

সাধু সন্ন্যেসীরা নির্ব্বিকার চিত্তে মোহমুদগার ঝাড়েন, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র? সংসার হয়মতিব বিচিত্র।'

বিস্বাদ লা'গচে? আমি আজ তেতো ব'লে কি আমার হাতের রান্নাটাও তে হোয়ে গ্যালো? না হয় মনে করো এগুলো জয়নাব জাহানারা কেউ রেঁধেছে তাহ'লে আর খারাপ লা'গবে না। তবু তুমি আজকের মতো পেট পুরে এব খাও।"

খাওয়া তো একদফা আমার ভাবীর হাতে হ'য়েই গেছলো। তবু মায়া কথাগুলো হৃদয়ে বিঁধে একটু করুণা টেনে নিয়ে এলো। জয়নাব জাঁহানারা আমা বোনেরা। গল্প শুনেছিলো মায়া তাদের। তাই আজ বোনদের কথাই মনে করিা দিয়ে মৃদু খোঁচা দিতে চাইছিলো সে। ব'ললুম, "আজ যাবার দিনে ভাবী ভাই জান না খাইয়ে ছেড়ে দেন নি এতো তুমি বুঝতে পা'রছো মায়া। আবার খে বসা শুধু তোমার জন্যে, খাবার জন্যে নয়।"

একটি নিশ্বাস ফেলে ব'ললে সে, "আমার কপাল। মানুষের আশা করা কোনও দাম নাই।"

ব'ললুম, "কেন?"

মায়া ব'ললে, 'নইলে কাল রা'ত থেকেই তো আশা ক'রেছিলাম আ মনের মতো ক'রে খাওয়াবো। যদি আর না পারি।"

ব'ললুম, "পা'রবে না সে তো তোমার ইচ্ছে। এ রকম আদর কো কুটুমের বাড়ী গেলেও কুটুমে খাওয়ায়। ভদ্রতা, লোকলজ্জা ও চক্ষুলজ্জা তেমনটি খাওয়াতে বাধ্য করে। মমতার প্রয়োজন হয় না।"

উত্তাপের সঙ্গে ব'ললে সে, "তোমার সঙ্গে আজ আমি ভদ্রতা ক'রছিলাম?"

জবাব দিলুম, "সেই সঙ্গে সাধারণ-জ্ঞানযুক্ত চক্ষুলজ্জা!"

ব'ললে সে, "মানে, এতদিন কুটুম হিসেবে রইলে এখানে। আজ যাবার দিনে একটু যত্ন আত্তির সঙ্গে বিদেয় না ক'রলে কেমন দেখায়, এই তো?"

ব'ললুম, "বোধ হয় তাই।"

কিছুক্ষণ থ'মেরে তাকিয়ে রইলে। বোধ হয় তার অনুভূতিও থ'মেরে অসাড় হোয়ে গেছলো এই ধাক্কায়। তারপর আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে এব ফেলে—মনে হয় নিশ্বাস নিতেও পা'রছিলো না এতক্ষণ—

ব'ললে, "কথাটার একটা ফায়ছালা হোয়েই যা'ক। কা'ল থেকেই আমার সঙ্গে আছাড়্ পাছাড়্ ক'রছো। কী অন্যায় তোমায় আমি ব'লেচি বলো তো? পা'রবে আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে তোমার পিতামাতার বাড়ীতে তুলতে? শুনেচি তোমার পিতা ভয়ানক রাশভারী লোক। চ'লো, আমি প্রস্তুত।"

ব'ললুম, "না, তোমায় নিয়ে যাবো ক'লকাতায়।"

জিজ্ঞেস ক'রলে সে, "তারপর?"

ব'ললুম, "তারপর আর কি? আর দশ জনে যেমন কোরে ঘর সংসার পাতে আমরাও তাই পা'তবো।"

ব'ললে সে, "আর দশ জনের তুলনা দিও না। সকলে সমান নয়। অপরে যা পারে তুমি তা পারো না। আমি যা পারি তুমি তাও পারো না। মেয়ে মানুষ, ছেলে মানুষের চেয়েও তোমার মন দুর্ব্বল। আমি জানি তোমার বাপমা'র কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারো না। আমায় নিয়ে যাবে ক'লকাতায়। দিন কয়েক রা'খবে কোনও বন্ধুর বাসায়। যখন বিরক্ত হবেন তাঁরা অন্য বন্ধুর বাড়ী খুঁজবে। কেউ দেবে বাহাবা, কেউ বা টিট্‌কিরি। ক'লকাতায় বাসা খুঁজলেই এক দিনে এক মাসে মিলবেনা বাসা। হাতের ঐ ক'টি টাকা ফুরিয়ে যাবে ইতি মধ্যে। ফিরবে চা'কুরীর সন্ধানে। হ'তে পা'র্‌তে হাকিম ডেপুটি পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের আনুকুল্যে। হবে কেরাণী পঞ্চাশ টাকার। আমাকে ভালো খাওয়ানো পরানোর তাগিদে ছুট্‌বে সকাল সন্ধ্যায় প্রাইভেট টিউশনি কো'রতে, দশটা পাঁচটা অফিস ক'রবার পর। তোমার কেট্‌স্ জুতোর ক্ষ'য়ে-যাওয়া রবারের গোড়ালীতে আর তার কাপড়ের গায়ে-মাথায় প'ড়বে চামড়ার তালি। তোমার মলিন শতছিন্ন জামা বিচিত্র হোয়ে উঠবে রং বেরং কাপড়ের শত তালিতে। সোনার বরণ কচি মুখ যাবে আম্‌সির মত শুকিয়ে। খুলনা আর ক'লকাতা খুব দূর নয়। সব খবরই যাবে বাপ মা ও আত্মীয় স্বজনের কানে। তাঁরা ছি ছাক্কার ক'রবেন আর ফেলবেন দীর্ঘ নিশ্বাস, যে সামান্য একজন জংলী পাহাড়ী মেয়েকে নিয়ে তাঁদের আদরের ও আশা আকঙ্খার একমাত্র দুলালের জীবনটি মাটি হোয়ে গ্যালো। সে দীর্ঘ নিশ্বাসে তোমার সংসার যাবে পুড়ে। এই তো আগামী দিনের উজ্জ্বল চিত্র। আমার বাস্তব জীবন নিয়ে উপন্যাস গ'ড়ে উঠ্‌বে। আমি জানি আমার তুমি

ভালোবা'সবে, দুঃখ দিতে চাইবে না। কিন্তু তোমার এ চিত্র মনে হ'তেই আ
গা শিউরে উঠে। তোমার ও রকম অবস্থা দেখ্লে, হয় বিষ খাবো, নয়
গলায় দড়ি দেবো।"

ব'লনুম, "কেন? ঐ তো আশরাফ ভাইজান র'য়েচেন?"

ব'ললে সে, "তাই তো ব'লছিলাম আশরাফ ভাইজান আর তোমার অ
এক নয়। তাঁর পিতা আর তোমার পিতার সংস্কারও এক নয়। তাঁর পি
নিজেও একবার বিয়ে ক'রেছিলেন এই পাহাড়েরই এক মেয়েকে সে তো তুমি নি
কানেই শুনেছো। সব দিক একবার ভেবে দেখো দিকিন্।"

এক মূহুর্ত্ত চুপ কোরে থেকে আবার সে ব'ল্লে, "আর এও ভেবে দেখে
ভাইজান যখন বিয়ে করেন তখন তিনি ছিলেন স্বাধীন।"

স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখতে গেলে কথাটা তো মিথ্যে মনে হয় না।
হোক্, তবু মনের একটা দাবী তো আছে? যুক্তির কথা মান্তে গেলে মন হু
কোরে হুঙ্কার দিয়ে বিদ্রোহী হোয়ে ওঠে। দিনে দিনে পলে পলে ভেবে চিন্তে
ভালোবাসিনি। ভালো লেগেচে তাই ভালোবেসেচি। ভালোবেসে'চি তো নিজেকে
বিলিয়ে দিয়েচি। এখন আর যুক্তি বুদ্ধির কথা কি? আবেগ আর বিবেক এ
সঙ্গে হাত ধরাধরি চলে না। এক জন চলে ঘোড়ায়ে, আর এক জন চলে খোঁড়ায়ে
খোঁড়া বিবেককে হাত ধ'রে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই সে যাবে। সে এ
ভাঁড়, মোসাহেব; সকলেরই কাজে জি হুজুর ব'লে সায় দিয়ে থাকে। চোরকে
বলে তুমি ঠিকই ক'রেচো। সাধুকে বলে সৎ হওয়াই তোমার ঠিক কাজ। এ
ওর স্বভাব। কারুকে সে নিরাশ করে না। তাই তো দেখি নাস্তিক, আস্তিক
আশাবাদী, নিরাশাবাদী যে যার বিবেককে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে দিন গুজরা
ক'রচে।

আমার দিকটাও ভেবে দেখবার আছে। 'আমি' রূপ পরম পুরুষটি
মিথ্যে নই? এত বড় নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত পরমহংস সাধু দরবেশ হই নি যে নিজে
সুখ সুবিধার কথাটা চিন্তে ক'রতে হবে না। পিতামাতা স্নেহ-প্রবণ যদি হোন
স্বার্থপর না হোন্, তাহ'লে তাঁদেরও উচিত সন্তানের সুখকেই সুখ ব'লে মে
নেয়া। তাই তো বললুম মায়াকে, "মায়া, যত ক'রেই বুঝাও না কেন, একা

কথা অতি সত্যি যে তুমি আমার জীবনে না থা'কলে এ জীবন রা'খবার উপযুক্ত নয়। নিরানন্দ নিয়ে কত দিন বেঁচে থা'কবো? আর সে বেঁচে থাকায় লাভ কি? খুব দূরে এসে প'ড়েছি, আর ফেরবার উপায় নেই।"

ব'ললে মায়া, "বেশ্‌ তো। আমি রইলুম তোমার জীবন জুড়ে। তুমি ফিরে এসো। তোমার মায়া মিথ্যা ব'লতে আজও জানে না। বিশ্বাস কর্লো, তোমার মায়া চিরদিন তোমারই। যখনই আ'সবে, দেখবে তোমার মায়া তোমারই আছে। এ মনোবলের পরিচয় এতদিনে এত কাছে থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছো।"

আমার চোখ দুটো আবেগের উত্তেজনায় জ্ব'লে উঠ্‌লো। ভেতর থেকে একটি প্রেরণা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের মত আলোড়নে আলোড়িত ক'রে তু'ললে আমায়। ধ'রলুম মায়াকে জাপটিয়ে। উত্তাপ আমার মনে, আমার কণ্ঠ-স্বরে, "মায়া, পরম নিশ্চিন্ত হলুম আজ। আমি আবার ফিরে আ'সবো। ফিরে আ'সবো তোমার জন্যে। তোমার আমার জীবনকে উষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ হোতে দেবো না। কিছুতেই না, কারুর জন্যেই না।"

ও-ঘর থেকে ঘন্টা নাড়ার শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছিলো বৃদ্ধার তরঙ্গায়িত কণ্ঠস্বর,

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"

——::——

চৌদ্দ

এত তোড়্‌জোড়্‌, এত উম্‌ধুম্‌, এত তুলকালাম কাণ্ড, তবু যাওয়া হয়নি কিন্তু কা'ল। চায়ের বাটিতে মস্ত ঝড় তোলা কাণ্ড ক'রেচি কা'ল মায়াকে নিয়ে। আমার ভালোবাসার পাত্রীর জন্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কেউ। শিক্ষিত পাহাড়ী যুবকরা দেশে বিদেশে। যারা আছে ক-খ-ঠ-শেখা, তারা সাহস করেনি এই অসমতেজস্বিনী শিক্ষিতা মেয়ের কাছে ঘেঁষতে। সেখানে আমি একচ্ছত্র সম্রাট।

মায়াকে নিয়ে এক সঙ্গে বেড়িয়েচি, গল্প ক'রেচি, হেসেচি, দুচার দশজন তাকি
দেখেচে, উপেক্ষা করেচে। তাই নিয়ে বাঙ্গালীর মত জটলা পাকায়নি, কুৎসা রটা
নি, ষড়যন্ত্র করেনি, রা'তের পর রা'ত জেগে চৌদ্দ আনা মিথ্যে জড়িয়ে গিব
উপন্যাস রচনা ক'রে, পেটের ভাত হজমের ব্যবস্থা করেনি তারা। গোড়ার দি
যে আশঙ্কা ক'রেছিলুম কিছুই ঘটেনি তা। না ঘটুক। নছিব ভালো মনে ক
কল্পনার জাল বুনে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলছিলুম। কিন্তু প্রমাদ ঘটালে তো ম
নিজে। সে গাছে তুলে দিয়ে মই টান দিতে চায়। জোর দাবী ক'রে কৈফি
চাইতে পা'রতুম তার কাছে রবির ভাষায়,

"তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিলো না এতো আশা,)
প্রেম দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কতো ভালোবাসা।
তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি এ আদর রাশিরাশি,
এই দূরে-চ'লে যাওয়া, এই কাছে-আসা।"

কাছে থেকেই সে দূরে স'রে যেতে চাইছিলো। আবার ফিরে এসেচে সে
পেয়েচি তাকে। তাই বিদায় বেলায় অভিমানভরে তাকে কাঁদিয়ে আর যাইনি
কা'ল। তাকে নিয়েই কা'ল বিকেলে শেষ-বেড়ান বেড়িয়ে এসেচি কসাই বস্তির
মুছলমান পাড়া থেকে। আচম্‌কা অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদের প্রতিক্রিয়া
মৃদু আফ্‌ছোছ্‌রূপে বেড়িয়ে গ্যালো তাদের কণ্ঠ থেকে। ধ'রেই নিয়েছিলো তারা
এই পাহাড়-রাণীর দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আর এক জোড়া সংখ্যা বা'ড়লো
তাদের। এরপর বা'ড়বে আরও জোড়ায় জোড়ায়। এখনও নিরাশ হয়নি কেউ
কিন্তু তবু তো একবার হাতছাড়া হ'লে না জানি কি হয়। শিক্ষিত পুরুষের মন
ভালো পেলে ভাঙ্গতে কতক্ষণ? বিয়ের বাঁধনে শক্ত গেরো দেয়া হয়নি তো এখনো।
তাই এই মৃদু আফ্‌ছোছ্‌, উপদেশ, অনুরোধের লম্বা ফিরিস্তি। তাদের ইসলাম-
দীক্ষিতা গৃহিনীদের হাতের চা টা খেয়ে হৃদ্যতার চাটাচাটি কোরে এলুম।

ঐ তো খাঁন্থর হোটেল। আন্জুমানের মসজিদের পাশে। সেখানে আছে তার পাহাড়িনী মা আর স্ত্রী, আর ছেলে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেও দেখা কোরে এলুম। বাদ দিইনি কাউকে।

পরেশ মজুমদারকে রাতে একা গিয়ে খবর দিলুম। আর খবর দিলুম তাঁর সঙ্গী তিনটিকে। বিদেয়-আদায় নিয়ে ফিরে এলুম কাঠের বাড়ীটাতে।

আজ সকাল থেকেই মোট্ঘাট্ বাঁধাছাঁদা হ'চ্ছে। আমি নেই সেই বাঁধা-ছাঁদার মধ্যে। বেলা দশটায় ট্রেন। নিস্পৃহা বৃদ্ধার আশীর্ব্বাদ ও সত্বর ফিরে আসার সরল উপদেশও পূর্ব্বেই নেয়া হ'য়ে আছে। আমি মনকে নিয়ে মন-মরা হোয়ে আছি। মন যে পাথরের চেয়ে ভারী হয় এতোদিন তা জানা ছিলো না।

আগে পাছে ছুটো রিক্সা সদর রাস্তা দিয়ে ষ্টেশনে চ'লেচে। আগেরটিতে মোট্ঘাট্, পরেরটিতে আমরা ছু'টি।

ঘেন্না-ধরা ভূটিয়া-বস্তির ধার দিয়ে যেতে যেতে মনে হ'লো সেও যেন আজ শত বাহু বাড়িয়ে আকর্ষণ ক'রচে।

মার্কেট স্কোয়ারের শত শত লোক তাকায়নি আমাদের দিকে। ফুরসুৎ কোথায় তাদের? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেচি আমি, দেখেচি তাদের শত প্রয়োজনে আনাগোনা। এই সকল নিরীহ লোকগুলির জন্যে চোখ ছুটিও আমার সজল হোয়ে উঠ্লো আজ।

রক্ভিল্ হিল, অব্জার্ভেটি্ হিল তারও ওপারের ঐ বার্চ্চহিল্ পার্ক,—যে বার্চ্চহিল্ পার্কের সঙ্গে প্রথম দিনটী থেকে আমার অন্তরের পরিচয় আর উভয়ের ভালোবাসা, যে ভালোবাসা শেষ পর্য্যন্ত মিলিয়ে দিলে আর ভালোবাসালে মনমায়াকে; আর পশ্চিম দিকের ঐ সন্দাক্ফু পর্ব্বত, যার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকেচি, আর রচনা ক'রেচি কল্পলোকে কত বিচিত্র আলেখ্য; ঐ আমার রজত শুভ্রা কাঞ্চনী; সবই রইলো যে যার জায়গায় অটল হোয়ে দাঁড়িয়ে। সচল হোয়ে বিপদ হ'লো শুধু আমার। চ'ললুম আমি সব ছেড়ে।

ট্রেনে চা'পলুম। পহেলী-ঘণ্টি হোয়ে গেল। ব'ললুম, "মায়া, এবার তুমি নেবে পড়ো।"

অন্য মনস্ক ভাবে বাইরের দিকে ফাঁকা উদাস নজর ফেলে ব'ললে শু
"যাই।" 'যাই'—কিন্তু যাওয়ার কোনও লক্ষণই পাওয়া গ্যালো না তার।

অবশেষে শেষ-ঘন্টিও শেষ বারের মত সকলকে জানিয়ে দিলে যে যা
যারা তারা ছাড়া আর সকলে মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে নেবে পড়ো। মায়া অচঞ্চ
চঞ্চল হোয়ে উঠলুম আমি, "মায়া, নেবে পড়ো এইবার। গাড়ী চ'লতে শু
ক'রেচে যে।"

সহজ ভাবেই জবাব দিলে মায়া, "ব্যস্ত হ'য়ো না। ঠিক্ জায়গায়, ঠি
সময়েই নেবে যাবো আমি।"

"মানে? তুমি কি যেতে চাও আমার সঙ্গে?

"হ্যাঁ।" সংক্ষিপ্ত জবাব।

"কত দূর?" ব্যাকুলতা আমার কণ্ঠস্বরে।

সহজ জবাব তার, "ক'লকাতায়।" দুঃখের মধ্যেও কৌতুক ছাড়ে
পোড়ারমুখি।

বিস্ময়ে ব'লে উঠলুম, "ক'লকাতায়!" এক মূহুর্ত্ত পরে ব'ললুম, "বেশ
চলো। কিন্তু বাপ মাকে না ব'লে কি পালিয়ে যাচ্ছো?"

গম্ভীরছে জবাব দিলে মায়া, 'পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না আমার
আমি বাপ মার স্থির-প্রজ্ঞ সাবালক ব্যাটাছেলে, বেপরোয়া স্বাধীন। প্রশ্ন উ
তোমার। তুমি মেয়ে ছেলে। কথায় কথায় শুধু অভিমানই ক'রতে জানো,—
জোর ক'রতে জানো না।"

ব'ললুম, "বটে! চলো, দেখাচ্ছি তোমায়, আমি ব্যাটাছেলে কিনা।"

ব'ললে সে, "তাই দেখতেই তো সঙ্গে যাচ্ছি।"

পাশাপাশি ব'সে। তবু রাস্তায় আর তেমন কথা হ'লো না উল্লেখ যোগ্য
চোখ মেলে তাকিয়ে আছি এদিক ওদিক, কিন্তু দেখ্‌ছি না কিছুই। হাঁ, দেখছি
মনের মধ্যে ডুব মেরে অনেক কিছুই যা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। অতীত, বর্ত্তমা
ভবিষ্যত;—একেবারে ত্রিকালদর্শী ভুষণ্ডীকাক আমি। অতীতে কি ঘ'টে গ্যালো
বর্ত্তমানে কি ঘ'টচে, ভবিষ্যতেই বা কি ঘ'টতে পারে, ঝট্ ঝট্ কোরে দেখে চ'লেছি
এ দেখার বিরাম নেই।

মাঝে একবার ষ্টেশন মহানদীতে কৌটো খুলে খেতে দিলে মায়া, "খাও, খেয়ে নাও। এতোক্ষণও ক্ষিদে পায়নি তোমার?"

জবাব না দিয়ে খেয়ে গেলুম। পানির বোতল হাতে দিয়ে ব'ললে, "এখন আর চা দেবো না। আরও ঘণ্টা ত্বই পর।" জানি ফ্ল্যাস্ক্ ভর্ত্তি চা আছে। স্বয়ং খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্রীর হুকুম। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছায় কি এসে যায়?

বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁচে গেলুম শিলিগুড়ি। ক'লকাতার ট্রেণ হোথা দাঁড়িয়ে। ছা'ড়বার পূর্ব্বে সে দাঁড়িয়ে থা'কবে আরও ঘণ্টা দেড়েক। কথা যা থাকে—সে তো অফুরন্ত, তার আবার শেষ আছে নাকি,—সংক্ষেপে এবার সেরে নিই। প্রস্তাব ক'রলুম, "মায়া, প্ল্যাট্ফরমের দিকে একটু বেড়িয়ে নিই, চলো।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। লম্বা প্ল্যাটফরমের শেষ-প্রান্তে গিয়ে ব'সে সামনের পূব দিকের মাঠের পানে চেয়ে দেখলুম সমতল ত্বনিয়াটিকে।

এ ক'মাসে বেশ বদ্‌লে গ্যাচে সে। যাবার বেলা যে চেহারা দেখে গেচি, নেই সে চেহারা। যে ফসল বুকে ধারণ কোরে হা'সতো, নেই সে আবাদ। ফাঁকা মাঠ। ব'দলে আমিও গেচি এ ক'মাসে। ঘোরতর বদল।

প্রায় সমস্ত দিন ট্রেণ ধকলের পর ক্লান্ত শরীর পূবালী মিঠেল হাওয়ায় কিছুটা স্নিগ্ধ হোয়ে এলো। ফুরফুরে হাওয়ায় ঢেউ খেলচে মায়ার মাথার সামনের উস্কোখুস্কো চুল। মন স্নিগ্ধ ত্বজনের কারুরই নয়। কি ব'লে শুরু করি, কথা খুঁজে পাচ্চিনে। আবেগের উত্তাপে হারিয়ে যাচ্চে সকল কথা। না-বলা কথা মাথার মধ্যে এক সঙ্গে ভীড় কোরে সব তালগোল পাকিয়ে দিচ্চে। মায়াই বাঁচালে আমায় এ সঙ্কট থেকে, যেমন বরাবর সব ব্যাপারে বাঁচিয়ে এসেচে। মুখ খুললে সে, "যদি সাহস থাকে তো আমার ছালাম দিও বাপ মাকে, আর স্নেহ দিয়ো বোন ত্বটিকে। যদি এবার একবার তাঁরা সঙ্গে আসেন বেড়াতে, দাসীর মতো সেবার ত্রুটী ক'রবো না।"

জবাব মুখে যোগালো না এ কথায়। শুধু ভারী বুক থেকে বেড়িয়ে এলো একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস। ক্ষণ পরে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "তাহ'লে যাচ্ছো না আমার সঙ্গে?"

জবাব দিলে সে, "তোমার সঙ্গেই তো যাচ্ছি। শুধু জট্ পাকানো মাটির দেহটিই র'য়ে গ্যালো এখানে।"

ব'ললুম আমি, "ঐ মাটির দেহটিকে হেলা ক'রতে পা'রবে না তুমি আমার অবর্ত্তমানে। তাহ'লে আমার দেহকেই অযত্ন করা হবে। আমি যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে এসে যেন দেখতে পাই আমার মায়া আমাকে অবহেলা করেনি।"

এ কথার জবাব না দিয়ে সে মাঠের দিকে চুপ কোরে চেয়ে রইলে। আমি ব'ললুম আবার, "আমি বাড়ীতে দিন কয়েক থেকে যাবো কলকাতায়। বাসা একটি ঠিক কোরে ফের্ আ'সবো তোমায় নিতে। তখন কারুরই কথা শুনবো না।"

এ কথারও জবাব দিলে না সে।

এক মিনিট চুপ কোরে থেকে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "আচ্ছা মায়া, তুমি তো এলে আমার সঙ্গে। কই বুড়ো মানুষকে তো ব'লে এলে না?"

এবার জবাব দিলে সে, "আমার যা বলার ঠিক সময়েই তা ব'লে দিয়েচি।"

"রাত হোয়ে এলো। এখন কি ক'রবে?"

"ট্যাক্সি কোরে ফিরে যাবো।"

"যদি রাতে ট্যাক্সি না চলে?"

"থেকে যাবো এখানে। আমার এক আত্মীয় আছেন। এখানে রেল-ওয়ে ইয়ার্ডে গার্নার। তাও না হয় তো ওয়েটিংরুম তো আর কোথাও যায়নি? একটি রাত বৈ তো নয়? কেটে যাবেই কোনও রকমে। সে আমার যা হয় হোক। তুমি তো কাল বিকেলের আগে আর বাড়ী পাচ্ছো না?"

ব'ললুম, "না।"

ব'ললে সে, "চলো, আগেভাগে জায়গা নাও ট্রেণে। নইলে ব'সে ব'সে রাত জা'গতে হবে।"

ব'ললুম, "ঘুমোবার জায়গা পেলেই কি ঘুম বাধ্যানুগত চাকরের মতো হুকুম মা'নবে নাকি?"

"ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নেবার মতো মনের শক্তি অর্জ্জন করো। সহজ হোয়ে যাবে সব।" সান্ত্বনার মতো উপদেশটি বলা সহজ, শুনতেও সহজ। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে মুখের উপর এর জবাবটা দেয়া সহজ নয়;—হৃদয়হীনতার মতো

কঠোর হোয়ে বুকে বাজে। তাই আর কিছু ব'ললুম না। উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধ'রলে সে। ব'ললে, "চলো, আর দেরী করো না। প্রথম ঘণ্টা হোয়ে গ্যালো।"

ট্রেণে ভালো জায়গা মিল্‌লো। নিজের হাতে বিছানা ঠিক্‌ঠাক্ কোরে দেখিয়ে দিলে কোনটায় কোন খাবার জিনিস রইলো।

গার্ড সাহেবের ইঙ্গিত পেয়ে গাড়ী কাঁকিয়ে লম্বা চীৎকার জুড়ে দিলে। মায়া এ ইঙ্গিতের ভাষা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি পায়ে একটি প্রণাম ক'রে তর্ তর্ কোরে নীচে নেবে গ্যালো। না সুযোগ দিলে ধ'রবার, না কিছু ব'লবার। তার বলা তো হ'য়েই গ্যাচে। বাকী রইলো আমার। আমার যে আরও কিছু ছিলো ব'লবার এ সময়ে। আমার কথা তো ফুরোতে চায় না।

ঠিক নীচে প্ল্যাট ফরমের উপরে বিজলী বাতি জ্বলচে। দাঁড়িয়ে গ্যালো মায়া তার ঠিক নীচেই। গাড়ী ততোক্ষণে গুড় গুড় কোরে চলা শুরু ক'রেচে। দেখলুম চেয়ে দুটি ক্ষীণকায়া স্বচ্ছতোয়া পার্ব্বত্য নদী দুটি কমল হ্রদ থেকে বেড়িয়ে মায়ার সুপুষ্ট গাল বেয়ে নীচে ঝ'রে প'ড়চে। বিজলীর আলোতে চিক্ চিক্ ক'রচে সে নদী দুটো। ঠোঁট দুটো কি যেন ব'লতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠচে। স্থির দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ।

ব'ললুম মনে মনে, "মায়া, তোমার জীবন উষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ হোতে দেবো না মায়া।"

কলের গাড়ী বলের সঙ্গে চ'লে আমার দৃষ্টির বাইরে ফেলে দিলে মায়াকে। দেহের দুটো কল দিয়ে আর দেখা যায় না তাকে। কামরা-ভরা এতোগুলো লোক জনের ভেতরেও আমি এখন একা। মায়া যখন সঙ্গে থাকে সে তখন একাই একশো।

পাতা-বিছানায় লম্বা হোয়ে শুয়ে প'ড়েচে প্রায় সবাই। শুইনি আমি এখনো। শোব কি, আর ঘুমোবো কি! এদিক ওদিক চেয়ে দেখচি সেই চাঁদনী রাতে মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে চ'লেচে মায়া। আর ডা'ন হাত উঁচিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে কাতর স্বরে ডুক্‌রে উঠচে সে, "বাদশাহ, আমার জীবনটা যেন উষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ কোরে দিয়ো না বাদশাহ।"

গ্যালো। নানাজান আইচেন। শুনতেছি মোট কথা আপনার বিয়ে হবে সামনে মাসে।"

একটি সুখবর বটে—হ্যাপি নিউজ। কিছুক্ষণ আমার মুখের বাক্‌শক্তি রোধ হ'য়ে গ্যালো। মনেও শক্তি নেই চিন্তা ক'রবার। সবই অসাড় হে আ'সচে। চুপচাপ কেটে গ্যালো বেশ কিছুক্ষণ। রহিম গরুর সঙ্গে শ্যালক ভ পতির সম্পর্ক পাতিয়ে মধুর সম্ভাষণ ক'রতে ক'রতে হাঁকিয়ে চ'ললো গাড়ী।

দ্বিতীয় চাকর মনির সুখবরের আরও একটি অংশ শুনালে আমায়, "বাড়ী মিস্ত্রী নেগেচে। মাজাঘষা হইতেছে খুব।" খুব সুখের কথা বটে।

পাঁচ মাইল পথ তিন ঘণ্টায় এসে থা'মলো গরুর গাড়ী নিজের গ্রা সুবিদপুরে। সন্ধ্যে বিতে গ্যাছে অনেকক্ষণ। চাঁদও উঠেচে আকাশে চাঁদ! কিন্তু এ চাঁদ আমার সে চাঁদ নয়, যাকে দেখে আমিও উৎফুল্ল হোয়ে হাসতুম আর হাসতো সেও আমায় দেখে। আজ বড় মলিন, বড় বিষণ্ণ সে। কোন ব্যাথা ভারে যেন মুষড়ে প'ড়েচে চাঁদ। আকাশ-ভরা তারার মেলা। কিন্তু সবা ঝিমিয়ে র'য়েচে কেন? স্তিমিত নয়ন হোতে বিচ্ছুরিত হ'চ্চে না কোন আনন্দধারা।

বিছ্‌মিল্লাহ ব'লে বাড়ীর দরজায় পা দিলুম। হয়তো এখনই শুনতে পা পৌরুষ কণ্ঠের গলা খাঁকারি, আর গুরু গম্ভীর আহ্বান। না, পেলুম না শুনে সুপরিচিত হৃদয় কাঁপানো, সিংহনাদী ওজোগুণ বিশিষ্ট কণ্ঠের সাড়া।

সর্ব্বাগ্রে ছুটে এলো গুরনাব জাঁনারা। 'আচ্ছালামো আলায়কু পদচুম্বন হোয়ে গ্যালো। খুশীর অন্ত নেই তাদের মুখে ও মনে। হরিণীর ম চটুল পায়ে এগিয়ে গিয়ে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে জানালে আম্মাকে আমার শুভ আগম বার্ত্তা। আম্মা ছিলেন রান্নাঘরে। ছুটে এলেন তিনি। উনুনের আগুন জাহান্নামে যা'ক। 'কইরে, আমার বাছা কই? আমার সোনার চাঁদ কই? কতদি দেখিনি।" ছুটে গিয়ে ছালাম জানালুম, আর চুম্বন দিলুম আমার বেহেশতে ঐ দুটো সিঁড়িতে। বুকের ব্যথা যেন ক্ষণেকের জন্যে বেশ হাল্কা মনে হ'লো আম্মা কেঁদেই ফেল্লেন আমায় দেখে;—আনন্দাশ্রু।

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "আম্মা, আব্বা কি বৈঠকখানায় আছেন?"

"না বাবা, তোর নানাজানকে নিয়ে গ্যাছেন উনি মকিমপুরে। আজ বোধহয় আ'সতে পা'রলেন না। তোর নানাও ক'দিন হ'লো এসেচেন। তুই শ্বশুরে জামাই মিলেই গ্যাছেন সেখানে,—নিজ্ঞাবাড়ী।"

কারণটা খুলে ব'ললে জয়নাব জঁাহানারা। আর বলা কি যেমন তেমন বলা। একেবারে বলার বাপ বলা, আনন্দের শেষ ধাপে চ'ড়ে বলা, "ভাইজান, মরিয়মের সঙ্গে তোমার বিয়ে যে। তাই অব্বা ও নানাজান কথা পাকাপাকি ক'রতে গ্যাছেন মকিমপুরে।"

মরিয়মের সঙ্গে বিয়ে! মরি, মরি, এর চেয়ে সুখের কথা, হ্যাপি নিউজের চরম কথা আর কি হোতে পারে? খালাতো বোন ছিলো, বিবি হবে। এর আর কথা পাকাপাকি কি? খালাতো বোন্ তো পাক্, আর পনেরো বছরের পাকা। আর আমিও নাপাকি নই। কাজেই পাকাপাকির কি আছে? আম্মার চাচাতো বোনের মেয়ে মরিয়ম,—মরি। আমার কাছে হবে মেরী, মিরিয়াম। কথায় কথায় শপথ ক'রবো, 'বাই মেরী,' ক্ষণে ক্ষণে ডা'কবো, 'মাই মেরী,—মাই ডার্লিং।'

ব'ললে জয়নাব, "কি ভাইজান, গুম্ হোয়ে গেলে যে। এত বড় একটা সুখবর দিলাম। দার্জিলিং থেকে আমাদের জন্যে কি জিনিষ এনেছো—দাও। যে রকম সুখবর পুরস্কারও সেরকম হওয়া চাই।"

জঁাহানারা, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, সব শেয়ালের এক রা, ডিটো মেরে গ্যালো, "তাই তো, তাই তো, মনোহরা জিনিষ আ'নতে চেয়েছিলে ভাইজান।" পোঁ ধরার ওস্তাদ জঁাহানারা।

ভাইবোনদের মধ্যে এ রসিকতায় আম্মার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হোয়ে উঠচে। ব'ললুম আমি, "আমার এত বড় একটা সুখবরের বদলে সুবর দেখে তোদেক বাড়ী ছাড়া ক'রলে তবেই হবে উপযুক্ত পুরস্কার। ভালোই হ'য়েচে নানা-জান এসেচেন। তাঁরও তো বাড়ী খালি। তোদের আনন্দটা কেমন হয় তাই দেখি। আচ্ছা, আমার বিয়ে, তো তোদের অত আনন্দের কারণ কি? কথায় বলে যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

একটু যেন বিরক্ত হোয়েই ব'ললেন আম্মা, "এ তুই কি বক্‌চিস্ জাহাঙ্গীর
আজকা'ল চা'ক্‌রীর বাজার যা। তোর আব্বা কি চাকুরে? তোর খালু পুলিশে
'নিস্‌পেক্‌টার্। অনেক বড় বড় চাকুরে হাতে। ভালো চা'ক্‌রী নিয়ে দিবে
মেয়েও ভালো। আমরা কি তোর খারাপির জন্যে এ কাজ ক'রতে যাচ্ছি,
আহাম্মুক?"

চাকুরী! হায় চাকুরী, যম চাকুরী! গ্যালো দেশটা এই চাকুরী চাকু
কোরে। ইংরেজরা কী কলই টিপে দিয়ে গ্যালো বাবা, যে ছেলে বুড়ো সবার
মাথায় ঐ একই খেয়াল ছাড়া অন্য কিছু ঢোকেই না। সরকারী চাকুরেরা মনিব
তাঁদের মান ইজ্জত বেশী। লাখোপতি কৃষিজীবি, ব্যবসায়ী একশো টাকার সরকা
চাকুরের সমান নয় মান সম্মানে প্রভুত্বে। কাজেই লাখোপতির শিক্ষিত সন্তানের
চাকুরীর উমেদওয়ার হোয়ে ঘুরতেই হবে। নইলে শিক্ষার যে মান থাকে না
লোকে ব'লবে অমুকের সন্তান লেখাপড়া শিখেও চাকুরী পেলে না। কী ছাই লেখ
পড়া শিখেচে! আমাদের দেশের শিক্ষার পরবর্ত্তী দুয়ার ঐ এক দিকেই শুধু খোল
যে। ফুলবাবুর মর্য্যাদা আছে এখানে, রূপকথার রাজপুত্তুরের মর্য্যাদা পায় তারা
শ্রমের মর্য্যাদা নেই। অথচ দেশ সেবার মনোবৃত্তি না থা'কলে চাকুরী একটি মো
মাত্র এ চিন্তা আমার আব্বা হেন ব্যক্তিও কি ক'রলেন না?

আব্বার মতো আমারও কি দিন চলে যেতো না? দিন হয় তো যেতে
হয় তো কেনো, যেতোই। কিন্তু মুখ যে বের ক'রতে পা'রতেন না আব্বা। তাঁ
এরূপ কৃতী ছেলের চাকুরী মিল্‌লো না? মাচার খাঁড়াল্ হোয়ে ঘরে ব'সে রইলো
দেশ ছেয়ে যাবে কথায়। কাজেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন আব্বার যুক্তির-নিক্তি ভা
হোয়েচে দেশের প্রচলিত মর্য্যাদা বোধের দিকে। নইলে আমার অমন সুন্দর ধীর
স্থির প্রজ্ঞা বিশিষ্ট আব্বা এ কাজে সম্মতি দিতে পারেন! আর তা ছাড়া মেয়ের
পুরুষের মন্ত্রী, পীর পয়গম্বর। সবার কথা ফেলে দেয়া যায়। যায় না শুধু প
ঘরের মেয়ের কথা, নিজের ঘরের ভার নিয়েচেন যিনি আর সন্তান বইচেন তাঁর
দুর্ব্বিসহ দুঃখ স'য়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। যখন তখন পুরুষ মানুষের কা
কাছে মনোস্তাত্বিক প্রচার কার্য্য চালাতে থা'কলে কোন্ পুরুষ মানুষই বা ঠি
থা'কতে পারেন? আর যেমন তেমন প্রচার কার্য্য কুট্ নীতি নয়। একেবা

চানক্য গোয়েন্দ্সের বাবাও হার মা'নবেন এ দের কাছে। তাই তো শুনি আজ-কা'লকার যুদ্ধের সময় কুটনীতিতে মেয়েরাই কাজে লাগেন বেশী। আমার আম্মাও তো তাঁর স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম থেকে আলাদা নন্। মা-বেটি আমার বাপ ও তাঁর বাপকে একই রাস্তায় খাড়া কোরে দিয়েচেন। রাজশাহীর মেয়ে ব'লে ঠাট্টাই করি আর যাই করি, একেবারে বাহাদুর বেটি। আমার আব্বার মতো মানুষকে ভাঁজিয়ে আনা সহজ ক্ষমতার কাজ নয়। জিতা রহো বেটি।

চরম বিদ্রোহ, চরম ভাঙ্গন ছাড়া মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছিনে কোথাও। যে ঘাঁটিতে আশ্রয় নেবো সে ঘাঁটিই পূর্ব্বাহ্নে বেদখল হোয়ে ব'সে আছে। 'ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই, ভিখারিণী হ'লো যদি কমল-আসনা।'

দিশেহারা ভগ্নতরী নাবিকের কাছে আজ নেই কোনও স্থল কূল, নেই কোনও নিরাপদ পোতাশ্রয়। ক'রবো কি, কী ক'রবো? মাথায় মনে আগুন ধ'রে গ্যালো যে। দাউদাউ-করা লেলিহান শিখা দিয়ে অল্প সময়েই আমায় পুড়ে পুড়ে শেষ কোরে দেবে এ। আমার জীবন-দীপের সূতোর-স'লতের দু'প্রান্তই জ্ব'লতে আরম্ভ কোরেচে। লচে তারা অবিরাম, অনির্ব্বান।

——::——

ষোলো

দুশ্চিন্তাগ্রস্থ উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘুম আ'সতে আ'সতে এলো সেই শেষ-রাতে। জেগেচি যখন তখন বেলা ন'টার কম নয়। শুনলুম আম্মা নিষেধ ক'রেচেন ডেকে জাগাতে, 'আহা, বাছা আমার ট্রেনের কষ্টে ঘুমোতে পারেনি। থাকুক ইচ্ছামত ঘুমের আরামে।' আরও শুনলুম ভোর বেলাতেই আব্বা ও নানাজান ফিরে এসে-চেন গরুর গাড়ী কোরে মকিমপুর থেকে। লজ্জা, রাগ, অভিমান সবাই একসঙ্গে

মনের কোণে বাসা বেঁধে যেতে দিলে না চরণ-ছুটোকে বৈঠকখানার দিকে। বাড়ীতে প্রাত্যহিক চির-অভ্যাস্ মত প্রাতঃকালীন পেটখালি ক'রবার পর ভিজে ছোলা দিয়ে পেট-পূর্ত্তির যোগাড় ক'রছিলুম। একরাশ ভিজে ছোলা আমার সামনে। আপন মনে গো'স' ছড়ান শুরু ক'রেচি, সচরাচর যা করিনে। এমন সময় নানাজান এলেন বাড়ীর ভেতরে হাঁ'কতে হাঁ'কতে,

"কই রে, ক'লকেত্তিয়া বাবু নাকি এবার পাহাড়িয়া বাবু হোয়্যা গ্যালো. উঠেচে সে শালা?"

উঠে গিয়ে ছালাম ক'রলুম ও সমাচার জিজ্ঞেস করলুম।

"আরে, সকাল বেলা উঠ্যাই বুটছোলা কিসের? পাহাড়ে যায়্যা কয় মাসে ভুটিয়া ঘোড়া হয়্যা আলি নাকি?"

"তা নাহ'লে বাজারে দাম বা'ড়বে কিসে নানাজান?"

"সে কিরে? বাজারে তোকে তুলতে হবে না। ভালো ঘোড়া ব'ল্যা নাম হ'লেই দাম বাড়ে। বুজ্‌চো শালা?"

নানার চেহারা ভালো। বেশ নাহস্‌নুহস্ চেহারা। লম্বা-চওড়া দেহ। দেখে মনে হয় যোওয়ান কালে একটি চেহারাই ছিলো বটে। সুন্দর পাকা দাড়ী। গোঁফ কামানো। মুখে দাঁতের দ'ও নেই। ভূঁড়ি প্রমাণ দেয় জীবনভর নানাজান ভূঁড়ি ভোজনে অভ্যস্থ ছিলেন। সুখের শরীর। সম্প্রতি অসুখ যা তা শুধু নানীর অকাল বিয়োগে। মাত্র ৬২।৬৩ বছরে নানী মারা গ্যাচেন। নানা তাই দুঃখ ক'রে বলেন। ফোক্‌লা মুখে হাসেনও ভালো। নির্ম্মল হাসি। আর সব চেয়ে ভালো তাঁর মিষ্টি মুখের আলাপ। কথা জুড়্‌লে দু'ঘন্টা লোকে শুনে। তবে দু'ঘণ্টার মধ্যে নানীর ভাইকে মিষ্টি ডাকে দুশো বার স্মরণ করেন। অর্থাৎ শয়ে আকার লয়ে আকার কথাটা আর 'বুজ্‌চো' মুদ্রাদোষটি স্বর্ণ মুদ্রার মতই নানার কাছে প্রিয়। প্রিয় মানে, একেবারে রক্ত মাংস হাড় হাড্ডী নাড়ী নক্ষত্রে একাকার হোয়ে মিশে গ্যাচে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ এই যে নানা কানে একটু খাটো। একটু,—বেশী নয়। স্বভাবের চেয়ে একটু জোরে কথা ব'লতে হয়। চোখের তেজ মন্দ নয়। অন্ততঃ শহুরে চৌদ্দ বছরের ছেলেদের মতো বছরে দুবার চশ্‌মা বদলাতে হয় না। এ কথা উঠ্‌লেই জোশের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে বলেন নানা, "আরে, মরদের চোখ আগেই

কমতেজী হবে কেন হে? ছন্দে বন্দে তু'নিয়া। আমি যে মুষ্টিযোগ করি, কর্ দেখি, কেমন চোখ যায়। খাওয়ার পরে হাত ধুয়্যা দুই ফোটা পানি চোখের কোণায় দিস্। বুঝ্‌চো? আজকালকার যোয়ানগুলা কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। বিয়া হোতে না হোতেই ধ—ভ—। বুঝ্‌চো?' আর হো হো খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দে হাসি উছলে পড়ে আপন রসিকতার রসে। শেষ হয়নি এখনো। আরও চ'লতে থাকে, 'যুবকগুলার সব মোরগের মতো ব্যাভার। বুজ্‌চো?'' আবার হাসি। সংক্রামক হাসি। আরও আছে, 'আমাকেরে আমলে চাষাভুষার ঘরে কোনও যোয়ান ব্যাটা নিয়া বিয়া ক'র্যা যখন আছাড়্ পাছাড়্ করে, থোম্রায়, ভাত খায়, খায় না, কাজ কাম করে, করে না,—নিজের গিতান (গৃহিনী) এই সব দিকে ইশারা করে, তখন গেরস্থ কয়, আরে মাগী, শালার চ্যাংড়াক্ এখনই বিয়া দিমো? কাতি'মাস আসুক। পাগাড়্ তুলমো। লাঠি দিয়া পিটমো। ব্যাটাক্ কমো, লে শালার ব্যাটা, পেচ্ছাব কর্ এটি। যদি পাগাড়্ পেচ্ছাবের জোরে ঢোঁসাবার পারিস্ তবেই না বিয়া দিমো। বুজ্‌চো?' আবার হাসি। কাছে কে রইলো আর না রইলো, সম্পর্ক অসম্পর্কের কথা নেই। নির্ব্বিচারে সরল সহজ ভাবে চলে নানাজানের রসিকতা।

ভদ্রতার ও শ্লীলতার মাপকাঠিতে উচ্চাঙ্গের নয় রসিকতা নানাজানের। তবে প্রাণবন্ত আর জীবনের রস ও বাস্তব অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত রম্য সে বাক্যালাপ। লেখা-পড়া বেশী জানেন না তিনি। প্রাচীন সৈয়দ ঘর ব'লে কথায় কথায় অহঙ্কার ক'রতে ছাড়েন না। তবে সে অহঙ্কারে মনের কালো কালিমার হুঙ্কার নেই মোটে। ঐতিহ্যের মতো পাওয়া-কাহিনী শিশু যেমন সহজ ও নির্ম্মল ভাবে ব'লে যায় এও ঠিক তেমনি।

আগের কথার সূত্র ধ'রে জিজ্ঞেস ক'রলুম নানাকে, "তাহ'লে বাজার-দর আমার কতো উঠ্‌লো, নানাজান?"

ব'ললেন তিনি, "চা'ক্‌রী বা'ক্‌রী নাই যে-মরদের, তার আবার দাম কি হে? এই মরদ হাত দিছে ব'ল্যা তাও পালি সাড়ে পাঁচ হাজার ট্যাকা, আর ডগ্‌ড'গ্যা সুন্দর ম্যায়া। চা'ক্‌রীও একটা পাবি। যেমন তেমন চা'ক্‌রী আর ঘিউ ভাত। যুবত বউ নিয়া চপাচপ্ খাবি। একেবারে রসগোল্লা।" হো হো খ্যাক্ খ্যাক্ হাসি।

মনে মনে ব'ললুম, তাই তো দেশের লোক আপনাকে ফক্কর্ মীর ব'লে জানে। ভালো নাম অবিশ্যি মীর ফখর উদ্দিন।

মুখে ব'ললুম, "আরব দেশগুলোতে নাকি ক্রীতদাসের বাজার আছে। অমনি কোনও বাজারে আমায় তুললে হ'তো না? হয় তো দাম আরও দু'চার টাকা বেশী হ'তো? এ আক্রা গণ্ডার বাজারে দু'চা'র টাকাই বা কম্ কিসের?"

নানা ব'ললেন, "যেকি জিনিস বাজারে তু'ললেই অকাম। তাক্ আন্ধারেত্ত চালান লাগে। সেই ব্যবস্থাই আমরা ক'রিচিরে শালা।"

আম্মা হয়তো শুনছিলেন উভয়ের কথাবার্ত্তা তাঁর রাজত্ব রান্নাঘর থেকে। বেড়িয়ে এলেন এবার। আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে এলো তাঁর ডা'ন-হাত বাঁ-হাত দুই ভাইনী মেয়ে, ঠোঁটে হাসির মউজ নিয়ে। হাতে আটা মাখা।

যোগ দিলেন আম্মা, "বাজান, আমরা দুই বাপ-বেটিতে মিলে নাকি ওকে ডুবাচ্ছি। শুনেন ছেলের কথা। আর সেই রাগে ওর দুই বোনকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে শোধ তুলবে।"

এক গাল হো হো খ্যাক্ খ্যাক্ কোরে হেসে নানা ব'ললেন, "শালা বড় বুদ্ধিমান, মা। কলিকাতায় থা'ক্যা থা'ক্যা শালার কথাবার্ত্তা বুদ্ধিশুদ্ধি সব ক'ল-কেতিয়া হয়্যা গ্যাচে কিনা। উঁই ঠিকই বুজিচে যে আমি ছাড়া বাজারে-অচল ওর বোন দুড্যাক্ বেচ্‌বার পা'রবে না। আর একা'লের ম্যায়া। অপদাথ। একটাক দিয়া আমার কামও চ'লবে না। ওর নানী হ'লে সে কথা হ'তো। একজন হোঁকা গুলকা দিবে, আর একজন পান পিষা দিবে।"

বেহায়া বোন দুটোও আমার যেমন! কোনও রকম হায়া পটি না কোরেই দাঁত বের ক'রে জবাব দিলে বড়টি, "বাড়ী ঘরদোর সম্পত্তিগুলো আগেই আমাদের নামে রেজেষ্ট্রি ক'রে দানপত্র দিতে হবে। তারপর যা হয় একটা হবে।"

মাকে সাক্ষী ক'রে ফোক্‌লা মুখে ব'ললেন নানাজান, "শুন্‌ছিস্ রাহিমা, তোর বেটিকেরে কথা শুন্‌ছিস্? শালীরা চালাক কেমন। সম্পত্তিগুলা নিয়া শাদী আর কবুল ক'রবে না। তোর বেটিগুলাই বেশী বুদ্ধিমান। তোর ব্যাটাডা শালা এদিকে বোকা। আমি কই আরে শালা, বউ নিয়া কি ধূয়্যা পানি খাবি? একটা হ'লেই হ'লো যদি কাম পাওয়া যায়। বরের আবার পছন্দ অপছন্দ কি রে?

আমাকেরে আমলে তো এ সব আছিলো না। বাপ মায়ে পছন্দ ক'র‍্যা দিছে, আমরা খুরেত্ ছালাম ক'র‍্যা নিছি। দিন ভালোই গ্যাছে। এখনকার ছেলেরা বাবা, এড্যা বাঁশা ওড্যা বাঁশি।''

নানা হয়তো আরও ব'লতে যাচ্ছিলেন। মাঝখানেই কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললুম, "আপনারা ঘোমটা-টানা বউ নিয়েচেন। আমরা বন্ধু নিতে চাই। বন্ধু অপরে পছন্দ ক'রতে পারেন না।"

জোরে ব'ললেন নানা, "ওরে শালা। ম্যায়া মানুষ আবার বন্ধু কিরে? বুন্ধালী হয় পুরুষ মানুষের সাথে। বউয়েক মেম সায়েব বানাবি? তাও হবে। মেমের মতোই লাল টুক্টুক্যা। চুল শুদ্ধা লাল।''

ব'ললুম, ''মরিকে কি আর দেখিনি নানাজান, যে অত বর্ণনা দিচ্চেন। আসল কথা কি, বিয়ে আমার এখন হ'তে পারে না।'' মাটির দিকে চেয়েই কথাটা জোর ক'রে ব'লে ফেললুম। বুড়ো বোধ করি হাঁটু ভাঙ্গা দ' ব'নে গেলেন।

মা-বেটির চেহারার কিরূপ পরিবর্তন হ'য়েছিলো এ অপ্রত্যাশিত রূঢ় কাঠ-খোট্টা দ্ব্যর্থহীন জবাবে দেখতে পাইনি তা। অনুমান ক'রতে কষ্ট হয়নি। শুধু আভাষী উপদেশ শুনতে পেলুম, ''অপমান হ'য়ে আর কাজ নাই, বাজান। ও ছেলের যা মনে লাগে তাই করুক। এমন দানা-দুষমন পেটে ধ'রেছি আমি।'' এই ব'লে চ'লে গেলেন নিজের কাজে। আমিও বাইরে চ'লে গেলুম মুখখানা হাঁড়ী পানা ক'রে।

বুকের ভেতরের চাপা বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ ক'রেচে। অন্ততঃ আংশিক। এ যেন যুদ্ধ-জয়ের বিরাট কৃতিত্ব নিয়ে সেনাপতির 'কুইক্ মার্চ্চ' ক'রে বেড়িয়ে আসা। এমনি জোর্ কদমে পাড়ার মধ্যে বেড়িয়ে গেলুম। সারা দেহের রক্ত-গুলোই বোধকরি জমা হ'য়েছিলো মুখে ও মগজে।

সতেরো

পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে খাতির বেশী আমার খালেকের সঙ্গে। আমার উগ্র লাল চোখ মুখের কারণ জা'নতে চাইলে খুলে ব'ললুম তাকে সব। এবং পরামর্শ চাইলুম, 'অতঃপরঃ কিংকর্ত্তব্যম্।'

আমারই বয়সী খালেক। আই-এ ফেল্। বিরাট সংসার দেখাশুনো করে। খেত খামার ও বাঁধাই কারবারে ভাগ্যও বাঁধাই ক'রেচে অনেকেরই ঈর্ষা জাগাবার মতো। গ্রামাঞ্চলে—শুধু তাই বা কেন—গরীব দেশের সব জায়গাতেই তো পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপরায়ণ মানুষরূপী গোখরো সাপের সংখ্যা ভালো রকম বেশী। অল্প বয়সে পিতৃহীন খালেক আমার পিতার করুণা ও সন্তান তুল্য স্নেহচ্ছায় পুষ্ট হ'য়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিছু। বিষধর সাপেরা ফণা তোলবার পূর্ব্বেই পাকা সাপুড়ে সৈয়দ আকবর হোসেন ধরাশায়ী ক'রে দিয়েচেন তাদেক। আর বুক দিয়ে ঘিরে রেখেচেন খালেককে। তাই তো আমার প্রতি খালেকের স্বভাবজ ভালো-বাসার সঙ্গে মিশেচে বেশ খানিক কৃতজ্ঞতা।

সব শুনে অপূর্ব্ব ও অভাবিতপূর্ব্ব একটি রোমাঞ্চকর পুলক অনুভব ক'রলে খালেক। ঠিক্ হ'লো বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো ক'লকাতায়। টাকা দেবে খালেক। অ'ানবো মনমায়াকে পাহাড় থেকে নীচে নেবে যেমন কোরেই হোক্। বিয়ে হবে। বাপ মাকে বোঝানো ও মোয়ানোর ভার নিলে খালেক। একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মনটিকে হাল্কা কোরে ফাঁৎ শব্দে বেড়িয়ে এলো।

কে বলে ভবিতব্য নেই? নইলে আমার অমন সুন্দর জম্‌জমাট্ আটঘাট্ বাঁধা পরিকল্পনার মুখে হাজের হবে কেন রহিম? বৈঠকখানার খাস্ কুঠরীর দরজার সামনেই চেয়ারে ব'সে ছিলো খালেক। সেই-ই রহিমের শুভাগমন দেখতে পেয়েচে সর্ব্বপ্রথম। আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে ব'ললে, "ঐ ছাখো, 'মোট কথা' আবার কি খবর নিয়ে এলো।" মুখ বাড়িয়ে দেখলুম সত্যি। রহিম নিজের কথা-বার্ত্তার মধ্যে 'মোট কথা' বার কয়েক ব'লবেই। তাই তো সাধারণ্যে ওর নামই

হোয়েচে 'মোট কথা।' এসে হাজির হ'লো সে। খালেক জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হে, কি মনে ক'রে ?"

জা'নতে চাইলে রহিম, "ভাইজান মোট কথা এখানে আছেন কি ?" বাব দিলুম আমি, "কি খবর রহিম ?"

"আব্বা আপনাকে মোট কথা ডা'কতেছেন।"

"কি জন্মে রে ?"

"তাকি মোট কথা আমি জানি ?"

"সেখানে আর কে কে আছেন ?"

"মোট কথা আম্মা, নানাজান সব।"

বুঝলুম এ বিরাট ও অত্যাশ্চর্য্য অপমানকর ব্যাপার নিয়ে চৌকো টেবিলে পরামর্শ সভা ব'সেচে। আম্মা শেষ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে আপীল দায়ের ক'রেচেন। নইলে যে তাঁর বুড়ো বাপের মুখ থাকে না। রায় যা হবে সেও তো বুঝতে পা'রচি। খালেকের বাড়ীতে খানাপিনাগুলো মাটি হ'লো। দিনভর আদর টাঙিয়ে অভিমান ভরে স'রে থেকে পরিস্থিতি লক্ষ্য ক'রবো, অল্প পানিতে নেবে জোঁকের ভাব বুঝবো, তা আর হ'লো কই ?

আসামীর মতো হাজির হলুম জজ সাহেবের খাস্ কামরায়। সাংসারিক হিসেবের খাতা পত্র নিয়ে যেন অতি ব্যস্ত তিনি। কি কারণে জানিনে আম্মা, নানাজান আর নেই সেখানে। ছালাম জানালুম, কদম বুচি ক'রলুম। কিন্তু বেয়াদব অপরাধীর মুখ থেকে আজ আর আব্বা ডাক বেরুতে চাইলো না। চোখ তুলে পাশের চৌকিটা ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন তিনি, "বোসো।" হুকুম পালন ক'রলুম আর সভয় অন্তঃকরণে অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম পরবর্ত্তী ফাঁসির হুকুমের। মুখ ফিরিয়ে ব'ললেন এবার, "তুমি আমার একমাত্র ছেলে।" আবার খাতাপত্রে মন দিলেন। আমি মনে মনে ব'ললুম' 'এ আর নূতন খবর কি ?' ফের ব'ললেন, "আমিও বাপের একমাত্র ছেলে। তোমার দাদাজানের এন্তেকালে সংসার দেখাশুনা করছি। আমার বংশে চাকুরে কেউ নাই। আমার ইচ্ছা একটা বড় চাকুরীর সুযোগ এলে তুমি তা গ্রহণ করো। এতে গণ্ডগ্রামে বাপ মা আত্মীয়-স্বজনের ইজ্জত বাড়ে। লোকেও সমীহ ক'রে চলে।"

কে ফেলবে কথা ? কার এতো সাধ্যি ? বিষ দাঁত যে সবারই ভা:
শুধু ব'লতে গ্যালো খালেক পুত্রসম অধিকার নিয়ে, "চাচাজান কি আজ... ...'

মাঝখানেই ব'ল্লেন আব্বা, "হ্যাঁ বাবা, আজ আমার জাহাঁগীরের বি
নানা কারণে আগে জানাতে পারিনি। আর কারণটাও আজ শুনতে চেয়ো ন
শুভ কাজে দোওয়া করো সবাই।"

তবু বেহায়ার মতো ব'লতে গ্যালো খালেক, "জাহাঁগীর কি জানে যে ..

বড় বিস্ময় যে বড় মুখর হোয়েচেন আব্বাজান আজ। কথা টেনে নি
খালেকের জিজ্ঞেসা শেষ কল্লেন "আজই তার বিয়ে কিনা ? এখনি জান্‌বে সে
কিছু কিছু জানেও। সৈয়দ ঘরের ছেলে সে। সে তো জানে বাপমার পা
তলার বেহেশত্। সে কি বাপ মাকে নারাজ ক'রতে পারে ? বিশ্বাস আছে
এবং আমারও।"

আঠারো

পুলিশের নিস্‌পেক্টর্ সাহেব মহা খুশী। জীবনে ছলে বলে কলে কৌশ
কাম পাড়ি দেয়াকেই মহাজয় ব'লে মনে ক'রে এসেচেন। তাছাড়া মেয়ে যে
সুন্দরী। কোন নবযুবক জামাই-ই সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্যে একবার এলে ভালো না
বেসে স্থির থা'কতে পারে। পুরুষ মানুষের আর কি চাই ? চাই উপভো
ক'রবার মতো নারীর রূপসুধা, দেহ সৌষ্ঠব। সুন্দর মুখের জয় নাকি সর্ব্বত্রই।

আর মহাখুশী মা-বেটি আর তাঁর ফোক্‌লা-মুখো বাপ। বিজয়-গবে
তাঁদের ঘোরা ফেরার আর অন্ত নেই। বিয়ে তো একবার হোয়ে গ্যাচে। এইবা
দেখা যাবে বাছাধনকে। মা-বেটির একি কম সৌভাগ্য যে এত তাড়াতাড়ি পুত্র
বধুর মুখ দেখলেন তিনি। সেও আবার বহু-আকাঙ্খিত পুত্রবধূ ;—ছোট বেলার
পুতুল খেলায় জন্ম যে আকাঙ্খার।

জয়নাব জাহানারা মশগুল মরিকে নিয়ে। কি যে ফিশির ফাশির খুশ্-গাশ্ হা হা হি হি হাসি ও কথা চ'লচে ওদের! বেহায়ার বেহদ্দ ; বেমওকা, বেমানান, বেসামাল, বেফায়দা, বেওজর, বে-নজির বেঅকুফি ওদের কাজকারবার আর চালচলন।

এ সবের মাঝখানে একটি পুরুষকে বোঝা গ্যালো না তিনি খুশী কি ব্যাজার। যিনি এ সব আনন্দ হিল্লোলের আদিমূল, বিয়ে গীতার উদ্গাতা, কুট্ কৌশলী নেতা, আমার জন্মদাতা পিতা। সে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কোনও ঢেউ নেই,—নেই কোনও উদ্দাম চাঞ্চল্য। গুরু গম্ভীর আর প্রশান্ত সে মুখ। বোঝ-বার যো নেই ঠিক এই মুহূর্ত্তে বুকের ভেতরে কোন উজান ভাটির খেলা চ'লচে। কিন্তু এরূপভাবে আমাকে বেকায়দায় ফেলে... ? হটাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা প'লো।

"বাবাজী, আমার ভারী ইচ্ছা ছিলো নিজের বাড়ী থেকে মহাধুমধামে বিয়েটা দিই। পয়লা মেয়ে। বন্দোবস্ত আগে থেকে তেমনই হ'য়েছিলো। হটাৎ তোমার আব্বার রেজিষ্টার্ড চিঠি। খোলাছা কিছু নাই। শুধু, তোমরা সকলে এখানে চ'লে এসো। বিয়ে এখান থেকেই হবে। বরকর্ত্তা ক'নেকর্ত্তা আমি। সেও আবার দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া। ভাই সাহেবকে চিরদিন জানি তো। তাঁর প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে। জীবনে কোনওদিন কোনও কাজই বিশেষ বিবেচনা না কোরে ক'রতে দেখিনি আমরা। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। তাই তো রাজী হ'লাম আমরা।" আমার প'ড়বার ঘরে ঢুকে এক তোড়ে চাপা খুশীর সাথে ব'লে গেলেন কথাগুলো আমার পূর্ব্বতন খালু-আব্বা, স্ত্রীর আব্বা, আমার আইনী-নূতন-আব্বা জনাব মীর ফজলে রব্বানী। কাহিনী শেষ হয়নি তাঁর। আবার চ'ল্লো, "তাই ব'লে নিরাশ হইনি বাবাজী। ফিরানীর বেলায় তোমাদেক নিয়ে গিয়ে ধূমধাম ক'রবো ইচ্ছা আছে। আমি তো যাচ্ছি বাবাজী। আমার আর দেরী করার উপায় নাই। জয়েন ক'রতে হবে। তোমার কিন্তু বাবাজী, এবারে একটু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও বই পুস্তক ঘাঁটতে হবে। ছেলে ভালো তুমি। উপরের দিকে আমার মুরুব্বির জোর আছে। আশা তো রাখি যে নিরাশ হবো না।"

শ্বাশুড়ী-আম্মা যা বল্লেন সে তো মামুলী। তিনিও পতি-দেবতার সঙ্গেই জামাই আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেচেন।

"আমার বড় আহ্লাদের মেয়েটিকে তোমার হাতে দিলাম বাবা। এ আমার অনেকদিনের আশা। এখন আর একটি আশা আল্লা পুরণ ক'রলেই জীব সার্থক হয়। তোমাদের ছেলেপুলে দেখে ম'রে যেতে পারি তো আর কোনও দুঃ থাকে না।"

বেশ, বেশ। দোওয়ার যে রকম জোর তাতে সে আশাও ফ'লবে বৈকি এতোটাই ফ'লেচে যখন! আপনার বোন এবং বর্ত্তমানের বেয়ান তাঁরও দোও ও কামনা বোধকরি ঐটেই। আ'সচে বছর এই সময় দেখে যাবেন নাতি নাত্‌নীর চাঁদ মুখ। খোদার দোওয়া-কবুলিয়ৎটাও মনে হয় এই দিকেই বেশী ধন দাও, দেন্ না; যশ দাও, দেন্ না; বিদ্যে দাও, দেন্ না; সন্তান দাও আল্লাহপাক্ আর দেরী করেন না। আদি পিতা আদমের উপর আদি প্রভু আল্লার আদি হুকুম, "বংশ বাড়াও। চাষ করো, আমার মানব-ফসল বৃদ্ধি করো।" তো সে জন্যে দোওয়া ক'রলে তা কবুল হবে না? শুধু কবুল নয়, বা'ড় বরকতসহ কবুল হবে।

চোখের সামনে তো দেখছি, দুনিয়া উপর-ভর্ত্তি হোয়ে গ্যালো মানব ফসলে। চীৎকার কোরে ব'লচে দুনিয়া, "থামো বাবা, থামো। দোহাই বাবা, আর চাষ ক'রো না। এদিকে আমার বক্ষ সাবাড়। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী', তোদের চাষের হারে বড়ো যে ডরি; পাত্রে মোর নাহি বাকী কিছু দিতে যে পারি।"

না পারো দিতে, আকাশ তো আছে? ছুট্‌বো তথায়, গ'ড়বো প্রাসাদ। আকাশ-কুসুম, আকাশ-প্রাসাদ আজ আর থা'কবে না কল্পনা হোয়ে। মানব-ফসল আমরা বাড়াবোই। হোক্ না তারা গরু, ভেড়া, শুকর; না পা'ক খেতে, তব তো বংশবৃদ্ধি। নইলে বাপদাদার ভিঁটেয় আলো জ্বা'লবে কে?

বিদেয় হ'লেন শ্বশুড় শ্বাশুড়ী। বিদেয় হ'লেন না তাঁদের সাধ আহ্লাদের কন্যে। বিদেয় হবার জন্যে তো আর এ বাড়ী ঢোকেননি তিনি? এ বাড়ী যে তাঁর উপর-ভর্ত্তি কোরতে হবে। মুরগীর মতো হবে অনেক কাচ্চা বাচ্চা। পাশে পাশে ঘিরে রইবে তারা। আর টেঁা টেঁা কোরে আহ্লাদে ডা'কবে মুরগী তার ছানাগুলোকে।

প'ড়বার ঘরে ব'সে আছি, আর রাজ্যির চিন্তা। জা'নতে দিইনি কাউকো সে চিন্তার আভাষ। একে একে জোড়ায় জোড়ায় সব আ'সচেন, একগাদা দোওয়া ক'রচেন, বিদেয় হ'চ্চেন। বোধহয় আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে জায়গা খালি ক'রে স'রে প'ড়েচেন তাঁরা।

সর্ব্বশেষে এলেন ফোক্‌লা-মুখো। দন্তবিহীন একগাল হাসি। মনে উল্লাসের অবধি নেই। বাজী মাৎ। বিজয় গর্ব্বের আভা চোখে মুখে উদ্ভাসিত। ব'সলেন সামনে চেয়ারে। চোখ চাইতে পা'রছিনে তাঁর চোখে। আক্রোশে জ্ব'লে উঠচে মন। সব আক্রোশ আজ বুড়ো আর তাঁর বেটির উপর। হাসি দেখে গা জ্বালা ক'রচে।

"আরে, মন ভারী ক্যান্? মা'গ মনেত্ ধরেনি? না হয় আমাক্ দিয়া দে। বুজ্‌চো?"

ব'ললুম, "এক্ষুনি নিয়ে যান। সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ ক'রে দিচ্চি। ফি-সাবিলিল্লাহ্।"

"ওরে শালা। ওড্যা খালি মুখের কথা। ক'লজা ফা'ট্যা ম'রে যাবি।" এক মুহুর্ত্ত থেমে আবার শুরু ক'রলেন, "আল্লা যা ক'রে তা ভালোর জন্যে। বুজ্‌চো? আসল কথা, চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপাল। বুজ্‌চো? যার সাথে যার জোড়্-বান্ধা আছে তা হোবেই। বুজ্‌চো? চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপালে যখন যা লেখা আছে তা ঘ'টপেই। বুজ্‌চো? একদণ্ড আগে'ও হোবে না, একদণ্ড পরেও না। বুজ্‌চো?"

বুজেচি। বুঝিনি আবার কোনটা? সেই চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপালের পরীক্ষাই তো হ'লো না। হয়তো হ'তো এমন সাত-চাতুরী ক'রে বেকায়দায় ফেলে বিয়ে না দিয়ে আমার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিলে।

স্বাধীনতা নেই ব'লেই কি অদৃষ্ট? ঘটনা-চক্রের নামই কি চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপাল? এই কপাল ভেবে ভেবেই তো দেশটার কপালে আগুন লেগেচে।

বুড়ো সেক্‌স্‌পীয়র্ পড়েননি। নইলে তাঁর মতের স্বপক্ষে বড় দলিল একটি পেশ ক'রতে পারতেন,

"Wiving and hanging goes by destiny."

এখন আমার চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপালে সেক্ষপীরর আর সোক্রাতি স্ত্রীর মত স্ত্রী না জুট্‌লেই র'ক্ষে।

বুড়ো হাঁক দিলেন এবার, "আরে, এ মরি, আয় নারে এদিকে একবার

হাঁক ডাকে এলো মরি। মরি হায়রে। আর সঙ্গে এলো তার ললি বিশাখা, অনসূয়া প্রিয়ংবদা দুইসখী।

হুকুম ক'রলে বুড়ো, "আরে ভাই-ভাতারী, সোয়ামীর পায়েত্‌ ছালাম কর আজকালকা'র ম্যায়াগুলা কিচ্ছু বোঝে না। বুজ্‌চো?" শরম-রাঙা মুখখা নিয়ে এগিয়ে এলো মরিয়ম। গয়না কাপড়ে ঝল্‌মল্‌ ক'রচে দেহখানি। দি পায়ে চুমো দু'হাত ঠেকিয়ে। ওদিকে দুইসখী কুটু মেরে হা'সচে। ব'ল বুড়ো এবার আমায় ছদ্মবিস্ময় নিয়ে, "আরে! তুই শালা ক্যামন্‌ রে! তু কিছুই কবি না? তোর দুই পায়েত্‌ চুমা খা'লো, আর তুই মুখ মুজ্যা ব' থা'কলি! দে না ক্যান্‌ ওর দুই লাল গালেত্‌ চা'র চুমা।" দরজার বাইরে হ চ্ছাড়ি দুটো দম্‌ফেটে মরে বুঝি বা। বেহায়া, বেল্লিক, বেশরম।

ব'ললুম আমি, "প্রকাশ্যে ও-কম্মটি আপনি পারেন।"

হেরে যাবার পাত্র নন তিনি। বল্লেন, "পারিই তো। আয়রে ছুঁড়ি তোর ভাতারের হুকুম। নতুন বাদশাহ্‌। হুকুম কি অমান্য করা যায়? বুজ্‌চো?" এই ব'লে মরিয়মের মাথায় ও গালে হাত ছুঁইয়ে চুমো দিলেন। এর পর এ বস্তা দোওয়া। তারপর নিষ্ক্রান্ত।

পূর্ব্বরাগ আমার চাপা-রাগসহ সেদিনের মতো এই খানেই শেষ হ'লো।

—::—

উনিশ

সন্ধ্যের পর দীপ জ্বেলে আমার প'ড়বার ঘরে ব'সে আছি। মন ঘুরে বেড়াচ্ছে দার্জ্জিলিংয়ের কাঠের বাড়ীটিতে। এই সময় আর একজনও দীপ জ্বেলে ব'সে আছে। আর প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা ক'রছে হয় আমাকে, আর না হয় আমার প্রতিনিধি আমার চিঠিকে। সময় কা'ট্‌চে কি তার? তার বুক ফেটে ধ্বনি উঠ্‌চে, "বাদশাহ, আমার জীবনটিকে উষর মরুভূমির মতো ব্যর্থ কোরে দিও না বাদশাহ।" আমারও জবাব তার কানের কাছে, বুকের কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে, "না, না, ব্যর্থ হোতে দেবো না তোমার আমার জীবন। ধর্ম্ম সাক্ষী, আল্লাহ সাক্ষী।"

ওরে দুর্ব্বল, ক্ষমতা নেই তোর তো কেন দিতে গেলি কথা? কেন এমনি কোরে একটি ফুলের মত শুচিশুভ্র জীবনটি আশায় আশায় রেখে মাটি কোরে দিলি? তার নির্ম্মল প্রাণে ঘটনার পূর্ব্বছায়াপাত যা হ'য়েছিলো বর্ণে বর্ণে ঘ'টে গ্যালো তা। কই, রুখ্‌তে তো পা'রলিনে? তোর পক্ষে যা খেলা, তার কাছে মরণ যে তা।

মিথ্যে সে বলেনি। ব'লতে জানেও না কোন দিন। শুনিওনি কোনও দিন। মনের অপূর্ব্ব জোরও দেখেচি নিজের চোখে। সাংঘাতিক রকমের দৃঢ়-চিত্ততা তার কাজে। বিয়ে সে ক'রবে না অপর কাউকো এ আমি বিশ্বেস করি।

আমি এখন বউ নিয়ে মজা ক'রবো। আর সে রা'ত গোঁয়াবে আমার চিন্তা ক'রে। বাহুপাশে বুকের সাথে মিলিয়ে যাবে একজন। আর এক জন তখন পুরুষের শঠতায় মনোবেদনায় বিলীন হোয়ে যাবে দিনে দিনে। একজন প্রেমের বুলি ব'লবে শত ভাবে, শত ভঙ্গীতে। কুহু কুজনে কর্ণ কুহরকে ক'রবে মধু-ভাণ্ড। আর একজনের তখন বেরুবে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। সে দীর্ঘশ্বাস ফরিয়াদ রূপে উঠে যাবে হুহু ক'রে আল্লার আরশে, সপ্ত-আকাশের স্তর ভেদ কোরে। সেই 'আহ্' ধ্বনি ব্যথিত কো'রবে দয়াময়ের দয়া। মথিত ক'রবে তাঁর অন্তর। মিলনের মধ্যে বিয়োগ-ব্যথার সূত্রপাত হ'লো আমার।

আর এই একজন। একে নিয়েই বা ক'রবো কি? সবাই এক মাপকাঠিতে মেপেচেন তাকে। সুন্দরী সে। নারীর বহু-ভাগ্যে-পাওয়া ঐ গুণই তো বড় গুণ। সব দোষ ঢেকে যায় রূপে। পুরুষ সারাজীবন ভেড়া ব'নে থাকে সুন্দরী নারীর পদতলে। তার আর ভাবনা কি? আর তা ছাড়া, নারীর নিজেরই একটা আকর্ষণ আছে। আর আকর্ষণ আছে পুরুষের চিরন্তন নারী-ক্ষুধার। কিন্তু ক্ষুধা আর সুধা যে এক নয়,—এ চিন্তা করেননি কেউ। শারীরধর্ম্ম আর মনোধর্ম্ম আলাহিদা জগতের কর্ম্ম, সে খোঁজ কেউ ক'রলেন না।

এর উপরে রইলো আত্মার ধর্ম্ম,—নৈতিক ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে একেও গ্রহণ ক'রলুম যে। কিন্তু মনের উপর জোর খাটাই কি দিয়ে? মোনাফেকি দিয়ে? আমার প্রতি কাজে কথায় ধরা প'ড়বো নাকি? ছাই-চাপা-আগুন কত দিন ছাইচাপা থা'কবে?

"ভাইজান, আর কতোক্ষণ ব'সে ব'সে কাটাবে? রা'ত অনেক হ'লো না? মা ব'লচে শুতে যাও।" দরজায় উঁকিমেরে ধমক্ দিয়ে গ্যালো জাঁহানারা।

চ'ম্‌কে উঠ্‌লুম হারিয়ে-যাওয়া গভীর চিন্তার মাঝে আচম্বিতে ধমক্ খেয়ে। টেবিল ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি এগারোটা। সর্ব্বনাশ! আজ আমার ফুলশয্যা বোধ হয়। মনে প'লো তখনি, ফুলশয্যা নয়,—ফুলশয্যা নয়। এত ফুল কোথায় মুসলমানের ঘরে, যে ফুলশয্যা পা'তবে? নবীর নির্দ্দেশ মেনে মুছলমান আর ফুলকে আদর ক'রে চষে কি, যে অত ফুল মিল্‌বে শয্যা পাতার জন্যে? দেবতার পায়ে ফুল দিতে হয় তাই গরজে ফুলের বাগান রাখে হিঁদু। নিতান্ত লৌকিকতায় আর কাজ আদায়ের ফন্দিতে মুছলমান যখন কোনও অফিসারকে তোয়াজ ক'রে গলায় মালা দেয়, তার ফুল যোগায় দেয় হিঁদুর বাগান। এখানে হিঁদু কোথায়? আর থা'কলেই বা অজস্র ফুল দেবে ক্যানো তারা এই নবাবের ফুলশয্যা সাজাতে? না, আমার ফুলশয্যা নয়,—বাসর শয্যা। যা হোক হোক্ একটা। নামে কি এসে যায়। ওদিকে আমার বাসসজ্জা বাসর ঘরে একাকীই বাসর-জাগা হোয়ে রইলো যে। আধেক রাত গ্যালো তার কড়িকাঠ গুণে, উশ্‌খুশ্‌ ক'রে, আর হা-পিত্যেশের হাহুতাশ ক'রে। এতো বড় কাটখোট্টা নির্ম্মম আমি! বুকের মধ্যে যোয়ানী রক্ত তোলপাড়্ ক'রচে না? শিরায় শিরায় আনন্দের আবেগ টন্‌টন্ চন্‌চন্ কোরে

শিহরণ জাগায় না ? কোথায় সে অনুভূতি ? থা'কলে কি অমন কোরে এতোক্ষণ ব'সে থা'কতে পা'রতুম; না, ডাকের আশায় অপেক্ষা ক'রতুম ?

দরকার নেই ওসব চিন্তে করে। আবার হয়তো এখুনি ধমক্ খেতে হবে। ওদিকে রাতের আঁধারে ধারের কোনও জঙ্গল থেকে ডাহুকীর আক্রোশ-ভরা ডাক কানে আ'সচে, ঠ-গ্ ঠগ্ ঠগ্ ঠগ্ ঠগ্। কানে আঙ্গুল দিলুম।

সঙ্কোচ শরম সঙ্গে নিয়ে আঁধারে চুপিসারে এগুলাম 'প্রিয়ার মিলন লাগি।'

ঘরে দীপ জ্বালা। ঠিক্‌রে প'ড়চে আলো সুসজ্জিতা শায়িতা একটি নারী দেহের উপর। সুবিন্যস্ত কেশরাশির বিনুনি অসাবধান শাড়ীর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চেয়ে র'য়েচে উদ্যত ফণা সর্পের মতো বাসর ঘরের রাজপুত্রকে দংশন ক'রতে। নয়তো সোহাগভরে স্পর্শলাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হোয়ে র'য়েচে সে। সযত্ন সজ্জিত শাড়ী ঘুমন্তিনীর দেহে শিথিল হয়নি এখনো। মলিন হয়নি চোখের কাজল। শুধু আল্‌তা-রাঙা রাতুল চরণ দুটো প'ড়ে র'য়েচে অনড় হোয়ে। তবে আর শুধু কমলকোড়কের মতো মুদ্রিত দুজোড়া আঁখিপল্লব দেখে কী ক'রে সিদ্ধান্ত করি তাকে ঘুমন্ত ব'লে ? ঘুমন্ত হোলে তো জীবন্ত হোয়ে উঠতুম আমি। থা'কতো না কোনও ল্যাঠা রাগ অনুরাগ বিরাগের প্রশ্নের। ক্ষণে ক্ষণে ক'রতে হ'তো না অভিনয়। তবু তো উপায়ও নেই কিছু, যা আঁ'কড়ে ধ'রতে পারি এখন।

ঘরের বাতি টিম্‌টিমিয়ে দিয়ে চোরের মতো আস্তে আস্তে শুলুম পাশে। নাঃ, এক নিশ্বাস ছাড়া শব্দ নেই কিছুর। বোধ করি বেঁচে গেলুম। স্পর্শ বাঁচিয়ে স'রে রইলুম। স্পর্শ ক'রবো কাকে ? ভেতর থেকে চোখ রাঙিয়ে কে যে আমায় ব'লচে,

"অপবিত্র ও-কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি ক'রেছো, বঁধু, ও-পরশ এতোই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু আঁখি দিলে ?"

তাই স্পর্শন আর হ'লো না। বইয়ে পড়া বিদ্যে বইয়ে নিবদ্ধ থাকুক যে বিবাহিতা নারীও ধর্ষিতা হোতে চায়। কাজ নেই আমার অমন স্পর্শন ধর্ষনে।

বাপমার ছেলে চুপ্‌চাপ্ শুয়ে থাকি নরম বিছানায়। ঘুম যদি নাই-ই আসে তো মনে মনে গান ভাঁজবো,

এমন মধুর রাতে
নিঁদ নাহি আঁখি পাতে।
কার স্মৃতি হিয়া মাঝে
আঁসু আনে বেদনাতে।
এমন মিলন রাতে ॥

পাশের ইনি এতক্ষণ বোধ করি সুখ-স্বপ্নে রসগোল্লা কোঁৎ কোঁৎ ক' গিল্‌চেন। সেই রকমই গলায় শব্দ হ'চ্চে যেন। চাপা কান্নার শব্দ নয় তো থাকুক্‌গে। অত কৌতূহলী হোয়ে দরকার কি? কিছু পরে জাগ্রত মানুষের মতে ন'ড়ে উঠ্‌লো দেহখানি। তারপর খাড়া হোয়ে আস্তে আস্তে ঠাওর ক'রে খাট ছেড়ে নীচে নেবে যাচ্চেন তিনি। ঘোড়া-স্বপ্নে পেয়ে ব'সেনি তো তাঁকে? ঘুমের মাঝে হাঁটার অভ্যেস্ আছে নাকি? সে যাই হোক্, কিন্তু এখন কথা না ব'লে থাক যায় কি কোরে? ব'ললুম, "বাইরে যাবে? বাতি জ্বালিয়ে দেবো কি?"

রসহীন জবাব, "না, না। বাইরেরও দরকার নাই, বাতিরও না।"

"তবে?"

"আমি নীচে শোব মেঝেতে," ক্যান্ ক্যান্ শব্দে 'কেন? কেন?' ব'লে উঠ্‌লুম, আর ধ'রতে গেলুম তার হাত।

ব'ললে সে, "ছুঁয়ো না। জা'ত যাবে।"

ব্যাগ্র হোয়ে ব'ললুম, "সে কি কথা! আমি ভেবেচি তুমি ঘুমিয়ে প'ড়েচো। হাজার হোক্, ঘুমন্ত-মানুষকে তো আর ... ...

আমার অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত ক'রলেন তিনি, "চিবিয়ে খেয়ে কাজ নাই জাগ্রত অবস্থায় তিলে তিলে মাথাটা চিবিয়ে খাওয়াই ভালো। এই না?"

"হঠাৎ তুমি অবুঝ হোয়ে রাগ ক'রচো, মরি! তুমি যে আমার......"

"জীবনের জীবন, ক'লজের টুক্‌রো। ব'লে যাও।"

"আহা-হা। তুমি বড্ড রেগে গ্যাচো। কি, হ'লো কী তোমার? ধীরে সুস্থে বলো না কথাগুলো।"

"আমার ব'লেও কাজ নাই, শুনেও কাজ নাই, বুঝারও বাকী নাই শোনারও বাকী নাই।"

বাহ্ ! কিছুই বাকী নেই, সব নগদ কড়ায় গণ্ডায় শুনেচে বুজেচে। তা'হলে শুনেচে কি ? বুকের ভেতরে ধক্ কোরে উঠ্লো। দোষী মন পাতা ন'ড়লে ভয় পায়।

উদ্বিগ্ন মুখে ব'ললুম, "শুনেচো কি ? যা শুনেচো মিথ্যে মিথ্যি শুনেচো। একেবারে ভয়ানক রকমের ... পাড়াগাঁয়ে শত্রুর তো অভাব নেই। আর মেয়ে মানুষের বড় শত্রু মেয়ে মানুষ। এসো দিকিন্। ভাল্-মানুষের মতো শোও কাছে, আর রা'ত ভর গল্প করো। আরে ছি, ছি। আমি ভাবলুম তুমি ক্লান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েচো।"

"যদি ঘুমিয়ে প'ড়তাম অত রা'তে, তো কি দোষ হ'তো ?"

"মোটেই না। বরং তাই ছিলো স্বাভাবিক।"

"তুমি মনে প্রাণে চাইছিলে তো তাই। যেন যাকে ভালোবাসি না তার সঙ্গে কথা ব'লতে না হয়। তাই তো আলো সা'মনে রেখে গালে হাত দিয়ে প'ড়বার ঘরে কাটিয়ে এলে অর্দ্ধেক রা'ত।"

"আরে কপাল। তুমি চুপ্ কোরে দেখেই এসেচো যদি, তো ডাকোনি কেন ? আমি একটি গল্পের প্লট্ নিয়ে তন্ময় হোয়ে ছিলুম কিনা।"

"তার চেয়ে আমাকে শেষ করার প্লট্ তৈরী করাই সহজ হ'তো।" সবই গরমাগরম।

"ছিঃ। কি যে বলো তুমি। তুমি এতো গরম হোয়ে আছো যে কিছু বুঝতেই চাইচো না। মিছেমিছি রাগ ক'রো না মানিক। তোমায় পেয়ে আমি আকাশের চাঁদ পেয়েচি। আমার কল্পলোকের রাণী তুমি। তাইতো আমার কল্পনায় আজ জোয়ার চেপেচে। এতো জোয়ার যে তার ঠ্যালায় গল্প ফাঁ'দতে ব'সেছিলুম।"

"মিথ্যে কথাগুলো ব'লতে জিভ্ আট্‌কালো না ? বিয়ে ক'রতে চাওনি আমায়।"

বললুম চোখ মুখ বিষ্টে ক'রে, "এই তুই পাজী জয়নাব জ'াহানারাই যত নষ্ট গুড়ের খাজা। বিয়ে তোমার সঙ্গে আমার হবেই এতো রোজ-এ-মিছাকে ওয়াদা করাই ছিলো;—যখন তোমার রুহ্ আমায় জিজ্ঞেস ক'রেছিলো, 'আমাকে কি তুমি

তোমার জীবনের প্রিয়তমা ব'লে স্বীকার করো?' ব'লেছিলুম, 'বালা—হঁা তা নিয়ে কথা নয়। কথা হ'চ্চে এম-এটা পাশ কোরে বিয়ে ক'রলে তোমা গৌরব কি বা'ড়তো না? নইলে বিয়ের দিনেই তো যে কারুর বি-এ পাশ হো যায়। আমারও, তোমারও।"

যুক্তিটা মনে যেন ধ'র্লো। ঠাণ্ডাও হোয়ে এলো একটু ব'লে ম হোলো। কিন্তু ব'ললে, আগের চেয়ে কিছুটা নরম হোয়ে,

"বেশ্ মেনে নিলাম। কিন্তু গল্পটা কি তৈরী ক'রছিলে শুনি ? ততক্ষণে শুয়েচে পাশে।

"এক যুবককে দুই ষোড়শী সপ্তদশী ভালো বেসেচে। নায়ক দোটানা প'ড়েচে, 'ডাইনে আমি তাকায় যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন'-অবস্থা। সে এ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। মিলাতে পা'রচিনে।"

"বেশ্ তো। একজনকে গলায় দড়ি দেওয়াও, বিষ খাওয়াও, না হ পাগল উদাসীন বানাও; যদি খুব মমতা হয় মেরে ফেল্‌তে। আর এ দেশে মে মানুষকে মেরে ফেলা আর বড় কথা কি। ও তো মলমূত্রের চেয়েও সস্তা। উপ করণ তো সহজ, দড়ি, বিষ, কেরোসিন তেল, পেট্রোল। ব্যস্।"

ব'ললুম দয়ার অবতার সেজে, "দূর্! ও তো অমানুষের কাজ। তা কি হয়?"

ব'ললে সে, "তোমার নায়কটা হিন্দু, না মুছলমান? মুছলমান হয়তে শুধু দুটো কেন, আরও তো দুটো ঘর খালি থাকে। দরকার নাই কাউকে নিরা কোরে। উভয়ের প্রেম সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াও না নায়ককে?

এক মিনিট চুপ থেকে ব'ললুম, "তোমার সাহায্যই নিতে হবে দেখ্‌চি লিখ্‌তে শুরু কোরে দিই, কি ব'লো?"

মাথাটি একটু উঁচু কোরে যেন মুখে কি দেখতে চাইলে। প্রায়-আঁধা কিছু পেলে কিনা সেই জানে। প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস ক'রে ব'সলে, "তার আগে বলো দিকিন, জীবনে কত জনের সঙ্গে প্রেম ক'রেচো?"

তাড়াতাড়ি তার গায়ে হাত দিয়ে ব'ললুম, "এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ মাইরী, একজনের সঙ্গে।" তারপর গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কথা শেষ ক'রলুম

"এবং সে একজন, তুমি। তবে প্রেম করিনি, প্রেমে প'ড়েচি।" আর বিশ্বেস না কোরে যায় কোথায়? পাগল নাকি! মেয়ে মানুষের কাছে সত্যি কথা ব'লে অশান্তিময় জীবনটাকে আরও অশান্তিময় ক'রবো? সেক্‌স্‌পীয়র পড়িনি? সেই যে তিনি বলেন, 'আমার প্রিয়তমা যখন বলে গলা ধ'রে, ওগো, তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।' মুখে বলি, 'সে কি আর জানিনে, জীবন।' মনে মনে বলি, 'ছলনাময়ী, তোমার নামই নারী।' একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লো। তা হোক্ গে। আমার প্রয়োজন-পূরণ নিয়ে কথা। ছলনা দিয়েই ছলনাকে কাবু ক'রতে হয়। আমার অপ্রিয়ংবদার সুর খুব নরম হোয়ে এসেচে। না হোয়ে উপায় আছে? যে মন্তর্ ঝেড়েচি! একেবারে তা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল না করিয়া ছাড়ে? মেয়ে মানুষের মোক্ষম দাওয়াই ওটি।

আনন্দে এবার বাতির আনন্দ বাড়িয়ে দিলুম। ঘর আলোময় হোয়ে গ্যালো। আর আলোময় হোয়ে গ্যালো আলোময়ীর সাজসজ্জা। একেবারে বিজলীর মতো চমক্ দিচ্চে গো।

এবার ব'ললেন আমার চমক্‌ময়ী, "তা থা'ক তোমার প্লটের কথা। গল্পের ভাষাটা কি হবে শুনি তো? তোমার কথার ভাষার মতো ধার করা হবে তো?

বিস্ময়ে ব'ললুম, "মানে?"

"এই যেমন 'নেই মেই, এলুম গেলুম, হালুম হুলুম, কারুর মারুর, অ্যাঁব কাঁ্যাঠাল ইত্যাদি যা নিজের দেশের লোকে বলে না অথচ এমনি অন্ধ অনুকরণ-প্রিয় আমরা যে বিদেশ থেকে কথ্য ভাষা ধার ক'রে এনেও সাহিত্য তৈরী ক'রছি। তা সে ভাষা সে দেশের কুলি কামারেরই হোক আর ডোম মেথরেরই হোক।'

বারে! আমার চমক্‌ময়ী চমক্‌ময়ীই বটেন। চাবুক চালাতে জানেন দেখচি। বেশ খোঁচা দিলে আমাকে। এবং সঙ্গে জড়ালে ধৃষ্টতার সাথে আমার চেয়ে বিরাট বিরাট দিক্‌পালকে। নিজে ক্ষুণ্ণ হোতে পারিনি। বললুম, "ও, বুঝেচি! দীর্ঘদিন ক'লকাতায় থেকে কথাগুলোর ধরণ-ধারণ আমার রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গ্যাচে। ভালোও লাগে।"

ব'ললেন আমার সমালোচক, না, না,—নিন্দুক, "ওটা ভালোলাগা নয়। কৃষ্টিগত পরাজয়ের মনোভাব,—মানসিক দাসত্ব। এবার ছা'ড়তে হবে।"

বিশ

ছোট বেলার রাজশাহী জেলায় নানাবাড়ী গিয়ে শুনতুম সে দেশের ছেলে মেয়েদের ছড়া কাটা। একজন আর পাঁচজনের মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে গণনার ভঙ্গীতে ছড়া ব'লতো,

'আদিলো ফাঁদিলো কুকুরে টানিলো,
বগা বগী ফাঁন্দিতে মরিলো,
টান্নুস্ টুন্নুস্ ফাশ্ ফিশ্
এ্যানা ত্যানা ধানের শীষ
কেলে ঢোঁড়া উনিশ্ বিশ্।'

ছন্দোময় দুনিয়ায় ছন্দোবদ্ধ কথা মানব মনের স্বাভাবিক চাহিদা। ছেলে বুড়ো বাদ নেই এতে। ছেলেদের ছড়া, বুড়োদের শ্লোক। এ দুটো তৈরীও করে এরা নিজেরা। রবিঠাকুরও নন্ নজরুলও নন্। বাচ্চা বয়েসেও কবিত্ব ভর করে পাড়াগাঁয়ের কোনও কোনও মুর্খ ছেলে মেয়ের মাথায়। মানে বুঝিনি তবু ভালো-লাগে। যারা রচনা ক'রেচে তারাও বুঝেচে কিনা তারাই জানে। আজ এতটা বয়েসে আজও ভালোলাগে। আজ দুঃখে প'ড়ে মানেও একটা খাড়া ক'রেচি ঐ ছড়াটির।

মনোদুখে আপন মনে নিরালায় চিন্তা ক'রতে গিয়ে মনে পড়ে ছড়ার কথা, আর ভেসে উঠে মনের পটে একটি নিরুপায় বগার ছবি। ব্যাধ ফাঁদ পেতেচে। বগা বগি ফাঁদের ফাঁসে গলা আ'টকিয়ে বাঁ'চবা'র জন্যে টানাটানি ক'রতে গিয়ে মারা পড়ে। পরে কুকুরে টা'নতে থাকে তাদের মৃতদেহ। সে আজ কতদিনের কথা। কত উনিশ বিশ বছর কেটে গ্যাচে। এই সময়ে কতবার ধানের শীষ মাঠে দেখা দিয়েচে। সেই ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে কত কেলে ঢোঁড়া সাপও দ্যাখা গ্যাচে। কিন্তু তবু ভোলেনি কৃষককুল বগাবগির করুণ পরিণতি।

দেখতে দেখতে আমারও তো উনিশ বিশ পেরিয়ে গিয়ে সোওয়া বিশের কোঠায় প'ড়লো জীবন মাপকাঠি। আমরা বগাবগি এক সঙ্গে মরিনি। জীয়ন্তে-

-মরা হোয়ে দু'জনে দু'জায়গায় ছিঁটকে প'ড়েচি। সেও আজ দেখতে দেখতে ক'বছর হোয়ে গ্যালো। বুকের ঘা তো শুকালো না। আজ আব্বাস উদ্দিনের গলায় কুচবিহারের ভাওয়াইয়া গানের একটী চরণ মনে প'ড়ে,

'ফান্দে পইর‍্যা বগা কান্দেরে।'

ফাঁদে প'ড়ে বগা আজ ক'বছর ধরে কাঁ'দচে। এমন ফাঁদে প'ড়েচে যে মরণ ছাড়া মুক্তির আর কোনও পথ নেই। জীবন নাট্যের অভিনয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ঘাড় ধারয়ে কৌতুক অভিনয় করিয়ে নিচ্চে সেই বগাকে দিয়ে, হাসির অবতারণা ক'রতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বুকখানা যার কান্নায় ক্ষত বিক্ষত হোয়ে যা'চ্চে। তবু অভিনয় ক'রে চ'লেচে সে নির্ভুল। পাকা কমেডিয়ানের মতো। বুক ঝুর্‌চে, মুখ হা'স্‌চে তবু হা'সতে গিয়ে সময়ে সময়ে কেঁদেও ফেলি।

আমার তবু যা হোক অভিনয় ক'রবা'র একটি উপলক্ষ্য, একটি অবলম্বন আছে। আর তার ?

খালেকের ঠিকানায় শেষ যে চিঠি পেয়েচি, প'ড়েচি ও পুড়েচি তাতে নূতন সংবাদ কিছুই নেই সেই মনমায়া মায়াহীন রাক্ষুসীর।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং সে। বা'ড়তিও নেই ক'মতিও নেই। বা'ড়তি ক'ম্‌তি হরেক রকমের সংবাদ যা কিছু তা এই পরম সাধু প্রবরের।

অথচ হরেক রকমের সংবাদ দিতে বসিনি আমি আমার এই খণ্ড জীবন কাহিনীতে। আমার কর্ম্মজীবনের ডায়েরী লিখা আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনের দুটো দিক্ নিয়ে আমার যে জীবনাংশটুকু কোনও সময় আমার 'আমিকে' রাঙিয়ে তুলেচে, কোনও সময় দুনিয়াকে তেতো বিস্বাদ কোরে দিয়েচে, তাই আমি শুধু ব'লতে চাই। নইলে তো আমার আত্ম-কাহিনী হোয়ে দাঁড়ায় সন তারিখসহ লম্বা ঘটনার ফিরিস্তি।

জীবনের দু'টি পর্য্যায়ে প'ড়ে র'য়েচে আমার দু'টি উদ্দেশ্য শক্তি। একটিতে প্রেম, অপরটিতে কাম। প্রেম রইলো প'ড়ে উঁচু পাহাড়ে। আর কাম হোয়ে রইলো আমার জীবনসঙ্গিনী। আমার কামের পূজো দিতে দিতে মাত্র ক'বছরেই উপর-ভর্ত্তি হোয়ে গ্যালো বাসা-বাড়ী। ভ'রে উঠলো গৃহ কল-কাকলীতে। সম

নেই অসময় নেই অমৃতং বাল ভাষিতং কানের কাছে শুনতে শুনতে দুএক সময় মনে হয় নিজের মাথা নিজে ছিঁচে দিই।

মায়ের পেট থেকে কান-মোচ্‌ড়া এক মেয়ে জন্মেচে। দুলালীর দিকে চাইলেই পিতৃস্নেহ তৃপ্তিতে জ'মে পাথর হোতে চায়। ও কান-মোচ্‌ড়া দেয়া তো নন্দিনীর নয়,—আমার। বছর চৌদ্দ পনেরো পর, আল্লার দয়ায় যদি বেঁচে থাকে ততদিন,—আর থা'কবেই না বা ক্যানো, মুরুব্বিদের দোওয়ার জোর আছে,—তাহ'লে জামাই খুঁজতে রোজ কান-মোচ্‌ড়া খাবো। বিয়ে না দিয়েও তো আর থাকা যাবে না? নিন্দে হবে, সন্দে হবে। যেমন কোরেই হোক পরের ছেলেকে ধ'রে আনতে হবে। আর ধ'রে আ'নতে হবে নেহায়েতই পরের ছেলে। মরিয়মের চাচাতো বোনই নেই,—ছেলে তো দূরস্তান। কাজেই আমায় কান-মোচ্‌ড়া দিয়ে নেহায়েতই পরের ছেলে, নিতান্ত কৃপাপরবশ হোলেও, পনেরো বছরের মেয়ের জন্যে পনেরো হাজার না নিয়ে আর ছা'ড়বে আশা করা যায় না। এতো নিতান্ত আশা-বাদীর বেঁচে থা'কবার মতো একটি নিরুপায় আশা, Pious hope.

আম্মা এবং শ্বাশুড়ী-আম্মা'র দো'ওয়ার যে জোর আছে একথা মা'নতেই হবে। নইলে দেড় বছর পর পরই একটী নন্দন পারিজাত—বেশীর ভাগই নন্দিনী—ঘর আলো ক'রতে লা'গলো এ কি ক'রে সম্ভব? নানা বলেন গৃহিনীকে 'বছর-বিয়ানী।' বাংলার মাটির মতো উর্ব্বরা বাংগালিনী। বীজ প'ড়তে না প'ড়তেই গাছ গজায়। এজন্যে তাঁর এতোই দেমাগ যেন আমার চৌদ্দপুরুষকে কৃত-কৃতার্থ কোরেচেন। ছেলে ধ'রবার জন্যে চাকর দাসীকে হুকুম কোরতে গিয়ে আমাকেই মেজাজের সঙ্গে হুকুম কোরে বসেন। কান-মোচ্‌ড়া মেয়েটার জন্যেও কিছু ব'লবার যো নেই। দোষটা যেন সব আমারই। মেয়ে মানুষ হোয়ে ছেলে আবার পেটে ধরে না কে? তাই ব'লে দুপুর রাতে ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না শুনে আমাকে হুকুম ক'রতে হবে ধমকের সাথে, 'পেচ্ছাব-ভেজা সপ্‌সপে বিছানা পা'লটিয়ে ছেলেকে ঘুম মাড়াও?' ফকির চাঁদের মতো আমিও গৃহত্যাগী সন্ন্যেসী হবো নাকি?

আজ আর আম্মা আর শ্বাশুড়ী-আম্মাকে পাওয়া যায় না। দোওয়ার বেলায় দুয়ার খোলা। দোওয়ার দেউড়ীর দরজা তো আর বন্ধ থাকে না?

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ছোটো খাটো একটা হাকিম হ'য়েচি। এ
সৈয়দ আকবর হোসেনের আর তাঁর আত্মীয়স্বজনের কতটা ইজ্জত বেড়েচে সে খব
তাঁরাই ব'লতে পারেন। আমার তো বেইজ্জত হ'তে বাকী নেই। যে পরিমা
পদের নাম, দাম তো সে পরিমাণে বাড়েনি। অথচ সকাল হোলেই ইয়ার ব
আসেন নিতান্ত নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ মহব্বত নিয়ে। আমিই বা অনুপানসহ সামা
এক কাপ চা না দিয়ে এরূপ বন্ধুত্বের বেকদর করি কি কোরে? আসেন দূরাত্মী
দূরত্বের ব্যবধান ঘোচাতে, পর পরিচয় নিতে। দূরাত্মা আমি, তাই এগুলোকে
দৌরাত্ম্য মনে করি। মনে যাই করিনে কেন, কিন্তু গোশ্‌ভাত না দিয়ে পারিনে
হাকিম হোয়েচি যে। লৌকিকতা, ভদ্রতা, মেহমান-নওয়াজী পদমর্য্যাদা মাফিক
হ'তে হবে তো?

এদিকে তুহপ্তাহ্ যেতে না যেতেই বেসিক্ পে'র সামান্য মূলধন বেশ
হাওয়া হোয়ে উড়ে যায়। তাহ'লে রোজ রোজ দামী শাড়ী আর রকমারী গয়না—
এক থা'ক্‌তেই আর— কোত্থেকে যোগাবো? এদিকে বুকের দুধও দেবেন ন
তিনি বুকের ছেলেকে। নাকি দুধ শুকিয়ে গ্যাচে, হয় না। আবার এও শুনি
প্রায়ই কী সব ওষুধ পত্তর জাড়বড়ি ক্রিম পমেটম্ ব্যবহার করেন চাম্‌চিকে বাদুর
মার্কা বক্ষসৌষ্ঠবকে প্রথম দিনটির মতোই সতেজ, সুডৌল ও স্বাস্থ্যবান ক'রতে
তাই তো দেখি কোয়াক্‌দের ওষুধপত্রের মনোজ্ঞ, সুবিস্তৃত, সচিত্র, সবিজ্ঞাপন তালিক
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধ করি ছাব্বিশ ঘণ্টা ধর্ম্ম গ্রন্থের মতো মনোযোগের সঙ্গে
ধ'রে থাকেন। দেশ বিদেশে অর্ডার যাচ্চে, আমি ভি-পি ছাড় কোরে নিচ্চি
বাছাধনদের জন্যে রবিন্‌সন্ হর্‌লিক্স, মল্‌টেড্ মিল্ক ইত্যাদির কৌটোয় বাসাবাড়ী
ছোট্টঘরখানা গুদাম ঘর হোয়ে গ্যালো। বাছারা আমার যেরূপ বিজলীর তার হোয়ে
যাচ্চে দিন দিন, তাতে তারা যে প্রতিভাধর ও শক্তিধর হবেই এবং মেয়েরা ভাবে
বর আকর্ষণ ক'রবেই এতে আমার সন্দেহ নেই।

মানি, স্ত্রীর আয়েব প্রকাশ করা যেমন তেমন কথা নয়,—একেবারে বেশ
কবিরা গুনাহ্। বলি কি সাধে জনাব। চেপে রাখারও একটা সীমা আছে।

হাকিমের স্ত্রী, গুণাগুণ যাই থা'ক, বালিকা বিদ্যালয়ের উৎসবে, মহিল
সভায় সভানেত্রী হোয়েই থাকেন, পদাধিকার বলে ও স্বামীগত অধিকারে; এ আম

বড় কথা নয়। 'যাঁর মাথায় পাগড়ী, তাঁর কথা আ'গড়ী।' সে সভায় পেশকারের স্ত্রী, নাজিরের স্ত্রী যাবেন এও তাঁদের জন্মগত ও রাষ্ট্রগত অধিকার। তাঁরা যদি হাকিমের বেগম সাহেবার চেয়ে দামী কাপড় চোপড় আর গয়না প'রে গজেন্দ্র গমনে গিয়ে সভা আলোকিত করেন তো তাতে হাকিমের অপরাধ কোথায়? নাকি 'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। কম মাইনে ও পদ মর্য্যাদার বিবিরা গর্ব্বে ও আনন্দে আপন মনে ব্যাঙের মতো ফুলতে থাকে। আমি কারো দিকে চাইতে পারিনে লজ্জায়, নিজের দেহের দিকে চেয়ে। ছেলে পুলেগুলোকেও আর সঙ্গে নিয়ে যাবো না! অমন ভিখিরীর ছেলেপুলেগুলো পট্‌পট্‌ কোরে ম'রে যেতো।' রাগে পুরাণ কাহিনীর দুর্ব্বসাকেও হা'র মানান।

নেও ঠ্যালা। আরে বাপু, তাঁদের কম মাইনেটাই তুমি দেখতে পাও, উপরিপাওনাটা দেখতে পাও না? চা'ক্‌রী কোরেও মাস মাস বাড়ী থেকে টাকা আ'নবো নাকি? এতে আব্বার মুখ সমাজে ছোট হোয়ে যাবে না? আর নিজেরও চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা, যাই হোক্‌, এখনো অবশিষ্ট আছে।

দিন রাত খুঁত্‌ খুঁত্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ প্যান্‌ প্যান্‌ আর সহ্য হয় না। 'কই, আমার আব্বাও পুলিশের চা'করীতে সামান্য মাইনে পেতেন, তাতে তো আমাদের ভাইবোনদের রাজার হালে চলার কোনও অসুবিধে হয়নি? ছোট থেকে যে পরিবেশে মানুষ হোয়েছি, লোকে মনে করে স্বামী পেলে আরও সুখে থাকা যায়। কিন্তু এমনি আমার কপাল।'

কপাল একখানা আমারই বটে। অনেক চিন্তার পর নূতন জীবন-দর্শনের দেখা পেয়েচি। কপাল টপাল অদৃষ্ট ফদৃষ্ট বরাত্‌ ফরাত্‌ কিছু নয়। তদ্‌বির কোরেই কপাল বদ্‌লাতে হয়। 'তু মুসলমাঁ হো তো তদ্‌বির হ্যায় তক্‌দির তেরী।' কবি ইক্‌বালের কথা। নস্যাৎ করা যাবে না।

খুব চিন্তার পর একদিন বাসায় ডা'কলুম ছোক্‌রা বয়সী পেশকারটিকে। ব'ললুম, "ত্যাখো হে, আজকাল দিন কাল বড় ইয়ে হোয়ে প'লো। মানে, একেবারে ইয়ে আর কি ... কোনও ধনী মানুষ যদি আসামী হোয়ে আসে, তাহ'লে সে দিকে তুমি একটু ইয়ে করো। বুজ্‌লে না?"

বেশ চালাক ছোকরাটি! চট্‌পট্‌ স্বস্তি-বাচক জবাব দিলে, "জি হুজু
এখন থেকে সংসারের জন্যে আপনি আর কোনও চিন্তা ক'রবেন না।"

বাস্তবিকই। সেদিন থেকে সংসারের জন্যে চিন্তা ক'রতে হয়ওনি কে
দিন। দোওয়া করি আমার পেশকারটিকে। বড়লোকের ভুঁড়ি টিপে ট
বের করার কায়দাও অনেক শিখেচি।

মরিয়মের মেজাজ আজকাল অনেক ভালো। প্রায় রোজই পাউডার মি
শাড়ী প'রে সিনেমায় যায়। তবে একটি ব্যাপারে কিছুটা খ্যাট্‌ খ্যাট্‌ করে।

বাসায় নূতন অল্প বয়সী ঝি। 'ঝি' মানে মেয়ে। কিন্তু তাৎপর্য্যের অ
পতনে 'ঝি' আর মেয়ে নেই, যেমন 'সৎমা' আর সৎমা নেই। হোয়ে গ্যা'চে
উল্টো। তাই নববিধানে ঝির নাম হোয়েচে 'আয়া'। কিন্তু আয়া ব'লতে গ
বাধে, চোখে পানি আসার উপক্রম হয়। মনে পড়ে মায়ার কথা, 'একদিন আ'স
তোমার এই মায়ার দেশে ছেলেপুলে নিয়ে। তাদের আয়া হবো আমি।' বুকে
ভেতরে রক্তের আখরে দাগ কেটে আছে কথাগুলো। আয়া ব'লতেই মায়া হাজি
হয়। তাই আয়া ডাক আর ডা'কতে পারিনে। এটা দুর্ব্বলতাই বলুন, অ
স্নায়ুবিকতাই বলুন, আর ভাবাবেগই বলুন। তা পণ্ডিতদের মতে সবাই নাকি ব
বেশী স্নায়ুবিক। আমি আয়া নামে চ'ম্‌কে উঠি, আপনি জোঁকের নামে শিউ
উঠেন, তিনি ব্যাঙের নামে আঁৎকে উঠেন। আমি ঘন ঘন পান চিবোয়, আপ
ঘণ্টায় ঘণ্টায় সিগারেট টানেন, তিনি মিনিটে মিনিটে নস্যি নাকে পোরেন।
ঐ একই কথা। সবই স্নায়ুবিকতা। আমার কথা নয়, যাঁরা বলার অধিকা
তাঁদের। তবে আর লজ্জা কি?

কিন্তু লজ্জার ব্যাপার সত্যি ঘ'টেচে। ঝিকে বলি, 'দ্যাখো, শুনো, শুন
পাচ্চো, খোকা কাঁদে, কোলে নিয়ে বেড়াও।'

বেগম সাহেবা একদিন ধ'রে ব'সলেন, 'আয়ার সঙ্গে কে অমন ভাবে ক
বলে? আয়াকে আয়া ব'লতে পারো না? কথা বলো যেন ঘরের বিবি। তো
গতিক সতিক ভালো না। এ ঝিটিকে বিদেয় ক'রতে হবে। সমোখ ছুঁরির।
বলন ঢং ঢাং দ্যাখো না! একেবারে শিং-ভাঙা দামড়ার মতো বুক উঁচু বে
চলে। আমারও একদিন ... ...।'

লজ্জায় মাটির সনে মিশে যেতে চাই। মাথার মধ্যে একটি খেয়াল মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। খুন ক'রবো, নয়ত নিজে খুন হবো। ঠাণ্ডা সময়ে মাথা ঠাণ্ডা কোরে ভাবি 'পরিবেশ।' হয়তো বিবাহ-পূর্ব্ব জীবনে পুলিশ লাইনে এমন ঘটনা দেখে থা'কবে বা শুনে থা'কবে। তার উপর গুরুমন্ত্র কানে কানে পেয়েচে, 'পুরুষরা ভোম্‌রার জা'ত। চোখে চোখে রা'খতে হয়।' আমারও জ্ঞানোদয় হ'য়েচে। সেদিন থেকে আয়াকে ইংরেজী 'বেটি' বলি। গিন্নি হয় তো কিছুটা আশ্বস্ত। আয়া একটি সাধারণ কথা হ'য়েচে প্রচলনের জন্যে। মজুরকে মজুর ব'ল্লে দুঃখ পায়। আর সে পাবে না কেন? ছোট বেলায় মদনমোহনের শিশু শিক্ষায় শিক্ষা লাভ কোরেচি, 'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে মনে দুঃখ পায়।'

—::—

একুশ

ঘেন্না ধ'রে গ্যালো, ঘেন্না ধ'রে গ্যালো। কামের সেবা ক'রতে ক'রতে জীবনের উপর বীতরাগ এলো। এরই নামই কি বিবাহিত জীবন? সন্তানাদি নাকি বিবাহিত জীবনকে সিমেণ্ট-গাঁথুনীর মতোই মজবুত করে। প্রেম ও কামের মাঝখানের নাকি ব্রিজ্ ওরা। মন আমার শুধু পালাই পালাই ক'রচে। নিজকে নিজে বহুবারই দোষাই। কিন্তু ভালোবাসার উপর জোরও ক'রতে পারিনে। তবু এমনি কোরেই কেটে গ্যালো আরও ক'বছর।

কেটে তো যাচ্ছে, কিন্তু শরীর ও মনটা যে বুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত তালে। এমন জীবন নিয়ে প্রাণটাকে কতদিনই বা সবুজ রাখি।

আমার মরুভূমির মাঝে একটি মরুদ্যান হ'চ্চেন আমার উর্দ্ধতন অফিসার,— মহকুমা হাকিম। বাইরের বহু কাজের ভারই তিনি ভালোবেসে ন্যাস্ত করেন আমার উপর। ছোট ভাইয়ের মতোই দ্যাখেন আমায়। আমিও সানন্দে বাইরের

কাজ কোরে যাই। ব্যস্ত থা'কতে চাই। ঘর থেকে বাহির-ই যে ভালো আমার। তবু ঘরকে দুদণ্ড ভুলে থা'কতে পারি। অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হ'চ্চে প্রচুর।

একদিন গেলুম একটি স্কুল পরিদর্শন ক'রতে। প্রতি ঘরের আনাচে কানাচে ও কোণে কোণে স্তুপীকৃত জঞ্জাল দর্শকের অনিচ্ছুক দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রবার জন্যে হাঁ কোরে তাকিয়ে র'য়েচে। বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "শিক্ষক হোয়েও এমন অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনা কেন জমিয়ে রেখেচেন? এতে টি-বি জার্ম্, আরও কতো ব্যাধিকীট থা'কতে পারে।"

একজন সহকারী শিক্ষকের আস্পর্দ্ধা কতো! লোকটি দুঁদে দুর্ম্মুখ। বল্লেন কি, "স্যর্, ঐ জার্ম্গুলো খেয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। নইলে অনাহারী শিক্ষকের গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপুলে নিয়ে গাধার মতো হজমশক্তি থা'কলে খিদের জ্বালায় হয় চুরি ডাকাতি ক'রতে হ'তো, নয় তো সব সাবাড় কোরে নিজেকেও বিষ খাইয়ে সাবাড় কো'রতে হ'তো।"

আমি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলেচি তাঁর দিকে। প্রধান শিক্ষক তাঁর হোয়ে ক্ষমা চেয়ে বল্লেন, "ওঁকে মাফ করুন স্যর্। ওঁর মাথার স্ক্রু একটু ঢিলে।"

ব'ললুম, "বিদেয় করুন ওঁকে, বিদেয় করুন।"

ব'ললেন তিনি, "ক'রতাম এতোদিন। কিন্তু ছেলেপুলেদের দিকে চেয়েই ...। বড্ড গরীব। এক ছটাক জমিজমা নাই।"

দুপুরের খাওয়াটা ঘটা ক'রেই সমাধা হ'লো। পোলাও কোর্ম্মাতো মামুলী কথা। সবই ছিলো।

কপট বিরক্তি ও উপদেশের সঙ্গে ব'ললুম, "এ সব কার টাকায়? গরীব দেশে যেখানে কোটি কোটি লোক না খেয়ে কাতরাচ্চে, যেখানে লোকে সম্বৎসরে একখানার বেশী কাপড় প'রতে পার না, যেখানকার লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগে কঙ্কালসার; নেই চিকিৎসা, নেই পথ্য, সেখানে পোলাও কোর্ম্মা ক্যানো? শুধু দু'টো ডা'ল ভাতের ব্যবস্থা ক'রলেই তো হ'তো।"

নিজের বক্তৃতায় নিজেই মুগ্ধ হোয়ে গেচি। ধারে পাশে যাঁরা শুনছিলেন মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার এই উদার মনোভাব প্রকাশে। মনের তলায় হা'তরে দেখি, সেখানে 'আমি' পুরুষটি পরম তুষ্ট এই লোভনীয় খাবার ব্যবস্থায়।

সেক্রেটারী ব'ললেন, "স্যর্, আপনার মতো উদারচেতা সব অফিসার হোলে তো আমরা ধন্য হোয়ে যেতাম। ত্রুটি তো পদে পদে। তাতেও ভয় হয়, কবে বুঝি বা স্কুল বন্ধ হোয়ে যায়।" জোঁকের মুখে নুন্ পড়ার অবস্থা আমার।

বিকেলে স্কুল প্রাঙ্গণে বিরাট ধর্ম্ম সভা। সভাপতি আমি ছাড়া আর কে? নাম করা ছোল্‌তাম্বুল্‌ওয়ায়েজিন্ শাহীন্‌শাহে মুবাল্লেগীন্, এমামুল্ আরেফিন্ হজরত শাহ্ ছুফী জনাব মাওলানা ছাহেব দামাজিল্লুহুম ও ফয়জুহুম তক্‌রীর ফরমাতে লা'গলেন। কোরাণ হাদিছ থেকে আরবী এবারত উদ্ধৃত কোরে সুললিত ভাষায় সাড়ে সাত ঘণ্টা শ্রোতাদের হাসালেন, কাঁদালেন। বোঝাতে সক্ষম হ'লেন তিনি, দুনিয়া কিছু নয়। টাকা পয়সা হাতের ময়লা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সবই দজ্জালের আলামত। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই শুধু আল্লার এবাদত নামাজ রোজা হজ্ জাকাতের জন্যে। পর্দ্দা পায়খানা বিবি তালাকের ফাত্ওয়া কিছুই বাদ গ্যালো না। সর্ব্বশেষে বেহেশ্‌তের হুরীর বর্ণনা শুনে শ্রোতারা আনন্দিত চিত্তে বাড়ী রওয়ানা হ'লো।

সভাপতির ভাষণে যা ব'লেছিলুম তাই নিয়ে আজও ভাবি। সে কি উদ্দী-পনাময়ী ভাষণ। মুখে খই ফোটে। সবাই ধ'রে নিয়েছিলো এছলাম ধর্ম্মের খাস্ রূহ্ ধারণকারী আমি, একেবারে ধর্ম্মাবতার, রুহুল ইস্‌লাম। মাগ্‌রিবের নামাজের সময় প্যান্ট্ খুলে লুঙ্গী প'ড়েচি। গায়ে শার্ট, গলায় নেক্‌টাই। মাথায় ফেল্ট্ হ্যাটের বদলে কিস্তি টুপী। খাশ্‌খুশ্ কোরে ধারের লোকে আলোচনা ক'রচে, "চাকুরির খাতিরে ওসব খৃষ্টানী পোষাক বাধ্য হোয়ে প'ড়তে হয়। নইলে এ রকম এছলাম-ভক্ত অফিসার আর হয় না।"

একদিন বিচারের এজলাসে ব'সেচি। আসামীকে দেখে মনে হ'লো খুব গরীব। জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরায় জানা গ্যালো জমিজমা নেই। সাতটি ছেলেমেয়ে। ফোর্‌টোয়েন্‌টি কেস্। মিথ্যে দলিল দেখিয়ে দশ কাঠা জমি বিক্রী ক'রেচে। ক'টি পেটের দাবী মেটাতেই এ কর্ম্ম তার ক'রতে হ'য়েচে। তা হোক্, আইনের চোখে ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজার ভেদ নেই। সে যে আল্লার আইনের মতো অমোঘ। খাতিরদারীর কথা নেই এখানে। দিলুম ঠুকে পেনাল কোডের সর্ব্বোচ্চতম সাজা।

আসামী ডুক্‌রে উঠ্‌লে, "হুজুর, আমি বড় গরীব। ছেলেপুলে না খেয়ে ম'রে যাবে।"

প্রতিপক্ষ মোক্তার হাত জুড়লেন, "হুজুর, সাজার ম্যায়াদটা কম কোরে দিলে ... ... ।"

বিরাশী ওজনের ধমকের সাথে চোখ মুখ রাঙা কোরে জবাব দিলুম, "না, না, না। এ সবে দয়া নেই আমার। এ রকম প্রতারক চিটের আদর্শ সাজা হওয়া দরকার। নইলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। লে যাও উস্‌কো।"

আসামীর চোখ মিনিটের জন্য স্থির হোয়ে গ্যাচে আমার মুখে। তাকিয়ে দেখি ওর চোখ যেন ব'ল্‌চে, "তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোরই বটে।" আর তাকাতে পা'রলুম না তার দিকে। লোহার শেকলে বদ্ধ-হাতে যেতে যেতে ফিরে ফিরে চাইছিলো সে আমার দিকে।

ভুলতে পা'রচিনে ওর করুণ দৃষ্টি। ভুলতে পা'রচিনে ওর চোখের ভাষা, "তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোরই বটে।" বটে। জীবনভর প্রতারণা-ভরা যার কার্যকলাপ, মিথ্যে প্রবঞ্চনা ছলনা যার জীবনের পদে পদে ধাপে ধাপে, তেমন সাধু মহারাজ গ্যাচেন প্রতারকের সাজা দিতে! তুমি কি জীবনে কোনই প্রবঞ্চনা করোনি? করোনি কি প্রতারণা দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বাপ মার সঙ্গে? তোমার জীবনের শান্তি, বেহেশ্‌তী-নেয়ামত, মূর্ত্তিময়ী মায়া, তোমার শক্তি, তোমার মন্ত্রী, তোমার বন্ধু, তোমার গৌরী-মনমায়ার অবস্থাটা তুমি কি ক'রেচো? তার ও-হেন অমূল্য প্রাণটি নির্ম্মম ঘাতকের মতো তিলে তিলে পলে পলে পুড়িয়ে মা'রচো। কথা দিয়ে কথা রাখোনি। ধর্ম্ম সাক্ষী আল্লাহ সাক্ষী ক'রে ব'লেছিলে তার জীবন ঊষর মরুভূমির মতো ব্যার্থ হোতে দেবে না। কে ব'লেছিলো তোমায় অমন দিব্যি কো'রতে? ঠগ্‌,—ঠগের সরদার, মরিয়মের সঙ্গের ব্যবহারটাও তোমার বোধ করি অনিন্দনীয় অকপটতায় ভরা;—না? পেনাল কোড্‌ দেখাচ্চো। কোনও মানুষকে তিলে তিলে মারা আর একবারে খুন করার মধ্যে কোনটি বেশী হৃদয়হীন? সজ্ঞানে মেরে ফেলার নিয়ত্‌ করার সাজা কি?

প্রতারণার দায়ে এ গরীবের যদি জেল হয় তোমার ফাঁসি হওয়া দরকার "হুজুর।"

চেয়ে দেখি কয়েকজন উকিল মোক্তারের কৌতুক-বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি আমারই দিকে হাঁ কোরে আছে। বোধ হয় অবাক হোয়ে গ্যাচেন তাঁরা হঠাৎ আমার এই ভাবান্তরে। ধ্যানযোগী কোনও সাধু মহারাজকেও হঠাৎ এমন সিদ্ধ পুরুষের মতো ধ্যানস্থ হোতে ছাখেননি তাঁরা। কলম হাতে, পলকহীন উদাস দৃষ্টি কোন দূরদূরান্তরের রহস্য সন্ধানে তীব্রবেগে ছুটেচে। স্তব্ধ, নিস্পন্দ সারাদেহ। কোনও উকিল মোক্তার ছাখেননি কোন সাধুহাকিমের এ-হেন ধ্যান-মূর্ত্তি।

"হুজুর, পরবর্ত্তী কেস্‌টি ... ...।"

"আই ফিল্‌ ইন্‌ডিস্‌পোজ্‌ড্‌। আজ আর কোনও কেস্‌ হবে না।"

এজলাস্‌ ছেড়ে কাঁ'পতে কাঁ'পতে উঠে এলুম। দেহমনের বল যেন ঐ আসামীর সঙ্গে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে খালি খোলস নিয়ে বেড়িয়ে প'লুম।

——::——

বাইশ

বাসায় এসে চুপ্‌চাপ্‌ বাইরের ছোট্ট কামরাটিতে শুয়ে প'ড়েচি। ভালো লা'গচে না কারো কথা, ভালো লা'গচে না ছেলেপুলেদের কিচির্‌ মিচির। নিজকে নিয়ে একটু নিরালায় থা'কতে পেলে বেঁচে যাই।

চোখের সা'মনের ধরিত্রীটা একেবারে রসশূন্য হোয়ে গ্যাচে। কেন হয় এমন? এই ধরিত্রীটাকে নিয়েই ঠিক এমনি সময়েই কতজনে আনন্দ সাগরে সাঁ'তরে বেড়াচ্চে। আবার আমার মতো কতজনে মরণ কামনা ক'রচে নিঠুরা ধরণীর কব্জি থেকে মুক্তি পেতে। এক হাসে, আর কাঁদে। বিচিত্র এর লীলা। পর্দ্দার আড়ালে যে নির্ব্বিকার গুণাতীত শক্তিধর কলকাঠি ঘোরাচ্চেন, তাঁর কি এসে যায় সংসার-আবর্ত্তে প'ড়ে কে হা'সলো, কে কাঁদলো। নইলে, গুণময় যদি তিনি, তাহ'লে আমার বুকখানা কি তিনি দেখতে পাচ্চেন না? দেখতে পাচ্চেন না কি,

বাইরের-চামড়ায়-ঢাকা বুকে কী মর্ম্মভেদী ক্রন্দন গুম্‌রে উঠে' তুষের আগুনের :
আমায় তিলে তিলে দ'গ্ধে মা'রচে ? এর প্রতিকার কি নেই তাঁর হাতে ?

হয়তো জিজ্ঞাস্য : পুরুষ মানুষ হোয়েও ক্যানো আমার এই দুর্ব্বলতার-কান্ন
আমার জবাব : নইলে কি ক'রতে পা'রতুম আমি ? ঘটনা-চক্র আমায় নিয়ে এ
কোরেই অবিরত ঘুর্‌পাক খাচ্চে যে স্বাধীনতার এতটুকুও সুযোগ নেই আমার।

ঘটনা-চক্রে পেলুম না মায়াকে, মরিয়মও পেলে না আমাকে। ে
ঘট'বার যা তা ঘ'টে গ্যালো। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই কোরে কোরে
বিক্ষত হোয়ে গেচি আমি। যা ক'রতে যাচ্চি হোয়ে যাচ্ছে উল্টো। মায়াকে পে
গেলে বাপমাকে ছা'ড়তে হ'তো। তা নাহয় ছা'ড়তুম, যে রকম মরিয়া হে
উঠেছিলুম। কিন্তু বেঁকে ব'সলে মায়া তেরিয়া হোয়ে, বাপমার মনে দুঃখ দে
হবে না। ধার্ম্মিক বাপমা'র সন্তান সে। জানতুম ভেবে চিন্তে একবার যে সিদ্ধা
পৌঁচে সে, নড়ানো আর যায় না তাকে। ধীরে ধীরে সুযোগ ক'রে, বাপমার
গলিয়ে আ'নবো, মানে অভিমানে আব্দারে, মিল্‌লো না সেও সুযোগ। এ
কায়দার সঙ্গে পাকা খেলোয়াড় সৈয়দ আকবর হোসেন বেকায়দায় ফেল্‌লেন আম
যে কোনও ভদ্র সন্তানই ও-ক্ষেত্রে নিজের সুখ ও স্বার্থের জন্যে বাপমা'র বি
নাম বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। দশের মধ্যে তাঁদের মুখ ছোটও ক'রতে পা
না। অত্যাচার মমতারূপে নেবে এলো আমার জীবনে। আর আমার গো
প্রেমের কথা তাঁরাই বা জা'নবেন কি কোরে ? বাংলা দেশের সন্তান ক'জনেই
তেমন বেলাজ হ'য়েচে যে গুপ্ত প্রেমকে ব্যক্ত ক'রতে পেরেচে ? এ-ক্ষেত্রে মে
মানুষের মতো বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

সন্তানের বিয়েতে তাঁদের যেটুকুন দেখবার দরকার, ভা'ববার দরকা
দেখেচেনও, ভেবেচেনও। সুন্দরী মেয়ে, পূর্ব্বের নিকট-আত্মীয়া, মূর্খও ন
পাগলও নয়, নগদ টাকা, গহনা, ভবিষ্যতে বড় চাকুরী, সবই দেখেচেন তাঁরা
একবার বিয়ে হোয়ে গে'লে দিনও কেটে যায়, এও জানেন তাঁরা। কিন্তু সৌন্দর্য্যে
মাপকাঠি নিয়েই তো যত গোলমাল। মায়ার সুন্দর অন্তর্লোকের সুন্দর মানুষটি
পরিচয় যদি না পেতুম তো হয়তো বা এতটা খুঁতখুঁতেও হতুম না। ঘ্যাচ্‌ ম্যা
কোরে জন্তু জানোয়ারের মতো গুতোগুতি কোরে একরকম কোরে কা'টতো দিন।

হাকিমগিরি ক'রতে গিয়ে বহু কেস্ ঘেঁটেচি। লোকজনের সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও যা জ'মে উঠেচে তা নিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করা যায়। আজ বুঝেচি, গোটা মানুষকেই শুধু উপভোগ করা যায়, দেহকে নয়; দেহকে নিয়ে বড় জোর বলাৎকার করা যায়, ব্যাভিচার করা যায়, অবিচার করা যায়, উপভোগ করা যায় না। মনই মানুষ, মানুষই মন। দেহ তার বাহন। মানুষকে উপভোগে তৃপ্তি আছে, দেহের ব্যাভিচারে ক্লান্তি অপরিসীম। তাই তো দেখি, ঘরের সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ কোরে কত জনে বাইরের আপাতদৃষ্ট অসুন্দরীর জন্যে জান মাল বিলিয়ে দেয়। যে-মানুষকে তারা উপভোগ ক'রতে চায়, পায় না তা ঘরের স্ত্রীর মধ্যে। ভেতরের মানুষ বাইরে ফুটে উঠে কথায় ব্যবহারে। যে-প্রকৃতির যে-মানুষ, খোঁজেও তারা সমপ্রকৃতির সেই-মানুষ। ঘরের স্ত্রী তাদের মেটাতে পারে না মনের দাবী, সত্যিকারের মানুষের দাবী।

নইলে দেহ নিয়ে মরিয়ম আমার বুকের কতো নিকটে, তবু কতো দূরে সে। আর মনমায়া আজ দেহ নিয়ে কতো দূরে, তবু মন নিয়ে কতো নিকটে সে। কতো দিন গ্যালো, কতো মাস, কতো বছর। কিন্তু একটি দিনের জন্যেও কি সে বুকের অন্তরতম স্থানের আসন থেকে এক বিন্দু ন'ড়ে ব'সেচে? না। সরাতে গেলেই হাহাকারে ভ'রে উঠে আমার পূর্ণ সত্বাটাই। বেঁচে আছি, বেঁচে আছি শুধু মনের ঐ মানুষটিকে অবলম্বন কোরেই।

কি কারণে সেই জানে, মরিয়ম এলো আমার ঘরে। কোর্ট ছেড়ে অসময়ে এভাবে শুয়ে থা'কতে দেখে যেন অবাক হোয়ে গ্যালো। সন্দেহও কিছু মনে ছিলো কি না সেই জানে। জিজ্ঞেস ক'রলে, "কী ব্যাপার? কোর্ট ছেড়ে কখন এসে শুয়েছো? একটা ডাকও দাওনি।"

ব'ললুম, "বড্ড মাথা ধ'রেচে। তাই চ'লে এলুম কিছুক্ষণ আগে।"

উপদেশ দিলে সে ভাড়াটে ডাক্তারের মতো, "বেশ্ তো। দু'একটি এ্যাস্-পিরিন্ ট্যাব্‌লেট্ খাও। তার জন্যে শুয়ে শুয়ে মাথা টেপা ক্যানো?" ব'লে বেড়িয়ে গ্যালো।

অল্প বয়সে ছেলেপুলে হোয়ে হোয়ে আর শারীরিক কোনও পরিশ্রম না করায় বেচারীর মেজাজও আগের চেয়ে ঢের বেশী তিরিক্ষি খিট্‌খিটে হোয়ে প'ড়েচে।

সন্তান হয়তো সে আর চায় না। তবু সখও কম নেই, ভয়ও আছে। কি জা
ঘরের গরু বাইরের-চরা খেতে চায় যদি? আব্দার না শুনলে অভিমানও আ
"মন নাই আমার উপর, নইলে কি আর ... ...।"

দুঃখে মরি! কোন কুলে দাঁড়াই?

কিন্তু আমার দিক্‌টাও তো দেখবার আছে। 'নিত্যি ভিক্ষে ছ্যায়কে, অ
নিত্যি অসুখ ছ্যাখে কে?' তুমি এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা টিপে দাও, এ দা
করিনি। মন অবিশ্যি আশা করে, এমন সংবাদে একবার কাছে এসে ব'সে
সোহাগভরে দরদের সঙ্গে মাথায় একবার হাত বুলোবে, মিষ্টি কোরে বকুনী দে
অতিরিক্ত খাটুনীর জন্যে, ভীত চিত্তে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রবে ব্যাধির চেয়ে শত
বেশী, মায়ের মমতাপূর্ণ অন্তর নিয়ে। স্ত্রী কি শুধুই স্ত্রী?—কামযন্ত্র? মন ব
পর? মনটাকে জয় ক'রতে পা'রলে না মন দিয়? তাই তো মিলন আজ হ'য়ে
গলার ফাঁসী। যাবজ্জীবনের গলার ফাঁস।

মনে দুঃখ জা'গলেই তুলনা মনে পড়ে। এ রকম মিথ্যে মাথাধরার খ
আর একজনও শুনতো। দেখেছি তার মুখে বিশ্বের উৎকণ্ঠা। শুনেছি দরদ-ভ
কথা, আর লোভনীয় মৃদু ভৎর্সনা। পেয়েছি প্রাণঢালা সেবা, আর সে সে
লোভেই ঘন ঘন ধ'রতো মাথা, ভ'রতো বুক, ভাবাবেশে অবশ হোয়ে আ'সে
দেহ, জা'গতো মনে অপূর্ব্ব পুলক। তাই তো অন্তর আছে ব'লেই এক
অন্তরপূর্ণ কোরে আছে আমার। আর একজন পেয়াদার মতো শুধু লাঠি ঘু
মনোরাজ্য দখল কোরে নিতে চায়। কিন্তু জবরদস্তি কোরে বিবাহের লৌ
বাঁধনে মেলে না এ রাজ্য, এ-খবর পেয়াদার জানা নেই।

"কি বাবা পেয়াদা, কী হুকুম তোমার? তুমি আবার এখন ম'রতে
ক্যানো?"

—জুতোর খট্‌খট্ শব্দে চেয়ে দেখি সামনের বারান্দায় এস্-ি
সাহেবের আর্দ্দালী।

লম্বা ছালাম ঠুকে জবাব দিলে সে, "হুজুর, এস-ডি-ও সা'ব জ
আপ্‌কো ছেলাম দিয়া।"

কী বিপদ! ভাঙ্গা মন নিয়ে এ রকম জরুরী ছালামের জবাব দেয়া তো আমার পক্ষে বড় শক্ত। হাকিম হোয়ে ছেলামের মানে তো বুঝেচি। কঠিন কোনও কাজ। তবু উঠ্‌তে হ'লো। মাথাধরা মাথা ছেড়ে পালিয়ে গ্যালো। চাক্‌রী যে এর নাম। এর নাম শুনে আজরাইলও ভয়ে পালিয়ে যায়। গেলুম হুকুম তা'মিল ক'রতে।

এস্-ডি-ও সাহেব বল্লেন, "... ... ...থানার কতকগুলো ডাকু-চোর ধরা প'ড়েচে। থানাটার বড় বদনাম আছে। এস্-ডি-পি-ও সাহেবের সঙ্গে আপনি গিয়ে থানাটা ইনস্‌পেক্‌শান কোরে আসুন। দোষটা কোথায় আমাদেরও একবার দেখা দরকার। শুধু পুলিশ কর্ম্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে রা'খলে এস্-ডি-ও হিসেবে আমার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করা হয় ব'লে আমি মনে করি না।"

জানি, এস্-ডি-ও সাহেব বড় হুশিয়ার ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। মহকুমার উন্নতিকল্পে সর্ব্ব দিকে নজর এঁর। দায়িত্ব বিভাগের দোহাই দিয়ে কর্ম্মকুণ্ঠ হোয়ে থা'কতে চান না ইনি। বিজলীর গতির মতো চটপ'টে এঁর স্বভাব। দেশপ্রেম-ভরা কোমল এঁর প্রাণখানি। প্রয়োজন বোধে বজ্রের মতো কঠোর, ফুলের মতো নরম। অপরাধ দমনের কথা সাজে এঁর মুখে।

আর আমার?

নিজে চোরের রাজা, ঠগের বাদশাহ হোয়ে কোন্ চোরকে ধ'রতে যাবো? আমার ছোট্ট পেশকার বাবাজী থা'কতে—যার মহিমা যদি কোনও আসামী জা'নতে পেরেচে, সাজা আর হয়নি তার। উল্টো জব্দ হোয়েচে ফরিয়াদী। মামলার সংখ্যা বেড়েচে। আমার বেগম ছাহেবার শাড়ী ব্লাউজ স্নো পাউডার আর গয়নার সংখ্যাও বেশ ভালো রকম ফেঁপেচে।

অথচ দিব্বি ভালো মানুষের মতো চ'লে যাচ্চি। কোর্টে আমার ধম্‌কানীর চোট্ আর রক্ত-চক্ষুর ঘুর্ণন দেখলে কড়া হাকিম ব'লে কোর্ট শুদ্ধ সবারই পিলে চম্‌কে। কিন্তু ঘরে এসে আত্ম-বিশ্লেষণের বিবেক-বুদ্ধি আজও নিঃশেষ হয়নি।

তাই তো ভাবি, আমিই বা কোন্ সাধু, যে অপরাধীর দণ্ড দেবার কাবেল আমি? মামলার রায় প্রকাশ করার সময় বিবেককে আর কলমকে আলাদা ক'রে রাখি। চোর ডাকাত প্রতারকদের সন্তানকে মানুষ ঘৃণা করে। আর আমার সন্তান?—ডেপুটি জাদা, ডেপুটি জাদী।

উঁচুতলার ব্যক্তিদের সঙ্গে মেশবার সুযোগে আর ক'বছর হাকিম গিরিতে আমার মতো সাধুদের এবং আমার চেয়েও বড়ো যাঁরা, সুকীর্ত্তিতে আমাকেও শত বার ডিঙিয়ে যান,—সংবাদ তাঁদের নিগূঢ় ভাবে পেয়েচি। যে-যাঁর মতো সমাজে সবাই সচল। অচল শুধু গরীব, মূর্খ, প্রতিপত্তিহীন।

সে-সব সাধুদের সংবাদ সরকারী গেজেটের মতো ক'রেই দিতে পা'রতুম কিন্তু প্রবৃত্তিও নেই, প্রেরণাও নেই। মা'স্তুতো ভাইদের সংবাদ আমার চেয়ে আর কে ভালো জানেন? কাজ নেই ঘাঁটাঘাঁটি কোরে।

আমার প্রেম ও কামের সংঘাতে কি ছিলুম আর কি হোয়ে গেচি, আর এই সংঘাতের ফলে যে পরম সাধুটি জন্মলাভ কোরেচে, তারই সংবাদ শুনালুম আপনাদেক। অপরাধ স্বীকার কোরে ভারী বুকখানা হাল্কা হোয়ে গ্যালো।

অথ সাধু-সংবাদ ইতি কোরে এইখানেই ছালাম জানাতুম আপনাদেক কিন্তু আর একটু পুনশ্চের লেজুড় আছে, যা না ব'ললে সংবাদ অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই তো পরের কয়েকটি অধ্যায়ে শেষ সংবাদটুকু পরিবেশন ক'রে শেষ ছালাম জানাতে চাই।

—::—

তেইশ

কিছুদিন ধ'রে একটী চিন্তা প্রায় অবিরত আমার মনকে ধাক্কা দিচ্চে আর সে ধাক্কার চোটে শরীর ক্রমশঃই নিস্তেজ হোয়ে আ'সচে। চ'লতে ফিরতে শুতে ব'সতে মন জুড়ে অনড় হোয়ে ব'সেচে। এই চিন্তা যে মায়া এখন কি ক'রচে, শরীর মনের কেমনই না জানি পরিবর্ত্তন হোয়েচে তার। দেখলে আমায় আর চিন্‌তে পা'রবে কি না, চিন্‌লেও চিনতে চাইবে কি না, চিন্‌তে চাইলেও

পেতে চাইবে কিনা? আমার প্রতি ভালোবাসা তার তেমনি অটুট আছে, না, সংসারের ভাটির টানে কোথায় কোন দূরে ভা'সতে ভা'সতে কোন ঘাটে ভিড়েচে?

মুখে তো ব'লেছিলো অনেক কথা। বিশ্বেসও করি সে সব। তবু 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্র পুরুষস্য: ভাগ্যং... ...।'

আমি পেয়েচি একজনকে, তবু ভু'লতে পারিনে তারে! মনে আমি দ্বিরাচারী। সে মনের নিভৃত কোণে একাচারী হোয়েও দেহের দাবীর জোর-নিষ্পেষণে বহুগামী হোতে পারে তো? একজন আর-জনে কতদিন মনে রাখে? চিন্তা-স্রোত যদি তার উল্টো দিকে ব'য়ে থাকে? বাইরের দিক থেকে আমার জীবন সফল হবে, আর তার জীবন হবে বিফল? কেন, কিসের জন্যে? কোন স্বার্থপরের জন্যে স্বেচ্ছায় এ বিফলতা বরণ কোরে নেবে সে? এমনি চিন্তাই যদি সে আজকাল করে? চিঠি দিইনি তো তাকে অনেকদিন। কোন লজ্জায় দেবো?

এধরণের চিন্তাকে আপনারা নিউরোসিসের লক্ষণ বলুন আর যাই বলুন আমাকে কিন্তু অস্থির কোরে তুলেচে তা। তাকে দেখবার জা'নবার অদম্য কৌতূহল দিনেরা'তে উন্মাদনার আকার ধারণ কোরেচে। ভারাক্রান্ত মন দেহকেও আক্রান্ত কোরে ক্রমে ক্রমে তাকে শয্যাশায়ী কোরে দিলে।

মেডিক্যাল্ লিভ্ নিলুম লম্বা তিন মাসের। পুত্র কলত্রসহ গেলুম নিজ বাড়ী সুবিদপুরে। ধার্ম্মিক আব্বার কথা বর্ণে বর্ণে ফলেনি। এ বাড়ী এখনও তাঁর। হজ সেরে আব্বা আবার সংসারের মায়ায় ফিরে এসেচেন। বোন দুটির বিয়ে হ'য়েচে। চাকর দাসী নিয়ে আম্মা কোনও রূপে সংসার ধ'রে রেখেচেন। কিন্তু আমার ফোক্লা-মুখো রসিক নানা নেই। শ্বশুরে জামাই একই সঙ্গে হজে গিয়ে বুড়ো মৃত্যুর জারক রসে জিরিয়ে গ্যাচেন। আম্মার আব্বা ব'লতে এখন আমি। তাই তো আম্মা আমায় দেখে কেঁদে কেঁদে আকুল, 'সোনার শরীর কি হোয়ে গেছে বাপ্‌রে। তুই অমন চা'ক্‌রী ছেড়ে দে।'

মরিয়ম ঝাঁঝালো জবাব দিলে, "তোমার যেমন কথা আম্মা। অসুখ বিসুখ আবার হয় না কার? সামান্য একটু শরীর খারাপ হোয়েচে আর অমনি অমন-হেন চা'ক্‌রী ছেড়ে দিতে হবে? ঐ চা'করী নিয়ে দিতে আব্বার কত বেগ পেতে হ'য়েছিলো। শুধু পরীক্ষা দিয়েই চা'করী মিলেছে?"

পুত্র-বধূর মূর্ত্তি দেখে মুখ ফুটে আম্মার আর দুঃখ প্রকাশ করা হ'লো না শুধু মুখখানি ভার ক'রলেন। আম্মার ভার মুখ দেখে আমার মন কিন্তু ভা হ'লো না। মনে মনে ব'ল্লুম, "বেশ হ'চ্চে এখন। নিজের বোনের মেয়ে রূপে হু:, ডানাকাটা পরী। নিজে চোখে দেখুক একমাত্র পুত্র কি সুখে আছে কে:, একবারের মুখ ঝামটাতেই মুখ ভার করা কেন? বাপে চা'ক্‌রীর চেষ্ট ক'রেচেন তাই স্বামী চাকর ব'নে গ্যাচে। দেমাক্ কতো।'

এ মুখভার আম্মার দূর কোরে দিলে নাতি না'ত্‌নীর দল। অনেকদি পর পেয়েচে তারা তাদের দাদী-আম্মাকে। তাঁকে ধ'রে হেসে কুঁদে চীৎকার কোরে অস্থির কোরে তুললে আম্মাকে। প্রৌঢ়া মানুষ, কতক্ষণ আর মুখ ভা কোরে থাকেন।

এক সময় আমায় নিরালায় পেয়ে অতি ছোট গলায় ব'ললেন আম্মা। "আরে জাহাঙ্গীর, হ্যাঁ বাবা, তোর কান-মোচ্‌ড়া মেয়েটির কোনও চিকিচ্ছা ক'রলে হয় না? ওর বিয়ে হবে ক্যামন কোরে?"

বিরক্তির সঙ্গে ব'ললুম, "তার আমি কি জানি। তোমরাই আছো। দ্যাখো, কোলে কোলে কাউকে পাও নাকি বিয়ে দেবার। নয় তো এখনি কারো ওয়াদা আদায় কোরে নাও। গর্ভের দোষ ওটা। চিকিৎসায় কী ফল হবে?"

মুখ পেলেন না আম্মা। স'রে গেলেন।

আব্বার সঙ্গে দেখা হ'লে দোওয়া ক'রলেন, তাস্‌বিহ নিয়ে জায়নামাজে ব'সলেন।

সে রাত্তিরে খালেককে ডাকা হ'লো। আব্বার খাস্ কামরায় রইলুম আমি, খালেক আর আব্বা। ব'ললেন আব্বা, "বাবা খালেক, জাহাঙ্গীরের শরী একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছে, ওকে চেঞ্জে পাঠানো দরকার। কোথায় পাঠাই বলে তো? সেই পরামর্শের জন্যে তোমায় ডাকা।"

খালেক এখন আব্বার দ্বিতীয় পুত্র এবং মন্ত্রী। খালেক কি মতা দেয় জা'নবার জন্যে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলুম তার দিকে। সে তো আ সবই জানে!

আব্বা যদি একথা জিজ্ঞেস ক'রবেন খালেককে আগে জা'নতুম তো তোতা পড়িয়ে ঠিক কোরে রা'খতুম তাকে। হতচ্ছাড়াটা কি ব'লতে কি ব'লে ন। আর গভীর সমুদ্দুর আব্বার মনের খবর জা'নবে কে?

খালেক কিছুক্ষণ চিন্তা কোরে সুচিন্তিত মতামত জানালে। কি চিন্তা র জবাব দিলে কিছুটা অনুমান ক'রেচি। ব'ল্লে সে, "চাচাজান, আমার মতে ফের্ দার্জিলিং পাঠানোই ভালো। কেননা সেখানে ও থাকে ভালো। জলিং-এর জলবায়ু ওর স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি ফিরেয়ে আনে। সেবারে তো দেখা লো কি সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে ও ফিরে এসেছিলো।"

আব্বা জেরা কা'টলেন, "তাতো বটেই। কিন্তু কিছুদিন পরই ও চিঠি খতে শুরু কোরে দেয়, আজ এ অসুখ, কাল ওটা, এই সব। তাই চিন্তা 'রচি।"

তাড়াতাড়ি বল্লুম, "সেসব সামান্য অসুখ আব্বা। এই যেমন একটু মাথাধরা, একটু সর্দ্দি। আপনাকে সবই জানাতুম। নইলে যে আমার মন পরিষ্কার হ'তো না।"

বদমায়েশ, বাপের সঙ্গে আবার ছলনা?

আব্বা ব'ললেন, "তাহ'লে তোমার মনও চাইছে দার্জ্জিলিং যেতে?"

ব'ললুম, "জি আব্বা। পরিচিত জায়গা। আমার ভালোও লাগে।"

এক মিনিট থেমে ব'ললেন আব্বা, "বেশ, তাই হোক্। ক'দিন ধ'রে আমি চিন্তা ক'রে ঠিক্ ক'রছিলাম এবার তোমায় পাঠাবো 'সানি ব্যাঙ্ক, মারী হিল।' একজন পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে খুব দহরম মহরম ছিলো। তিনি সেখানে। বড় মের সাহেবী ধরণের একটি হোটেল খুলেচেন।"

রায় শুনবার জন্যে বুকখানা আমার ধুক্ পুক্ ক'রছিলো। এখন সাময়িক ত্তি আমি আব্বার সামনে প্রকাশ করি কি কোরে? কিন্তু? এর ভেতর বড় কমের যে একটি কিন্তু আছে। ইশারায় খালেককে এক ধারে ডেকে নিলুম। আব্বার হাতের তস্‌বিহ্ বোধহয় আল্লা নামের সঙ্গে টকাটক্ ঘুরতে লাগলো।

ব'ললুম খালেককে, "আগের কথা তো তোমাকে ব'লেচি। মরিয়ম দার্জ্জিলিং-এর নামে ভয়ানক ক্ষ্যাপ্পা। সন্দেহপরায়ণা। আবার যাচ্ছি শুনতে

পেলে হেঁট মাটি উপরে তুল্‌বে। কি কী-কাণ্ড কারখানা শুরু ক'রবে আ
জানেন। আমি তো ব'লতে পা'রবো না। তুমি আব্বাকে ব'লে 'এ-রকম এ
যুক্তি ঠিক ক'রতে পারো না যে তোমরা সবাই ব'লবে আমি যাচ্চি 'সানি ব্যাঙ্ক-ম
হিল—পাঞ্জাব? চিঠি আ'সবে দার্জ্জিলিং থেকে তোমার মারফত। উপরে ঠিক
থা'কবে মারী হিলের।"

ব'ললে খালেক, "তাতে কাজটা আরও জট্‌ পাকিয়ে যাবে না, যদি
পড়ো? আর এ রকম একটি ছলনার আশ্রয় নিতে চাচাজানকেই বা বলি
সাহসে?"

ব'ললুম ওর হাত চেপে ধরে, "না ভাই, যেরকম দজ্জাল মানুষ মরিয়
ওর কথাকে আর খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌কে আমি বড্ড ভয় করি। আর তা ছাড়া আজক
ও হোয়ে প'ড়েচে সৃষ্টি ছাড়া। দোহাই আল্লার, একবার চেষ্টা কোরে দ্যাখো না

'আচ্ছা' ব'লে ফিরে গ্যালো খালেক আব্বার কাছে। ভণিতা ক
মাথা চুলকিয়ে, হাত কচ্‌লিয়ে আ'ম্‌তা আম্‌তা ক'রতে লাগলো খালেক।
ভাব বুঝে জিজ্ঞেস ক'রলেন আব্বা, "কি বাবা, কিছু ব'লতে চাও?"

শুরু ক'রলে খালেক, "জি হাঁ। ব'লছিলাম কি, হাস্নুর মা দার্জ্জি
এর কথা মোটেই শুনতে পারে না। জেদ্‌। বলে, খুব ঠাণ্ডা দেশ, শরীর আ
খারাপ হবে, ওখানে গিয়ে কাজ নাই। তার চেয়ে... ... .."

হাস্নু আমার বড় মেয়ে।

সংক্ষিপ্ত জবাব আব্বার, "সে আমি ঠিক্‌ ঠাক্‌ কোরে দিব।"

শুতে গিয়ে ব'ললুম মরিয়মকে দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা।

খিঁচে উঠলে মরিয়ম, "দার্জ্জিলিং? সেই শলাপরামর্শই বোধহয় হচ্চি
এতক্ষণ? দার্জ্জিলিং ছাড়া দুনিয়ায় আরতো কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গা
কিনা! সেখানে তো যেতেই হবে। প্রথম জীবনের ঢলাঢলির তো অনে
আছে কিনা!"

ধমকের সঙ্গে ব'ললুম, "কি যে পাগলের মতো বকো তুমি! তুমি এ
বারে ব'য়ে গ্যাচো। আমার দোষ? আব্বাই তো পছন্দ কোরে আমায় গ্র
দিলেন। অজ্‌খোট্টা পাহাড়ী ভূতের দেশে কী এমন রোশ্‌নাই আশ নাই থা'

পারে ? তোমাকে কি যে খুঁৎ বাইয়ে ধ'রেচে, সন্দেহ ক'রে জীবনটা শেষ ক'রলে আমার।"

নাকিসুরে চোখ মুছতে মুছতে মরিয়ম বলে, "তোমার জীবন শেষ হবে ক্যানো? আমায় নিয়ে সুখ পেলে না। আমিই যেন তোমার আগে চট্‌পট্‌ ম'রে যাই।"

ব'ললুম, "ম'রতে তোমায় ব'লচে কে? যাও না ক্যানো আব্বার কাছে? জিজ্ঞেস করো না তাঁকে? একি আমিই সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েচি? খালেক ছিলো না সেখানে? আমি তো ব'ললুম, আব্বা, আমি মারী হিল যাই। আব্বাই তো ব'ললেন. না, দার্জ্জিলিং বাড়ীর কাছে, তোমার চেনা জায়গা। তাঁর উপর দিয়ে আমি কথা ব'লতে পারি? অমন বেয়াদব আজও হইনি।"

অভিমান কোরে রাতে উল্টো মুখো হোয়ে শুয়ে রইলে বিবি সাহেবা। আমিও বাঁচলুম। একবার গায়ে হাত দিতে গেলুম এক সময়। কিন্তু ঘোড়ার চা'ট্‌ দেয়ার মতো ঝিঁট্‌কে ফেলে দিলে সে আমার হাত। রাতের সিকি রা'ত ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ক'রে কাটালে। এ কান্নার ওষুধ কী দিতে পারি আমি?

সকালে নাস্তা চা খেতে খেতে ব'ললেন আব্বা, "জাহাঙ্গীরকে দার্জ্জিলিং পাঠানোতে আশঙ্কা ক'রো না বউমা। ওখানকার আবহাওয়া ওর স্বাস্থের পক্ষে খাটে ভালো তাছাড়া বাড়ীর কাছে। খবরাখবর তাড়াতাড়ি মিলবে।"

মরিয়মের সুর নরম হোয়ে এসেচে। একি চাপা রাগ, না অভিমান, না খেদ্‌, না উদাসীন আত্মসমর্পন, সেই জানে আর আল্লা জানেন।

জবাব দিলে সে, "আমি অমত করিনি আব্বা। যেখানে ভালো মনে করেন সেখানেই পাঠান।"

বাঁচা গ্যালো।

আম্মা ব'ললেন, "না, না। বউমার অমত হবে ক্যানো? মেয়ে মানুষ স্বামীর ভালো সবাই চায়। পাহাড়ে-হাওয়াই আমার বাছার পক্ষে ভালো। সেবারে কতো সুন্দর হ'য়ে এসেছিলো।"

আর একবার বাঁধা ছাঁদা। মোট্‌ঘাট্‌ টুকিটাকি। এবার একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

সাধু-সংবাদ

আমার আংশিক জীবন কাহিনীর গোড়ার দিকে ব'লেচি আমি ম
একবারই দার্জ্জিলিং গেচি। কিন্তু আবার তো চ'ললুম। কাজেই ও-বলাটা আম
বাহ্যতঃ ভুল, কার্য্যতঃ নির্ভুল।

কেন, সে কথার জবাব দিচ্চি নজির দিয়ে। ছাত্রজীবনে আমার একবা
মনের অবস্থা হয় সাংঘাতিক শোচনীয়, এক মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদে। মনের ভারসা
হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা। বন্ধু-বান্ধব জোর কোরে ধ'রে নিয়ে গ্যাল
সিনেমায়। বেশ নাম করা একখানা ভালো বই দর্শককুলকে সপ্তাহের পর সপ্তা
আকর্ষণ ক'রছিলো চুম্বকের মতো। প্রদর্শনীগৃহ প্রতি প্রদর্শনীতেই পূর্ণ থা'কতো
নয় আনার টিকিট কালো বাজারে এক টাকা নয় আনা, তাও নেই। মোটা পয়
দিয়ে মোটা গদিআঁটা আসনের টিকিট কিনলে বন্ধুরা। ঘরের ভিতর আন
কোলাহলে সরগরম। শুনেচি বেহেশতে কারো কোনও নিরানন্দ থা'কবে ন
এ ঘরখানিও এদের কাছে বেহেশতের পার্থিব সংস্করণ।

প্রদর্শনী শুরু হ'লো। পর্দ্দার বুকে কত ছবি এলো গ্যালো, কত বাজন
কত গান। ঝুমকো পায়ের রমুঝুম্ নাচ, কিছুই বাদ গ্যালো না। যুবক ছোকড়
দের আহা উহু শব্দে মনে হয় হার্টফেল্ কোরে মরে বুঝিবা। জিভের পানি প'ে
আমার পাশের বন্ধুটির জামাকাপড় নষ্ট হোতে দেখলুম। আরও কিছু নষ্ট হোয়ে
কিনা আমার জানা নেই। জিজ্ঞেস ক'রবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়
তবু যে এগুলো মনে আছে তা শুধু তাদের অতি অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যে মনে
রেখাপাত করার ফলে। যেমন মনোযোগের সঙ্গে লিখতে প'ড়তে থা'কলে
অবচেতন মন সচেতন হোয়ে উঠে দেয়াল ঘড়ির টিক্‌টিক্ বন্ধ হ'লে। পাশে
দরদী বন্ধু আমার, কোনও কোনও সময় হাতে ঝিঁটুকে-টান্ দিয়ে এবং গায়ে মৃ
গুতো মেরে মনোহারী জায়গায় আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রছিলো। তাই
ঘরের ভেতরের বেহশ্‌তী জীবদের কীর্ত্তি কলাপ কিছু মনে আছে।

কিন্তু বাইরে এসে বন্ধুরা যখন জিজ্ঞেস ক'রলে, "ক্যামন্ দেখ্‌লি?"

ব'ললুম, "উঁ ?"

ফের্ জিজ্ঞেসা, "ক্যামন্ দেখ্‌লি ?"

এবার শুনতে পেয়ে ব'ললুম, "হুঁ। কিছুই দেখিনি তো।"

অবাক হ'লে তারা, "সে কিরে! ত্বঘণ্টার মধ্যে কিছুই দেখিস্‌নি? আমরা তো দেখলুম পর্দ্দার দিকে আমাদের চেয়েও মনোযোগ সহকারে দিব্বি তাকিয়ে র'য়েছিস্।"

তাইতো। কাঁচের ত্বটুক্‌রো অংশই শুধু তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু দ্রষ্টা ছিলো গর্‌হাজির। আমার মনের সমস্ত পরিধি জুড়ে ব'সে ছিলো আমার ত্বশ্চিন্তা। মনের পর্দ্দায় তাদেরই ছবি আমায় জবরদস্তি কোরে ব্যাপৃত রেখেছিলো। বাইরের ছবি দেখবার অবসরই ছিলো না আমার।

প্রথম যখন দার্জ্জিলিং গেচি তখন দার্জ্জিলিং দেখবার মতো ক'রে দেখেচি। আর আজ যখন রওয়ানা হচ্চি তখন দার্জ্জিলিং ব'লেই দার্জ্জিলিং-এর কোনও আকর্ষণ নেই মনে। আজ একটি আশা নিরাশায় দোত্বল্যমান হৃদয় নিয়ে চ'লেচি, আমার হারানো প্রেমকে খুঁজতে, যাকে হারিয়ে অবধি সুখের মুখ আর দেখিনি কোনওদিন। যদি তাকে না পাই তো গোটা দার্জ্জিলিং পেলেও একবিন্দু তৃপ্তি পাবো না মনে। কোন্ কালের কোন্ পাহাড়ী-প্রধান ভুটিয়া-সর্দ্দার দোর্জ্জে, পাহাড়ের এই 'লিঙ' (গ্রাম) পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিলেন। আর আমার মতো গরীবও হাফিজের রুবাই নজরুলের সুরে সত্যভাষণ রূপে গাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না,

"যদিই কান্তা শিরাজ্‌সজ্‌নী ফেরৎ দেয় মোর
চোরাই দিল্ ফের্
সমরকন্দ্ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল
গালের তিল্‌টের।"

আমার মায়াও যদি আমার ভাঙ্গাবুক জোড়া লেগে ছায়, ফিরে ছায় 'মোর চোরাই দিল্,' তাহ'লে শত শত দার্জ্জিলিংকে মুহূর্ত্তে বিলিয়ে দিতে পারি বিনা মূল্যে। আমার সুখ দার্জ্জিলিংএ নেই, আছে দার্জ্জিলিং-এর মায়ার বুকে।

শিলিগুড়িতে খেলনা-রেল্ গাড়ীতে চেপে প্রথম দিনটির মতোই চেয়ে আছি বাইরের পানে। কিন্তু আজ নেই কোনও প্রাণ-মাতানো উল্লাস্-জাগানো আকর্ষণ। দৃষ্টিপথের ওরা সবই শুধু গাছ আর পাথর। নেই কোনও দেবতা ওতে। ট্রেন-কামরায় কতজনে কত গল্পে মেতে আছে। কিন্তু আমার কানে কোনও কথাই আজ মধুবর্ষণ করে না।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা মতো শুধু এইটুকুই মনে আছে খেল্‌না রেল গাড়ী রংটং, চুনা ভাটি, তিন্‌ধারিয়া, গয়াবাড়ী পেরিয়ে মহানদীতে এলো। এই সেই মহানদী, গত বারে মায়া নিজ হাতে আমায় খেতে দিয়েছিলো যেখানে। এলো কার্শিরাং, এলো টুং, এলো সোনাদহ্, তারপরে এলো ঘুমের ষ্টেশন 'ঘুম'। আমারও চোখের আধো-জাগা আধো-ঘুম এতক্ষণ আমায় নিঝ্‌ঝুম কোরে রেখেছিলো। পূর্ণ সজাগ হোতেই দেখি গাড়ী এসে পৌঁচে গ্যাচে সন্ধ্যের প্রাক্কালে বিজলী বাতির মালা গলায় দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে।

আবার সেই লোইস্ জুবিলী স্যানিটারিয়ামে। কিন্তু এ-ঘর ও-ঘর ঘু ফিরে দেখি, নেই কোত্থাও হরে-কৃষ্ণ-হরে-রাম পরেশদা। নেই তাঁর জুড়ি-বন্ধুরা বোকার মতো বৃথাই আশা করি, আর বৃথাই খুঁজে মরি আপন মনে।

কা'ট্‌লো রা'ত। কা'ট্‌তে চাইলো না সকাল। টুপ্‌টাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দে বৃষ্টি না'ব্‌লো। না'ব্‌লো তার সাথে সারাআকাশ। মেঘে মেঘে কালো হ'য়ে গ্যাচে আকাশের চন্দ্রাতপ। মনে প'ড়্‌চে, টিনের ঘরে এমনি কোরেই পট্‌পট্ শব্দে না'বতো বৃষ্টিধারা। আষাঢ়ের আকাশ থেকে যেন ঝ'র্‌তো মুক্তোরাশি। তাল মান লয়ে পূর্ণ ঐক্যতানে শুনাতো শাঁওন সখি আকাশ-কণ্ঠের গান। কানখাড়া কোরে স্তব্ধ হোয়ে রইতুম। না'ব্‌তো ভাদর, 'রুমুঝুমু রুমুঝুম্ নুপুর পায়ে,' আর আমার হৃদয়-সরসীতে মৃদু চরণ ফেলে না'ব্‌তো মায়া—আমার মায়া। ভ'রে দিতো হৃদয়-যমুনা প্রেমের কুলুতানে। ঝুর্‌তো আঁখি,—শাঁওনের বারিধারাসম ;—প্রেমাশ্রু। চোখে চোখে মুখে মুখে ছয়লাব হোয়ে ফির্‌তো সেই স্বর্গীয় বস্তু।

দুপুর পর ধ'রে এলো বৃষ্টি। বাইরে তো বেরুবো এবার, কিন্তু যাবো কোথায়? সরাসরি যাওয়া যায় না কাঠের বাড়ীটাতে। আর সে বাড়ী তেমনি কাঠেরই আছে কিনা তাই বা কে জানে? থা'কলেও বাড়ীর পরিজন সংখ্যায় কে কে আছে তাও পূর্ব্বাহ্নে জানা দরকার। নইলে বিপদ ঘ'টতে কতক্ষণ? যাদের কাছ থেকে জা'নতে পারি এসব খবর, তারাও ঠিক্‌ঠাক্ তেমনি বহাল তবিয়তে আছে কিনা এও তো ভাবা দরকার। থা'কলেও এতদিন পর আচম্‌কা কোন্ পোড়া মুখ নিয়ে দাঁড়াবো তাদের সামনে? এ সব সমস্যা দেশেও মাথায় জেগেচে। তাই তো তার জন্যে তৈরীও হোয়ে এসেচি।

হ্যাণ্ডব্যাগ্ নিয়ে ঢুকলুম এক নির্জ্জন সেলুনে। ফেলে দিলুম ক'আনা পয়সা। 'সব ছেড়ে চট্‌পট্ আমায় শেভ্ ক'রে দাও। সরকারী জরুরী কাজ।' শেভ্ অন্তে আয়না সামনে কোরে লাগালুম মুখে নকল গোঁফ দাড়ি। বাঃ! খাসা মেক্-আপ্! একেবারে খাঁটি পেশোয়ারী দাদাজী। মুখের আট আঙ্গুলের মাথায় তাজা-চোখ না আ'নলে আর ধরে কে যে আমি বাংগালী? আর অত নিকটে চোখই বা আনে কে?

নাপিত ব্যাটা হাঁ কোরে তাকিয়ে রইলে। জিজ্ঞেস ক'রলে না কিছু। ক'রবে কি? ওর পিলে চ'মকে গ্যাচে, নিশ্চয়ই সরকারী গুপ্তচর, গোয়েন্দা পুলিশ আমি।

গট্‌গট্ কোরে বেড়িয়ে এসে ধ'রলুম কসাই বস্তির পথ। একটু বেশী পরিচয় ছিলো মনসুরের সঙ্গে। মাগ্‌রিবের জন্যে অজুর বদনা নিয়ে বাড়ীর সামনের রোয়াকে ব'সেচে সে। তার পাহাড়িনী স্ত্রীর সঙ্গে খুব খাতের ছিলো মায়ার। নিশ্চয় জানে এরা মায়ার খবর।

'আচ্ছালামো আলায়কুম, ওয়া আলায়কুমুস্‌চ্ছালাম' অন্তে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "দেখুন, নামাজের সময় আপনায় বেশী বিরক্ত ক'রবো না। একটি খবর জিজ্ঞেস ক'রতে চাই। সিংমারী নর্থ পয়েণ্টের ফরেষ্টরেঞ্জার মিঃ বালাসুন্দর ঠাকুরকে আপনি চেনেন কি?"

"ক্যানো বলুন তো? আপনার পরিচয়?"

"সেটা পরে হবে। তবে আপাততঃ জেনে রাখুন, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারী। তাঁকে আমার প্রয়োজন।"

"প্রয়োজন হ'লে তো আমি কোনও সুরাহা বা'ত্‌লে দিতে পারছি না। তাঁকে পেতে হ'লে আপনাকেও যে এ ধরাধাম ছা'ড়তে হয়। আপনার কোনও সরকারই আর তাঁর নাগাল পাবে না।"

"মানে, মারা গ্যাচেন?"

"জি হাঁ। বছর খানেক হ'লো।"

"তাঁর স্ত্রী?"

"এখনও বেঁচে। তবে অর্দ্ধ মৃত।"

"তাঁর মেয়ে ?"

"মনমায়া। এখন মহারাণী গার্লস্ হাই স্কুলে শিক্ষক।"

"মনমায়া দেবীর স্বামী কি করেন ?"

"স্বামী বোধ হয় এখনও মায়ের পেটে জন্মেননি। আর ব'লবেন না ছাহেব, খুলনার এক শিক্ষিত বাংগালী জুচ্চোর এসে মেয়েটাকে শেষ কোরে রেখে গ্যাচে। অমন সুন্দর মেয়েটি!—পুরুষের মোনাফেকিতে ও এমনি হাড়ে হাড়ে চটা যে বিয়ের কথা আর শুনতেই পারে না। আমাদের মুখেও চুনকালি প'লো। লোকটি মুছলমান। মেয়েটার দিকে লজ্জায় আর তাকাতে পারি না।"

"বেশ। খবরগুলোর জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে। আর বিরক্ত ক'রবো না। নামাজ পড়ুন। আচ্ছালোমো আলায়কুম।"

তাড়াতাড়ি পালিয়ে আ'সতে পারলে বাঁচি। গেলুম আশরাফ ভাইজানের কাপড়ের দোকানে। বিজলী বাতির আলোতে ঝলমল্ ক'রচে দোকানটি। দোকানের জিনিসপত্তরের পূর্ব্বে নজর প'ড়বে আট ন'বছরের একটি অতি সুদর্শন ছেলের উপর। এই সেই ছেলে,—খোকন্,—আমার 'তাতামিয়া।' ছেলের পিতাও দোকানে ব'সে। একজন কর্ম্মচারীও।

ঢুকতেই অভ্যর্থনা পেলুম, "আসুন, বসুন, কী চাই বলুন তো ?"

"শার্টিং-এর প'শমী কাপড়।"

নিলুম যেমন তেমন একটা। তারপর খোকার দিকে তাকিয়ে ব'ললুম মালিককে, "ছেলেটি বুঝি আপনার ? বেশ্ ছেলেটি।"

"জি হাঁ, আপনাদের দোওয়া।"

"স্কুলে তো নিশ্চয়ই যায়। কোন স্কুলে দিয়েচেন জনাব ?"

"মহারাণীতে।"

"সে তো মেয়ে স্কুল ?"

"জি হাঁ। প্রাইমারী সেক্শন্ পর্য্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন সিষ্টেমে ছেলে নেয়া হয়।"

"মনে কিছু ক'রবেন না। আমি নূতন বদ্লী হোয়ে এয়েচি। আমারও দু'তিনটে ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হবে। তাহ'লে মহারাণীতেই দিই, কি বলুন ?"

"আমার মতামত যদি চান জনাব, তো ঐখানেই ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনো ভালো হবে। তা ছাড়া এর খালাও ওখানে শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে খুবই নাম কিনেচে।"

"তাঁর নামটা জা'নতে পেলে খুশী হতুম। প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবেও ছেলেমেয়েগুলোকে তাঁর হাতে দিতে পারি।"

"নাম তাঁর মিস্ মনমায়া দেবী।"

যেন অবাক হোয়ে ব'ললুম "সে কি রকম হ'লো? মনে হয় আপনি মুছলমান।"

"জি হাঁ। অবশ্যই।"

"আর মিস মনমায়া দেবী নিশ্চয়ই মুছলমান নন?"

হেসে জবাব দিলেন, "ঠিকই তাই। পিতৃধর্ম্মে উনি বৌদ্ধ। তবে গোঁড়ামি কিছু নাই।"

"তবে কি কোরে আপনার পুত্রের খালা হন?"

"সে অনেক কথা। তবে আসল খালার চেয়ে কোনও অংশে কম নন্ জেনে রাখুন।"

"আচ্ছা, ধীরে ধীরে পর-পরিচয় হবে। রা'ত হ'লো। আ'জকের মতো আসি তবে। আচ্ছালামো আলায়কুম।"

এ তক্ আশা সফল হ'লো আমার।

পরদিন ছদ্মবেশে ঘুরুচি মহারাণী স্কুলের ধারে ধুরে। উদ্দেশ্য, মায়াকে দূর হ'তে এক নজর দেখবো। যাব কি সিধে একবার স্কুলে? নাঃ, দিনের বেলা ছদ্ম-বেশ নিয়ে ঠ'কেও যেতে পারি।

এক সময় দেখলুম মায়াকে। ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাঙ্গণে বেরুলো। ইউনিফরম্ পরা ছেলেমেয়েরা। মনে হচ্ছিলো পরীর রাজ্যি থেকে নেবে এসেচে ওরা। মুহূর্ত্তে সে কি উল্লাস আর মিষ্টি নালিশ মায়াকে ঘিরে ধ'রে, "মা-মণি, আমার ঘোড়ায় চ'ড়েচে দিপু। আমায় দিচ্চে না। ভ্যা—ভ্যা—এ্যা।"

"কাঁদিস্নে বাবা, কাঁদিস্নে খোকন। ওরে দিপু, তুই দে বাবা ওর ঘোড়া। তোকে আরও সুন্দর ঘোড়া দিচ্ছি।"

কাঠের ঘোড়া নিয়ে শিশুরাজ্যে এত কাণ্ড।

দেখলুম ছেলেমেয়েরা কেউ দিদিমণি বলে না। বলে মা-মণি। এ রকম মা মণি পেলে কোন্ ছেলেমেয়ে বাড়ীর মা-মণির কথা মনে ক'রবে? আমার ছেলেমেয়েরা এ রকম মা-মণি পেলে তো ব'র্ত্তে যেতো একেবারে। আহা বাছারা, এ যত্ন মমতা পায় না তারা। আর ঐ দুটো গুণের অভাবে কি কাঠখোট্টা হোয়ে না-মানুষ তৈরী হয় তারা। শেষে মুখ হা'সবে, বংশ ডুববে। কিন্তু উপায় কি মানাজানের কথ, চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপাল। বার্ণার্ডশ'র কথ শিশুদের অধিকাংশ ব্যাধি-বিপত্তির মূলে স্নেহ মমতার অভাব। ভেবে ভেবে চোখ দুটো সজল হোয়ে এলো

সন্ধ্যার কিছু পর পরই গেলুম সিংমারীর সেই কাঠের বাড়ীটাতে কতদিন, কতদিন পর। বাড়ী আর হা'সচে না উচ্ছ্বল হাসি। কেমন যেন গুরু গম্ভীর হোয়ে গ্যাচে বৃদ্ধ মূর্ত্তির মতো।

চড়ের জুতোর পীড়নে ঠক্‌ঠক্ শব্দে কেঁপে উঠ্‌লো কাঠের মেঝে, বাহির ঘরের বারান্দার। যেন তারা টেলিগ্রাফ তরঙ্গের মতো কেঁপে মায়াকে সাঙ্কেতিক ভাষায় জানাতে চায়, মায়াদেবী, হুশিয়ার। জুচ্চোর এসেচে, বাটপাড় এসেচে।' কেঁপে আমিও উঠলুম নিজের জুতোর শব্দ নিজে। হাত কাঁপচে বায়ু আন্দোলিত শুক্‌না পাতার মতো। তবু ঐ হাতেই বন্ধ দরজায় শেকল নাড়া দিলুম, টরে টক্কা টক্‌টক্—ঠগ্—ঠগ্।

ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো, "কৌন্ হ্যায়?"

"ম্যয় এক্ বান্দাহ্ হুঁ। আপ্‌কা খেদ্‌মত্‌মে ছোটাসা এক্ আরজী হ্যয়, আগর মেহেরবাণী কর্‌কে এক মিনিট কা দিয়ে ... ...।"

আবার প্রশ্ন, "কিস্ কো চাহ্‌তে হেঁ আপ?"

"মিস্ মনমায়া দেবী কো, যিন্ হোনে মহারাণী গার্লস্ ইস্কুল কা টিচার হেঁ।"

"ঠর্‌ ঠর্ যাইয়ে।"

মিনিট দুই পর দরজা খুলে গ্যালো। মুখ বের ক'রে উঁকি মা'রলে মায়া। তখনকার বুকের অবস্থা আমি জানাতে পা'রবো না। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ায় মুখ বন্ধ হোয়ে যাচ্চে। ওরে বুক, একটু শান্ত হ।' নইলে শান্ত সহজ ভাবে মায়ার সঙ্গে বাতচিত্ ক'রবো কি কোরে? সর্ব্বনাশ! ধরা প'ড়ে যাবো যে!

দা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াশা... ... ...

সুইচ টিপে বিজলী-বাতি জ্বালালে মায়া। বাইরে টুলের উপর ব'সেছিলুম। খাড়া হোয়ে গেলুম এবং গেলুম ঘরের ভেতরে। দুহাত জুড়ে কপাল পর্যান্ত উঠালুম. "নমস্তে।"

এ-নমস্কারের জবাব দিলে না মায়া। যেন অবাক হোয়ে চেয়ে রইলে আমার মুখের দিকে। হয়তো ভা'বচে, পেশোয়ারী মুসলমানের চেহারা অথচ মুখে নমস্তে! কি জানি সত্যিকার কী ভা'বচে সে। নারীর হৃদয় গহীনবন। বাঘ ভল্লুক সবই লুকিয়ে থা'কতে পারে সেখানে।

চাইলুম তার মুখের দিক্। দেখি তখনও সে স্থির-বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে র'য়েচে আমার মুখের পানে। সে কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! X ray-র মতো বুকের তলা অবধি দেখচে যেন। অনুরোধের প্রতীক্ষা না কোরেই ব'সলুম সামনের চেয়ারে। সেই চেয়ার। সে আজও তেমনি আছে যাদুঘরে রক্ষিত দুর্লভ সংগ্রহের মতো। এতে ব'সেচি যে আমি কতদিন অসংখ্যবার। চিনতে আমার মোটেই কষ্ট হ'লো না।

তাকে হতবাক্ দেখে কথা শুরু ক'রলুম আমি. খাঁটি বাংলায়, "দেখুন, দিন কয়েক হ'লো আমি এয়েচি এখানে বদ্‌লী হোয়ে। কেন্দ্রিয় সরকারের সামান্য চা'কুরী। এসে অবধি শুন্‌চি আপনার খুব নাম। তাইতো ছেলেমেয়েগুলোকে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। প্রাইভেট্ও পড়াতে চাই আপনাকে দিয়ে।

দাঁড়িয়ে আছে মায়া তখনও। কি দেখচে কী ও আমার মুখের পানে অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেই জবাব দিলে, "কিন্তু, নকল দা'ড়ি গোঁফগুলো খুলে ফেল্‌লে ভালো হয় না?

ব'ললুম রুদ্ধ নিশ্বাসে, "নকল দাড়িগোঁফ!"

জোরের সঙ্গে ব'ললে মায়া "হুঁ, নকল দাড়িগোঁফ। ও-ছদ্মবেশী সাজ নিয়ে অন্য কোথাও চ'ল্‌লেও এখানেও চ'লবে কি?

আতঙ্কগ্রস্থের মতো প্রতিধ্বনি কোরে গেলুম, "ছদ্মবেশী সাজ! এখানেও... ... ...!

একটু বিদ্রুপের হাসি নিয়ে ব'ললে মায়া, "গণনায় ভুল হ'য়েচে। এখাে
শুধু ছদ্মবেশ নিয়ে এলেই চ'লবে না। নাকটাও কেটে আ'সতে হ'তো।"

চোখ কপালে তুলে ব'ললুম, "নাক কেটে আ'সবো!"

ব'ললে সে তেমনি জোর দিয়ে, "জী হাঁ, শুধু নাক কেটেও নয়। চো
ছুটোও ফুটো ক'রে আ'সতে হ'তো।"

হতভম্ব হোয়ে প'ড়চি ক্রমে ক্রমে, "নাক কেটে, চোখ ফুটো ক'রে
তার মানে?"

মৃদু হা'সলে একটু। এ হাসিতে প্রাণ নেই। ব'ললে, "এর মাে
সবার কাছে ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে তার কাছে যে ম'রেচে। জ্যান্ত মানুষে
তো অন্তর থাকে না।"

ব'ললুম, "মায়া দেবী, এ কেমন সব হেঁয়ালী মনে হ'চ্চে। মরা মা
মানে বোঝে, জ্যান্ত মানুষ বোঝে না!

ব'ললে সে, "ঠিক তাই। পরিষ্কার কোরে দেবো?"

ব'ললুম, "অবশ্যই। নইলে যে গোলক ধাঁধাঁয় প'ড়ে গেলুম।"

সে ব'ললে, "তাহ'লে যে দাড়ি গোঁফ খুলতে হয়। এখনি সব পরিষ্কা
হোয়ে যায়।"

ব'ললুম, "দাড়ি গোঁফ কামালেই কথার মানে পরিষ্কার হবে?"

ব'ললে সে, "কামানো নয়। খুলে ফ্যালা। আমার নিজেরই জঞ্জা
পরিষ্কার ক'রতে হবে নাকি? তবে তাই হোক্।" ব'লে একেবারে নিক
এগিয়ে এলো রহস্যময়ী। মাথার দিক থেকে পট্ ক'রে খুলে ফেললে দাি
বাঁধন। পরচুলো দাড়িগোঁফ একটানে গ্যালো মায়ার হাতে। এবার ব'ললে হে
"ক্যামন্, এবার হ'লো তো?"

মাটির দিকে মাথা কোরে রইলুম। মুখ আর তুলতে পা'রচিনে।

ব'ললে মায়া, "তোমাতে যে ম'রেচে তার চোখকে দেবে ফাঁকি?" এব
কাঁপচে মায়ার কণ্ঠস্বর, "তোমার বাঁশীর মতো নাক যে শত সুরে কথা ব'লে উঠে
ও সুর থামাবে কি দিয়ে যদি নাক না কাটো? তোমার চোখ যে আমার বুে

ভেতরে ব'সে র'য়েচে। সেখান থেকে তাকে উপ্‌ড়াবে কি দিয়ে? মিথ্যে ছদ্মবেশ দিয়ে ভোলাতে চাও আমায়? তোমার ছায়া দেখলে চিনতে পা'রতাম।"

এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার শুরু ক'রলে, "একবার ব'লেছিলে না, মনে আছে? বিশ্বের সাড়ে তিন্‌শো কোটি লোক কেউ কাউরি মতো নয়? তোমার হাঁটা আর কারো হাঁটা নয়। তোমার গলার স্বর আর কারো স্বর নয়। একি শুধু দুদিনের খেলা খেলেচি যে তোমায় চিনতে কষ্ট হবে?"

কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলুম মাটির দিকে মাথা কোরে। কখন চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গ'ড়তে শুরু ক'রেচে টের পাইনি।

মাথা নত কোরেই ভাঙ্গা গলায় ডা'কলুম, "মায়া।"

তারও গলার স্বর স্বাভাবিক নয়। জবাব দিলে, "বলো।"

আবেগ জড়িত কণ্ঠে ব'ললুম, "মায়া, আমিও ম'রে গেচি। যা দেখছো, এ তোমার বাদশার খোলস, প্রেত মূর্ত্তি।"

চোখ তুলে দেখি নিস্পন্দ তার দেহ, বদ্ধ আঁখি পল্লব। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। ধ'রলুম তার দেহ, দিলুম নাড়া, "মায়া, মায়া।" সাড়া শব্দ নেই। আস্তে আস্তে ধ'রে বসালুম চেয়ারে। মাথার পাগড়ী খুলে বাতাস ক'রতে লাগলুম তার মাথায়। আস্তে আস্তে খুললে আঁখি কতক্ষণ পর। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস প'ড়লো বুক থেকে। ব'ললে ধীরে ধীরে, "তুমি ভয় পেয়ে গ্যাছো? আমি স্বপন দেখছিলাম, মরিনি।"

ব'ললুম, "বেঁচে যে ক্যামন্ আছো তা বু'ঝতে পা'রচি। আমাকেও তুমিই মেরে ফেলেচো। মেরে ফেলেচে তোমার হুকুম। নইলে এমন অবস্থা হবে ক্যানো তোমার আমার।"

ব'ললুম আরও, "যা হবার সেতো হ'য়েচে। কিন্তু আর নয়। হয় তুমি আমাকে নিজ হাতে মেরে ফেলবে, নয় তো আমার মরা দেহ মনটাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে।"

এতক্ষণে কথাগুলো যেন তার কানে গ্যালো।

ব'ললে, "সে সব হবে'খন। তুমি এলে কবে?"

"কাল।"

"কাল!" ব'লে ফেললে ফের একটি নিশ্বাস। "তোমার অসুখ ে
ছিলো তা টের পেয়েছিলাম।"

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "কি কোরে?"

ব'ললে সে, "স্বপ্ন। সেই স্বপ্নই তো কিছু আগে আবার স্মরণ ক
লাম। কিছুদিন আগে ভোর রাতে স্বপন দেখছি, তুমি এসেচো, কঙ্কালসার
তোমার দিকে চাইতে পা'রছি না। করুণ চোখে আমার সেবা চাইলে।
সহ্য হ'লো না। ঘুমের মাঝেই কেঁদে উঠলাম। মা আমাকে নাড়া দিয়ে
জাগিয়ে দিলে। আর ঘুম এলো না। নিশ্বাস বন্ধ হোয়ে আস্‌ছিলো। ...
খুলে দেখি আকাশে শুক্‌তারা ছায়া দিয়েছে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে জ
শিক্ ধ'রে ব'সে রইলাম।"

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "শুধু ব'সে রইলে? মিছে কথা।"

"তবে কি সত্যি কথা?" মৃদু করুণ হেসে শুধোলে সে।

ব'ললুম, "আমিও স্বপন দেখতে জানি। চোখের পানিতে বুক ভি
গেছলো তোমার। সত্যি নয়? বলোতো?"

হেসে ব'ললে, "যাও। তোমার স্বপন সত্যি নয়।"

ব'ললুম আমি, "তা না হোক্। কিন্তু এই বয়সেই মঠবাসিনী সন্ন্যা
সীর মূর্ত্তি ক্যানো তোমার?"

হটাৎ ব'লে ফেলেই লজ্জা হ'লো। বিবেক তিরস্কার কোরে উঠ
আমায়, "ওরে নরপিশাচ, ও কথা জিজ্ঞেস ক'রতে জিভে বা'ধলো না ে
ওর ঐ বেশ যে ক্যানো তোর চাইতে বেশী আর কে জানে?"

হেসে সহজভাবেই জবাব দিলে মায়া, "কই, কোথায় সন্ন্যেসিনীর
দেখলে আমার? এখনও ছুক্‌রীর সাজ নিয়ে থাকা সাজে আমার?"

ব'ললুম, "কেন নয়? কিই-ই বা বয়েস হ'য়েচে তোমার? তার
স্বামীর শত গণ্ডা ফার-ফরমায়েশ নেই। একটিও ছেলে পেটে ধ'রতে
তোমার।"

উল্টো শুধোলে আমায়, "তাহ'লে দিব্বি খাসা হালে খোশ্ মেজ
আছি, না? কে বলে ছেলেপুলে নাই আমার? কা'ল যেও স্কুলে। দেখ
আমার ছেলেমেয়ে আছে কি নাই।"

ব'ললুম, "সে আমি দেখে এয়েচি। বাকী নেই কিছু দেখার।"

ব'ললে সে, "ওঃ। বহুরূপী সেজে সে কম্মও কোরে এসেছো? কী সাজ নিয়ে গেছলে শুনি? বাদশার, না ভিখিরির?"

ব'ললুম, "ভিখিরির। হাত পা'তলুম তোমার কাছে। মিললো না কোনও দয়া।"

সে ব'ললে, "কই, ও রকম ভিখিরি তো কাউকে চোখে পড়েনি?"

ব'ললুম, "তোমার কথাই ধার ক'রে বলি মায়', ও রকম ভিখিরিকে বাইরের চোখে দেখা যায় না। দেখতে হ'লে আমার মতো ম'রতে হয়।"

হেসে ব'ললে, "বাঃ। বিবি বাচ্চা নিয়ে মজা করে যে, সে আবার মরে কি কোরে?"

ব'ললুম, "ঐটেই তো তোমার মারাত্মক ভুল পোড়ার্ মুখি। তুমি ব'লেছিলে বাপ মা'র অবাধ্য হোয়ো না। এখন অবাধ্য মন নিয়ে আমি দিনে রাতে মুহূর্মুহু কত লড়াই ক'রবো নিজের সাথে? মজা! হায়রে মজা! এমন মজা আগে জা'তুম যদি, তো তোমার সামনেই প্রথম বারে বিষ-অমৃত পান কোরে চির-কাল থা'কতুম দার্জ্জিলিং-এ। ফিরে আর যেতে হ'তো না নীচের নরকে।"

সব শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে মায়া। দেখলুম রসায়ন ধ'রেচে। আবার শুরু ক'রলুম, "তোমার ও-অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই। আমার অবস্থার জন্যে তুমি ষোলো আনা দায়ী। আমি তো সব কিছু ক'রতে রাজী ছিলুম। রাজী হ'লে না তুমি।" চুপ্ কোরে রইলে সে। মনের খেদ ঝা'ড়তে লাগলুম, "আবার ব'লবো। জেনে শুনেই তুমি আমাকে মেরে ফেলেচো। তুমিই না ব'লেছিলে যার তার হাতে প'ড়লে আম মাটি হোয়ে যাবো?"

এবার ফুঁপিয়ে উঠলে মায়া। তবু থা'মলুম না। ব'লে চল্লুম, "আমি তো তোমার হুকুম পালন ক'রেচি। বাপ মা'র অবাধ্য হইনি। হোয়ে লাভও ছিলো না কিছু। এবার নাও আমার মরা দেহটি। আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে পা'রবে না। আমি আর ফিরবো না। ম'রবো,—এইখানেই ম'রবো,—তোমার সা'মনেই ম'রবো।"

আর থা'কতে পা'রলে না সে। বাম হাতে নিজের মুখে আঁচল গু
দিয়ে ডান হাতে দিলে আমার মুখে চাপা। রুদ্ধ আবেগময় ক্রন্দন কথা বল
সুযোগ দিচ্ছিলো না তাকে। নিশ্চয়ই তার বিবেক ব'লচে যে আমি মি
বলিনি। আমার শরীরের অবস্থা সে তো নিজে চোখে দেখতে পাচ্চে। তা
ছেড়ে সংসারে সুখ পেলে এতোদিন পর কেউ যে করুণার জন্যে ভিক্ষের ঝুলি নি
কারো কাছে হাত পাতে না সে-তো ভালো ক'রেই জানে তা। সুখের মুখ দেখ
সংসারের সঙ্গে যে অহরহ লড়াই কোরেচি তবু সুখ পাইনি সে যা আমার মুখ দে
অবিশ্যিই সে টের পেয়েচে। তাই তো বিবেকে দংশনে আ হোয়ে উঠেচে সে
আমার দোষারোপকে সত্যি জেনে নিজকেই দায়ী ক'রচে আমার বর্ত্তমা
অবস্থার জন্যে।

এই মুহুর্ত্তে মায়ার বুকে যে বুক-ফাটা কাত্রানী গোঙ্গিয়ে উঠচে সে তো
আমিও অনুভব ক'রচি। তার মনের স্বভাবও আমি জানি তো।

কেঁদে কেঁদে শক্তি তার নিঃশেষ হ'য়ে এলো। আমিও চুপ্চাপ্ ব'সে
আছি তার পাশে। ব'লবার সব কথাই তো হারিয়ে ফেলেচি তার কান্না দেখে।

কান্না থা'মলেও মুখ তুলে চাইলে না আমার পানে। ডান হাতের
নখ দিয়ে টেবিল খুঁট্তে খুঁটতে ব'ল্লে, "কা'ল রাতে ছিলে কোথায়?"

ব'ললুম, "আমার আগের জায়গায়। স্যানিটারিয়ামে।"

"রা'তে এখানে থা'কবে না?"

"থাকা ঠিক হবে কি? কথা উঠতে পারে। এখন তুমি শিক্ষক।"

কী যেন ভা'বলে সে মূহুর্ত্ত কয়েক। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে ব'ললে,
"সেই ভালো। রাতে তুমি স্যানিটারিয়ামেই যাও।"

কথা শুনে মন আমার মুষড়ে প'লো। না হয় ব'ললুমই বা থাকা ঠিক
হবে না, কথা উঠতে পারে, এখন তুমি শিক্ষক। তাই ব'লে তুমি জেদ্ ক'রে
রা'খবে না? না না ব'ললেও পূর্ব্বে তো তুমি ছেড়ে দাওনি? মন বুঝবার জন্যে
অমন কথা আবার মানুষে বলে না? শ্বশুড় বাড়ী আমরা যাই। স্ত্রী সেখানে
থা'কলে মনের ষোলআনা ইচ্ছে থাকে রা'ত সেখানে কাটাই। আদর টাঙ্গিয়ে
মুখের ভরমে বলি, থাকবো না, থা'কতে পা'রবো না। বাড়ীতে শত গণ্ডা

চাক্ষ।' শ্বশুর বাড়ীর সকলে পাকা মনোবিজ্ঞনী পণ্ডিত। শালাশালীরা আরও ড়ো মনোস্তাত্বিক। শ্বাশুড়ীর ইঙ্গিত। জোর ক'রে ধ'রে রাখে। তাতে কি ব্যাজার হয়? শ্বাশুড়ী বেটি মনে মনে হাসেন, 'বাছাধন, ওসব ঢং আমরা ঝি। তোমার মতো তোমার শ্বশুর হুজুর কেবলাও একদিন এমনটিই ক'রতো। আর ঢং দেখাতে হবে না। এখনি ছেড়ে দিই তো বাড়ীতে গিয়ে ঢেঁকির উপর রাগ ঝা'ড়তে হবে।' শালীরা হাতের ব্যাগ কেড়ে নিয়ে হা'সতে হা'সতে ছড়া বলে, "কতো রঙ্গই জানো বন্ধু, কতো রঙ্গই জানো, তোমা হেন... ... ...।"

জবর দস্তি যেখানে পরম সুখ, জিদ্ যেখানে চরম তৃপ্তি, নিস্পৃহতা সেখানে অবহেলার মতো কঠিন হোয়ে বুকে বাজে। আমার বুকখানাও তেমনি খড্ড দ'মে গ্যালো। তাইতো ক্ষুণ্ণ অভিমানে ব'ললুম মায়াকে, "মায়া, আমি যেতে চাইলেই তুমি যেতে দেবে? জোর ক'রে ধ'রে রা'খবে না?"

সরল সংক্ষিপ্ত জবাব, "না।"

"আগে তো রা'খতে জিদ্ ক'রে?"

"তখন ছিলাম বেপরোয়া স্বাধীন।"

"তবু তখন ঘাড়ের উপর পিতা ছিলেন। বুড়ো মাকে তো কোনওদিন কেয়ারই করো না। এখন পিতা নেই, তবু স্বাধীন নয়? জিজ্ঞেস করি, কার অধীনে তবে?"

আমার চাপা রাগ দেখে একটু হেসে ব'ললে, "তোমার গো, তোমার। আবার কার?"

বিস্ময় মা'নলুম হেঁয়ালী জবাব শুনে। ব'ললুম, বেশ বলিহারী জবাব। আমার অধীন, আর আমাকেই খেদিয়ে দিচ্ছো। চমৎকার অধীনতা! ও-রকম হুকুম কবে দিয়েচি আমি?"

ভারী যেন মজার ব্যাপার। তেমনি আমোদের সুরেই ব'ল্লে, "হুকুম কি সব সময় মুখেই দিতে হয়? তোমার গিন্নীকে কি সব সময় হুকুমেই উঠ্ বোস্ করাও নাকি? তোমাকে চিনে কি তোমার অব্যক্ত অলিখিত আদেশ জা'নতে পারেন না? তবে আর কিসের... ... ...

গিন্নীর নামে মাঝখানেই জ্বলে উঠে ধমক্ দিলুম, "রাখো গৃহিণীর কথা
তোমার কথা বলো। কবে তোমাকে হুকুম দিলুম যে ... ... ?"

"বেশ আমার কথাই বলি। আমাকে কি তোমার অন্তরাত্মা হুকুম আয়নি
যে মায়া রাক্ষুসী, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার অবর্ত্তমানেও যেন তোমা
নিয়ে আমার মুখে চুনকালি না পড়ে। এমন একদিন ছিলো যেদিন তোমায় মি
সব কলঙ্কই কাটিয়ে উঠতে পা'রতাম। আর আজ ... ...

বিস্ফারিত চোখে কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "আর আজ ?"

"আর আজ আমি সন্তানের মা।"

আরও বিস্ময় আমার চোখে মুখে। চোখ জ্বলে উঠচে ব'লতে, "সন্তানের
মা !"

"হ্যাঁ, সন্তানের মা।"

বলে কি রাক্ষুসী ! আমার গা মাথা যে ট'লচে। শুধালুম, "কার
সন্তানের মা তুমি ?"

কৌতুক-ভরা জবাব তার, "তোমার সন্তানের গো, আবার কার ? অত
মাতালের মতো ট'লচো ক্যানো ?"

ব'ললুম ধমক্ মেরে, "হেঁয়ালী রাখো, সত্যি কথা বলো।"

হেসে ব'ললে, "সত্যি কথাই তো ব'লছি। সন্তান তোমার নয় তো কি
আমার ? আমি তো আয়া শুধু। তুমি চ'লে গেলে। কতদিন কেটে গ্যালো।
বাবা মারা গেলেন। কি ক'রবো কি ক'রবো ভা'বচি, এমন সময় বুকের ভেতর
থেকে তুমি হুকুম ক'রলে, 'মায়া, ব'সে থেকে জীবনটার অপচয় ক'রো না।
দেশের সন্তানদের মানুষ ক'রো। তারাও আমারই সন্তান। আমি তো আপন পর
ভেদাভেদ করিনি।' কান পেতে শুনলাম এ আদেশ। মাথা পেতে নিলাম এ গুরু
ভার। সেই থেকেই তো আয়া হোয়ে পরিচর্য্যা ক'রছি তোমার সন্তানদের।"

এতক্ষণে পানির মতো পরিষ্কার হোয়ে গ্যালো সকল রহস্য। মনে মনে
অবাক হোয়ে মনে মনেই ব'ললুম, 'মায়া, দুনিয়ার বুকে সত্যিক্যারের সাধুই তুমি।
তাইতো তোমার ধ্যান লব্ধ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মতোই সত্যি ব'লে বিশ্বাস
ক'রেচো। রহস্যময়ী, তুমি চিরকালই আমার কাছে একটি রহস্যের যবনিকা ব'লে

রইলে। পারলুম না কোনওদিন সে যবনিকা উত্তোলন ক'রতে। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি ? আমার মতো এমন পাপিষ্ঠকেও এমন ভালোবাসাই তুমি বেসেছিলে। আমার কপালে কত সুখ, কত দুখ। এ আলো আঁধারির দুনিয়ায় এক পাশে রইলো আমার আলো,—অত্যুজ্জ্বল আলো ;—আরেক পাশে রইলো ঘোর কালো সূচিভেদ্য অন্ধকার,—নরকের গভীরতম গহ্বর। আমার প্রেম আর আমার কাম। প্রেমের সঙ্গে কামের মিলনে উৎপন্ন হয় জীবন-রসায়ন, জন্মলতে অমৃতের সন্তান। নইলে শুধু গরল, শুধু হলাহল। আমার জীবন তাইতো বৃথাই গ্যালো। পূর্ণ হ'লো না কোনওদিন।

রসায়নে ধ'রেচে আমায়। তাই বুঝে মায়া জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি, চুপ্ রইলে ক্যানো ? এ আদেশ যদি সত্যি না হয় তো ব'লে যাও কী তোমার হুকুম।"

ব'ললুম চিন্তিত মুখে, "তুমি ঠিক আদেশই শুনতে পেয়েচো মায়া। তোমার নির্ম্মল বিবেক মিথ্যে বলেনি তোমায়। এর চেয়ে উপযুক্ত শোভনীয় আদেশ আমি দিতে পা'রতুম না।"

"তোমার পরবর্তী হুকুম ?"

"পরের হুকুম পরে হবে। মা হোয়ে সন্তানের কাছে যে ছোট হ'তে চায় না সেই তো সত্যিকারের মা। তার প্রতিরক্ত বিন্দু মাতৃত্বের স্বর্গীয় বিভায় ভাস্বর। তেমন মায়ের পায়ের তলায় বেহেশ্‌ত্ গড়াগড়ি যায়। আর অমন পরশ-মণি পা দিয়েই কাদাতুল্য সন্তানকে সে বেহেশ্‌তের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলে। মায়া, মা না হোয়েও তুমি শত সন্তানের মা, সত্যিকারের মাতৃত্ব গুণের অধিকারিণী। আর একজন মা হোয়েও... ... ..."

মাঝখানেই ধমক্ দিয়ে কথা কেড়ে নিলে মায়া, "থা'ক্ সে সব কথা। তুমি শুধু নিজের মানুষের দোষই দ্যাখো। তুমি বড় এক চোখো। একবার ভাবে পেলে আর কথা নাই। শুধু কুৎসা আর নিন্দা।"

হেসে ফেল্লুম। ব'ললুম, "তুমিই বা আমার কম কি ক'রচো ? ও-দোষের দোষী তুমি নিজেও তো হ'লে। একটা গল্প শুনো। গল্প নয়—সত্যি ঘটনা। একজন সরল নিরীহ বুড়ো শিক্ষকের একটি সদ্‌গুণ ছিলো। অসাবধান অমনোযোগিতায় ছাত্রদেরকে তিনি শালা ব'লে গা'ল পা'ড়তেন। একদিন হ'য়েচে

কি। কয়েকজন নামকরা ছাত্রকে দেখতে না পেয়ে তিনি অন্যান্যকে জি
করেচেন, 'ও শালারা গ্যাচে কোথায়?' পরে তারা ক্লাশে এসে একথা শ
পায় এবং হেড্ মাষ্টার মশায় অভিযুক্ত শিক্ষককে ডাকেন এবং অভিযোগী ছাত্রগ
সাক্ষী-সাবুদ। অভিযোগ শুনে অভিযুক্ত শিক্ষক বলেন, 'কখন ব'ললুম অমন
কথা?' ছাত্রগণ সাক্ষ্য দেয়, 'আপনি ব'লেচেন ক্লাসে আমাদের সামনে।
সবাই সাক্ষী আছি।' বিরক্তির সাথে জবাব দেন শিক্ষক মশায়, 'স্যর্, সব
মিথ্যে কথা কয়।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠলে মায়া। হা'সলুম আমিও।

রা'ত ভারী হ'লো ব'লে বিদেয় নিলুম সেদিনের মতো। সে
মনেই বিদেয় দিলে। কিন্তু থা'কতেও ব'ললে না, বাধাও দিলে না।

——::——

চব্বিশ

দিন যায়, রা'ত যায়।

আমার দিন রা'তগুলোও ব'সে থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মে থা
কথাও নয়। কিন্তু মায়ার লঘু চরণপাতের মতো বড্ড তাড়াতাড়ি যাচ্চে
দেখতে দেখতেই সপ্তাহ কেটে গ্যালো। তবু মনে হ'চ্চে যেন গত কা'ল
এসেচি।

আর নীচের দিনগুলো যেতো আমার ফোক্‌লা মুখো নানার গুরু পদক্ষে
হাঁসের চলার মতো থপ্‌থপ্ কোরে। যেতে চাইতো না, ঠেলতে হ'তো।
কোরে ঠেলতে হয় বোঝাই করা আধ-মরা গরুর গাড়ী। কোর্টে মামলা,
গৃহিনীর ঝামেলা। চব্বিশ ঘণ্টা চব্বিশ দিনের মতো বোঝাই হোয়ে ঘাড়ে চাপ
মিকাবারের মতো আগামী কাল কোনও আশাই ব'য়ে আনতো না আমার

এখানে কাটে কিছু সময় মায়ার প্রীতিদায়িনী সাহচর্য্যে, আর বাকী সময় কাটে স্বপ্নময় কল্পনার জাল বুনে। এখানে আমার শারাবও যে, সাকীও সে। দুটো আলাদা ক'রে খুঁজতে হয় না। তাইতো বাইরের ধারও আমার তেমন ধা'রতে হয় না। আমার শারাব-সাকীই আমার জন্যে কাফী।

দার্জ্জিলিং-এর ছোট্ট পরিসরে আলাহিদা পরিবেশে জীবন আমার সংঘাতময় নয়। সংঘাত যা কিছু মায়ার সঙ্গে, নিজের মনের সঙ্গে। দু'একটি মাত্র অতি পরিচয়ের বাড়ী। আশরাফভাইজান, মনসুর, আদিল, হাসিবজান। অত্যন্ত মাখামাখি শুধু আশরাফ ভাইজান আর তাঁর পাহাড়ী বিবির সাথে। নইলে আমার মতো বাংগালী প্রেমিক নিয়ে মায়া আর কোথায় উঠবে সম্পুর্ণ পাহাড়ীদের মধ্যে? হাঁড়িয়া আর পচানীখেকো মূর্খ পাহাড়ীরা কেন সাদর অভ্যর্থনা জানাবে অদ্ভুত প্রেমিক যুগলকে? তাইতো কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই মনে উদয় হ'তো ঐ ক'টি বাড়ীর কথা,—বিশেষ ক'রে আশরাফ ভাইজানের।

কিন্তু বেড়ানোর অবসর মায়ার বড্ড কম আজকা'ল। আজকা'ল সে যে শত সন্তানের মা। পাহাড় ডেঙ্গিয়ে বরফের উপর সোনালী মুকুটের আভা ফেলে, যে-মহারথী তার সপ্ত অশ্বের স্বর্ণ শকট চালিয়ে আ'নতো, প্রথমেই সে দেখতে পেতো মায়াকে চায়ের পানি গরম ক'রতে। এ চা দিতে হবে ডুবন্ত বৃদ্ধা মাকে তার জ'মে যাওয়া রক্তকে গরম ক'রতে। নিজেও সে খাবে এক বাটি। এর পর ধীরে ধীরে আ'সবে তার গুটি কয়েক ছেলেমেয়ে, পড়াশুনো দেখে নিতে আর খেলতে। উনুন জ্ব'লতেই থা'কবে। তার ধারে ব'সে প'ড়বে আর গা গরম ক'রবে ছেলে-মেয়েরা, আর মায়া তৈরী ক'রবে খান কয়েক রুটি, কিছু তরকারীর সুরুয়া। আজকাল নিরামিষাশী সে। দিন ভর বৃদ্ধার জন্যে দুবাটি চা, কিছু ফলের রস, আর ছটাক খানেক দুধ। চাইবে না বৃদ্ধা কিছু। মনেও থাকে না। ছেলে মানুষের মতো জোর ক'রে আদর ক'রে খাওয়াতে হয়। সদাসর্ব্বদা তাঁর সামনে আজকাল বুদ্ধ মূর্ত্তি। নব প্রসুতি যেমন কোলের ছেলেকে চোখের আড়াল হোতে দেয় না এও ঠিক্ তেমনিই। বৃদ্ধা—ধর্ম্মমুগ্ধা। আর কারো খোঁজ নেবার প্রয়োজন তাঁর শেষ হ'য়েচে।

ছেলেমেয়ে পড়িয়ে আদর সোহাগ ক'রে বৃদ্ধাকে দুধ খাইয়ে সময় হ মায়া যায় স্কুলে। ছেলেমেয়ের সামনে চ'লবে না তার সনে ইয়ার্কি। এ কিন্তু বড্ড হুশিয়ার মায়া। নিজেকে ছোট সে হ'তে দেবে না তার ছেলেমেয়ের সামনে।

তাইতো সময় জুটতো শুধু বিকেলের দুঘণ্টা আর সাঁঝের বাতির পর।

এ সময় কা'টতো কিছু ঘুরে ফিরে, কিছু পড়াশুনো ক'রে, কিছু মায়ার মধুময়চিন্তা কোরে। বিকেল আর কা'টতো না। যেতুম পুরাতন কাঠে বাড়ীটাতে।

সেদিন শনিবার সন্ধ্যে। আগামী কাল ছুটি। মায়া ব'ললে, "ত্যাখে ক'দিন হ'লো এসেছো, দিদির বাড়ী একবারও গেলে না।"

ব'ললুম, "আমার বড়ো লজ্জা ক'রচে মায়া। কোন মুখে যাই। তোমা কাছে এসেচি মুখ পুড়ে। তবু জানি, আমার মুখ পোড়াই হোক্ আর আস্তই থা'ক এ মুখের দিকে তুমি না তাকিয়ে থা'কতে পা'রবে না। সে ভরসা আমার আছে কিন্তু তাই ব'লে আর কারু কাছে যাওয়ার মুখ রেখেচি আমি? আশরাফ ভাইজানে দোকানের কাহিনী তোমাকে তো ব'লেচি। তবু ছদ্মবেশ ছিল তাই লজ্জা ঢা'কতে পেরেচি।"

এক মিনিট কি চিন্তা ক'রলে মায়া। তারপর ব'ল্লে, "আচ্ছা, ঠি আছে। তুমি কা'ল আটটার ভেতরে এসো। হ্যাঁ ভালো কথা, আ'সবার সম তোমার কাবুলীর পোষাক আর পরচুলোগুলো অর্থাৎ দাড়িগোঁফ হাত ব্যাগে কোরে এনো তো।"

ব'ললুম, "কেন বলো দিকিন? হটাৎ অদ্ভুত হুকুম?"

সে ব'ললে, "আমার সখ, আমার ইচ্ছা। অত ক্যানোয় দরকার কি তোমার?"

ব'ললুম, "বেশ। তাই হবে। যো হুকুম্ মহারাণী। গোস্তাখী-এ মাফী চাহ্তাহুঁ।"

"ব্যস্। গোস্তাখী মাফ্ কর দিয়া যায়েগা আগর হুকুম্ বেকসুর পুরা পুর তা'মিল হো যায়।"

"উস্‌কো কোই কসুর না হোগী দিল্ পানাহ্।"

তর্জ্জনী উঁচিয়ে ব'ল্লে, "ইয়াদ্ রাখ্‌খো।"

পরদিন হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তা'মিল ক'রলুম। চা খাওয়ার পর নিজ হাতে দাড়িগোঁফ লাগিয়ে দিলে। মনের খুশী স্নিগ্ধ হাসিতে উপচে প'ড়চে। চোখ দু'টোও আনন্দে ময়ূরীর মতো না'চ্‌চে। ব'ললে, "বাঃ! ঠিক্ হ্যায়্। লম্বা যোয়ান, লাল রং, মাথায় কুলাহ্ পা'গড়ী, পরনে ছিল্‌ওয়ার পাজামা, পায়ে চপ্পল। আর ধ'রে কে? চলোজী।"

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "দিনের বেলায় এ ছদ্মবেশে কোথায়?"

তর্জ্জনী ঘোরালে, "ফের্ জিজ্ঞাসা? কারণ জা'নতে মানা।"

ব'ললুম যেন বিরাট ভুল ক'রেচি, "ওহ হ্যাঁ! ভুলে গেচলুম যে আমি নারী-খিযিরের পাল্লায় প'ড়েচি।"

"নারী-খিযির আবার কি?" বিস্ময়ে জিজ্ঞেস ক'রলে।

ব'ললুম, "কোর্‌আন্ পড়ো। সব মানে জা'নতে পা'রবে। জীবনের মরণের সব।"

"তাই ব'লে এখন আর তোমার বলা চ'লবে না? ভারী তো বিদ্যার গরব।"

"মেয়ে মানুষের কাছে ও-গরব একটু ক'রতে হয় নারী। নইলে পুরুষের পৌরুষে অভিমান জন্মে।"

"বেশ পুরুষ-প্রধান, এবার ওঠো।"

আত্ম-সমর্পণের সুরে ব'ল্লুম, "চলো। হে জাহাঁঙ্গীর-মূসা, তোমার শুধু হুকুম তা'মিল ক'রবার; প্রশ্ন ক'রবার নয়।"

রাস্তায় যেতে যেতে ব'ল্লে মায়া, "দ্যাখো, দুচা'রটে পোশতু তোখোড়ো মোখোড়ো দাগা দাগা' জানো তো?"

এর পেছনে মজা যে আর একটি আছে তা অনুমান ক'রে মায়ার কথা বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠলুম। ব'ললুম, "অঙ্কের কাছে পা'রবো, যেমন, 'স্তেরে মোশে, খোয়ার্ মোশে', আশরাফ খে হালক্ দাই।"

আশাপূর্ণের আনন্দে উৎসাহে ব'লে উঠলে মায়া, "ব্যস্, ব্যস্। ওতেই কাজ চ'লবে। নেহায়েত কিছুই না জানো তো দিদির সামনে আমার প্রতি কথার জবাবে মাথা নেড়ে শুধু ব'লবে, 'নেকি নেহি দাগা দাগা।'

দু'জনেই হেসে উঠলুম হো হো কোরে। সদর রাস্তাটিও প্রতিধ্ব জাগিয়ে হো হে ক'রে হেসে উঠলে। সে হাসির তরঙ্গ জলতরঙ্গের বাজনার মে কানে ভেসে এলো।

ও-সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রলুম না। নিজের দু'একটি বর্ণন অযোগ্য কথা হ'তে হ'তে পৌঁচে গেলুম দিদির বাড়ী। অর্থাৎ মায়ার দিদি, আম ভাবী, আশরাফ ভাইজানের বেহেশ্‌তী নেয়ামত।

বন্ধ বাহির দরজায় গিয়ে এ্যাতো জোরে ঘট্ ঘট্ খটাঘট্ ঘটাঘট্ শ শেকলের কড়া বিপদ্‌ঘন্টির মতো নেড়ে চ'ললে যে ভেতরে থেকে বিরক্তির সা ভয়ার্ত নারী-কণ্ঠের রূঢ় জিজ্ঞেসা শোনা গ্যালো, "কৌন্ হ্যায়্ ?"

মায়া জবাব দিলে, "তোমার ভাসুর।"

"কে রে ? মায়া ? ভাসুর আবার কি রে হতচ্ছাড়ি ?"

কড়া নেড়ে চ'লেচে আর ব'লচে মায়া, "নয়তো কি খোকার আব্বা ? অত জেরায় দরকার কি তোমার ? দরজা খোলো না বাপু ?"

"দাঁড়া, হাত জোড়া।"

মায়া ধ'ম্‌কে উঠলে, "দূত্তোর তোমার হাত জোড়া !"

ভেতর থেকেও ধমক্ এলো, "একি ডাকাত প'ড়েচে যে অমন ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছিস্ ? একটু তর্ সইছে না ?"

"ডাকাত কি গো ? মেয়ে-ধরা। আমায় ধ'রে নিয়ে যা'ক্ আর তুমি ভেতর থেকে তক্ক ক'রতে থাকো।"

"দাঁড়া রে মুখপুড়ি, তোর ফা'জলেমি বা'র ক'রছি।" ব'লে এসে দরজ খুলেই এক অপরিচিত কাবুলীকে মায়ার কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে আঁচকেঁচিয়ে উঠলেন। এবং 'ওমা' ব'লে পেছনে একটু হ'টে গেলেন।

মায়া ব'ললে, "নিজ চোখে দ্যাখো না মিছে ব'লছি ? মুখপোড়ার আ বাকী থা'কলো কোথায় ?"

আমার দিকে ফিরে চ্যালেঞ্জ দিলে মায়া, কী তার চোখ মুখের ভঙ্গী, অসহায়া যেন কত জোর পেয়েচে দিদিকে দেখে। ব'ললে, "আইয়ে না খাঁ সাহেব। থা'মলে ক্যানো ? দিদির সা'মনে থেকে ধ'রে নিয়ে যাও। দেখি তোমার মুরোদটা !"

আমি এ সব বাংলা জবানের আর কি বুঝি। তাই মাথা নেড়ে ট্রেনিং মাষ্টারের গৎ তোতা পাখীর মতো আউড়িয়ে গেলুম, "নেহি নেহি দাগা দাগা।"

মায়া ভয়ানক রাগের ভঙ্গীতে ব'ললে, "ভাল-মা'নুষের মতো এখন নেহি নেহি ব'ললেই হ'লো? পরের মেয়ের হাত ধ'রে টানাটনি এবার দেখিয়ে দিচ্ছি। একবার এসো না ভেতরে?"

মাথা নেড়ে ব'ললুম, "নেহি নেহি দাগা দাগা।"

ব'ললে মায়া, "ছুবোনকে দেখেই তোমার পিলে চ'ম্‌কে গ্যাছে যে নেহি নেহি বোল্‌ ছা'ড়ছো? দিদি, তুলাভাইজান কোথায়? এই ঠগী পেশোয়ারীকে সায় দিয়ে ধ'রে এনেছি। একে শায়েস্তা ক'রতেই হবে।"

দিদি কাঁ'পচেন, মুখ চোখ কালো হোয়ে গ্যাচে। কোনও রকমে জবাব দিলেন, "তোর ভাইজান বাজারে গ্যাচেন।"

মায়া বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে ব'ললে, "তাতে কি। ছুবোনেই যথেষ্ট। পাহাড়ের মেয়ে নই আমরা? এসো না খাঁ সাহেব, ভেতরে এসো। হিম্মত নেহি হ্যায় আন্দর আনে কা?"

কাবুলী মানুষ হিন্দুস্থানে এয়েচি আর হিন্দুস্তানী বুঝিনে? গায়ের গোস্ত ফুলিয়ে জবাব দিলুম, "জরুর। পাঠান কা হিম্মত্‌ নেহি হ্যায়! ক্যা তাজ্জব্‌ কা বাত্‌ বিবি?"

মায়া গর্জ্জে উঠলে, "খবরদার। বিবি বিবি ব'লো না। চৌদ্দ পুরুষের বিবি। কী, তোমার সঙ্গে আমি নিকেহ্‌ পুষেছি? আও ভেতর্‌ মে, আগর তুম্‌হারা হিম্মত্‌ ছিনে মে পুরা রহে।"

গট্‌গট্‌ কোরে মায়ার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে গেলুম। ইশারা ক'রে দিদি ডা'কলে মায়াকে আঙ্গিনার এক ধারে, এবং মুখেও ছোট্ট ক'রে ব'ললে, "মায়া, শোন্‌।"

মায়া শুনতে গ্যালো। দিদি ব'ললেন চাপা গলায়, "এ তোর কি রকম আক্কেল মায়া। হটাৎ তোর একি মতি গতি হ'চ্ছে? এতদিন তোকে দেখলাম কি, আর আজ দেখছি কি? আমার মনকে তুই ফাঁকি দিবি? তোর দোষ না থা'কলে

কেউ তোর পিছে লা'গতে পারে? তুই-ই রাস্তা থেকে এ জংলীটাকে ধ'রে আ'নছিস্। আর একেবারে বাড়ীর ভেতরে এনে হাজির কর্‌লি ?"

মায়া কৃত্রিম অভিমান ভরে চোখ মুখ পাংশুটে করে দিদিকে দোষারোপ ক'রলে, "বারে ! আমায় দোষাচ্ছো ক্যানো ? ভালো কথা, মেনেই নিলাম আমি ধ'রে এনেছি। তো দোষটা ক'রলাম কোথায়? তুমি এক পেশোয়ারী পাঠানকে নিয়ে যুগ যুগ ঘর সংসার ক'রছো, আর আমি কেবলই একজনকে ধ'রে এনেছি এখনো তো কিছু করিইনি। তাতেই তোমার এত হিংসা যে জ্ব'লে পুড়ে ম'রছো আমার এমন হেন যৌবনটা যে মাঠে মারা গ্যালো সে দিকে কোনো দরদ নাই, নাকে কাঠি দিয়ে একবার হাঁচো না। আর মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ অবলম্বন কোরে তোমার দেখাদেখি কেবল একজনকে জুটে আ'নলাম তো অমনি এক মুখ গালি গালাজ আরম্ভ কোরেছো।"

দিদি ব'ললেন, "নে, ভাল কথা ব'ললাম আর ধ'রে নিলি উল্টো। তোর সবই উল্টো পাল্টা কাজ মায়া।"

ব'ললে মায়া, "উল্টো আবার কি ? লোকটা দেখতে শুন্‌তে তোমার বরের চেয়ে মন্দ কি ? না হয় তুমিই বাপু নিয়ে নাও অত হিংসা যদি হোয়ে থাকে।"

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখচি। অনেক কথা ব'লে মায়া হাঁপিয়ে উঠেচে তাও বুঝ্‌চি। আমারও একটা বলা দরকার ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে তাই এতক্ষণে আর একবার বাঁধাগৎ আওড়ালুম, "নেহি নেহি, দাগা দাগা।"

দিদি সে দিকে কর্ণপাত না কোরে মায়াকে লক্ষ্য কোরে তার কথার জবাব ব'ললেন, "যাঃ, পোড়ামুখি, দূর্ হোয়ে যা। যা মুখে আসে তাই বকিস্।"

আমি দাঁড়িয়েই র'য়েচি ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকিয়ে, আর মান অভিমানের পালা শুন্‌চি। আমারও কিছু বলা দরকার। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থা'কবো বাংলাও জানিনে। মাতৃভাষা পোখ্‌তু (পাকা ভাষা); ভাব প্রকাশের জন্যে দৈন্য নেই। নিজের ভাষাতেও অন্ততঃ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা দরকার ওরা বোঝে ভালই, না বোঝে না বুঝুক। তাই তো ব'ললুম, "লাকুতি মি প্রেগ, দাহ্ চি আরাম্ উক্‌ড়ুম্ (আমাকে একটু ছেড়ে দাও, আরাম করি)।" তার সাথে মায়ার শেখানো ফরমুলা তো ব'লতেই হবে, "নেহি, নেহি, দাগা দাগা।"

দিদির উপরের রাগটা ঝা'ড়লে মায়া আমার উপর, "আরে থামো না খাঁ সাহেব, নেহি নেহি দাগা দাগা। এ দিকে দিদি আমায় জন্মের মতো দূর কোরে দিচ্ছে তার কথা নাই, তোমার শুধু নেহি নেহি দাগা দাগা।"

দিদির দিকে ফিরে ব'ললে, "এবার দূর হোয়েই যাবো দিদি, এমন দূরে দূর্ হোয়ে যাবো যে সারা জন্ম খুঁজেও আর দেখা মিলবে না। তখন কেঁদো ব'সে ব'সে।"

দিদি কাঁদো কাঁদো হোয়ে ব'ললেন, "ভালো কথা ব'ললেও তুই আমাকে কাঁদাবি মায়া। তোকে কী এমন ব'ললাম যে অমন অলক্ষুণে কথা ব'লছিস্ আমায়? নিজেই দোষ ক'রবি আর ভোগাবি আমায়?"

ব'ললে মায়া, "এদুনিয়ায় তাইতো হোয়ে থাকে।" হাত দিয়ে রান্নাঘর দেখিয়ে দিয়ে ব'ললে, "তো যাও। আমার পাপের প্রাশ্চিত্তির ক'রতে চাও তো এক্ষুনি গরম গরম চা আর নরম নরম খাবার নিয়ে এসো। কা'ব্লী খাঁ সাহেবকে দেখে অত শরম শরম ক'রো না। শরমের কি আছে? যে রকম পিছে লেগেছে, রা'ত না পোয়াতে লাঠি নিয়ে দরজায় হাজির হবে। তোমার বোনাই না হোয়ে আর ছা'ড়ছে না। এ কি রকম ছিনে জোঁক রে বাবা!"

দিদি ব'ললেন, "বেহায়া কোথাকার। দিন দিন বুড়ি হচ্ছিস্ আর বেহায়াপনা বা'ড়ছে।"

মায়া আবার ধমকের সাথে ব'ললে, "ছাখো, মানা ক'রছি আর বুড়ি ব'লো না। এ কথা খাঁ সাহেব বুঝতে পা'রলে হয় তো অভাগীর কপাল গুনে সেও দশ হাত পেছিয়ে যাবে। তুমি হয় তো ব'লবে তাহ'লে তো ল্যাঠা চুকেই গ্যালো, মায়া চিরকাল সন্ন্যেসী হোয়ে থা'ক। আমি বলি কি, না, খাঁ সাহেবের বিবি সেজে ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

ব'ললেন দিদি মুচ্‌কি হেসে, "যাঃ, তোর ফা'জলেমির সঙ্গে এঁটে উঠবে কে? তোর সঙ্গে আর কথাই ব'লবো না।" ব'লে স'রে যাচ্ছিলেন। মায়া ব'ললে, "জানোই যদি তো অত কথা খরচা ক'রছো ক্যানো ব'লো তো? তার চেয়ে যা ব'লছি তাই ক'রো না ক্যানো? ল্যাঠা চুকে যায়? এই আমরা ব'সলুম ঘরের ভেতরে। তুমি চট্‌পট্ খাবার আনো দিকিন্। বাপ্‌রে বাপ্। পাঠান

লোকটির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি কোরে কি হ্দিস না পেয়েছে আমার। ভাগ্যিস্ প
মেয়ে হোয়ে জন্মেছিলাম। নইলে কি যে আজ হ'তো! শেষে চোখ মুখের ই
দিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এলুম।" আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস ক'রলে, "f
সাহেব, ঘরের বিবিতে কি পেট ভরে না যে পরের মেয়ের পেছনে লেগেছো?"

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, "নেহি নেহি দাগা দাগা।"

মায়া দিদির দিকে ফিরে ব'ললে, "ভাষা বোঝে না, কিচ্ছু না।
কইলেই শুধু নেহি নেহি দাগা দাগা। একে নিয়ে কি যে হবে আমার!"
হ'লো মায়া যেন আমার জন্যে কতই না দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।

দিদি মন্তব্য ক'রলেন, "বাচাল কোথাকার!"

দিদি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। মায়া জিজ্ঞেস ক'র্লে, "হ্যাঁ ভ
কথা, খোকন কোথায় দিদি?"

ব'ললেন দিদি, "এতক্ষণে খোকনের কথা মনে প'লো?"

ব'ললে মায়া ছদ্ম বিস্ময় নিয়ে, "বারে! দেখছো না কাণ্ডকারখা
এতক্ষণ? মনে করি কখন? কোথায় গ্যাছে বলো না?"

"কি জানি। এই কিছু আগে কোথায় খেলতে গ্যালো। ও আজকা
বড্ড দুষ্টু হ'য়েছে মায়া।"

মায়া কটাক্ষ ক'রলে, "হবেই তো। দুষ্টু বাপের ছেলে কিনা। বাপ্ ব
ব্যাটা সেপাই কা ঘোড়া।"

ঠোঁটের ডগায় হাসি নিয়ে চ্যালেঞ্জ ক'রলেন দিদি, "আসুন উনি বাজা
থেকে, সামনে বলিস্।"

"ব'লবোই তো। ইস্! কি আমার ভয়রে! যাও লক্ষ্মী দিদিম
খাবার আনো। পেট্ মা'নচে না।"

"যাই রাক্ষুসী" ব'লে চ'লে গেলেন খাবার আ'নতে। উভয়ে গিয়ে ব'স
লুম আমরা ভেতরের ঘরে।

ব'ললুম, "মায়া, এ্যাতো মায়াও জানো তুমি?"

"চুপ্চুপ্। দিদি যেন তোমার বাংলা শুন্তে না পায়।"

ফিস্ ফিস্ কোরে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "আচ্ছা। এর পর কি অভিনয় ক'রতে হবে?"

"প্রকাশ্যে যেমনটি হুকুম ক'রবো ঠিক তাই।"

"যো হুকুম্।"

"ঐ সঙ্গে নিজের আক্কেল হুঁশটাও একটু খাটিয়ো।"

"বহুত্ আচ্ছা।"

ইতি মধ্যে দিদি খানিকটা ফলমূল এনে ফেল্লেন। দরজার বাইরে থেকে ব'ললেন, "ততক্ষণ এগুলো একটু মুখে দে মায়া, আমি চা তৈরী ক'রে আনি।"

চেয়ার ছেড়ে না উঠে ব'ললে মায়া, "ভেতরেই এসো না বাপু। কে তোমার ভাসুর আছে, না, তুমিই বা কার ভাদ্দর বৌ? আর কোন বা পর্দ্দার বিবি তুমি!

ঘরের ভেতরে ঢুক্তে ঢুক্তে ব'ললেন দিদি, "লক্ষ্মীছাড়ির সঙ্গে যদি পারা যায়!"

হাত থেকে খাবার নিতে নিতে ব'ললে মায়া, "যে লক্ষ্মীছাড়া কবেই বা কে তার সঙ্গে পেরে উঠেচে? দাও, দাও, অত গালমন্দে কাজ নাই। পেট জ্ব'লে যাচ্ছে।"

কিছুটা মায়ার হাতে কিছুটা নিজে টেবিলের উপর রেখে স্মিত হাস্যে বিদেয় নিলেন মায়ার দিদি। আমরা গিল্তে লা'গলুম। আবার ফিস্ ফিস্ কোরে ব'ললুম, "এবারে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে থিয়েটারে নাবাবো তোমায়। একদিনেই ষ্টার।"

ব'ললে মায়া, "জীবন ভরই তো অভিনয় ক'রছি। রবিবাবুর কথা মনে নাই যে নারীর জীবন বড় ছলনাময়? মা হোয়ে ছেলেকে ভুলাতে হয়, বউ হোয়ে ছেলের বাপ্‌কে ভোলাতে হয়।"

ব'ললুম, "তাতো হয়। কিন্তু এমন ভুলান কেউ ভোলাতে পারে না। তুমি জগতের নব আশ্চর্য্য মায়া, তুলনা বিহীন।"

ব'ললে মায়া, "বরং তুমি যা অভিনয় ক'রছো তা তুলনাহীন। হলিউডে যাও, নইলে কোরডার সঙ্গে বন্দোবস্ত করো। ডেপুটিগিরির চাইতে পোষাবে ভালো।"

আমার দিকে চেয়ে ব'ললে মায়া, "খাঁ ছাহেব, আপ্ তো চা খা চুকে ওহ্ কা'ম্‌রেকা আন্দর্ মে জাইয়ে। খেল্ দেখ লাইয়ে।"

যো হুকুম্" ব'লে উঠে হাত ব্যাগ নিয়ে গেলুম পাশের কামরায়। হলুম। কুলাহ্ পাগড়ী দাড়ি গোঁফ গিয়ে ঢুক্‌লে ব্যাগের মধ্যে। আগের ইঙ্গিত মতো হাঁ'ক্‌লে মায়া, "রেডি ?" "ইয়েস্।" "ওয়ান, টু,—থ্রি।" সঙ্গে আমি বেড়িয়ে এলুম, "আচ্ছালমো আলায়কুম।"

কিসের, কে জবাব দেবেন ? বিস্ময়ে মায়া ছাড়া আর তুজনে বাক্-র মুখ থেকে প্রায় এক সঙ্গে তুজনের বেড়িয়ে এলো বিস্ময় সূচক, 'আরে' শব কি অবাক কাণ্ড! ঘর শুদ্ধ সব স্তব্ধ। মরা বাপ মা ফিরে এলেও বোধ মানুষ এত আশ্চর্য্যান্বিত হয় না। স্বাভাবিক খেলোয়াড়ী সুরে বললুম, "জি, পাবেন না। আমি ভুত প্রেত কিছু নই। একেবারে সপ্রাণে সশরীরে জাহাঁ বাদশাহ্। খেলোয়াড়ী নাম ছর্‌দার্ বাদ্‌শাহ্ গুল্ খাঁন।"

এতক্ষণে মুখ খুললেন আশরাফ ভাইজান, "ভয় খাবেন না ব'ললেই যায় রে ভাই। এযে যাতুর চেয়ে বড়ো। একেবারে মিরেক্‌ল।"

ভাবী ব'ললেন, "এতও তুই জানিস মায়া। ভানুমতী হনুবতী তুই সা'জতে পারিস্।"

মায়া ব'ললে, "আমার খেলা শেষ। জগতের আজীব্ জীব দেখালা পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানার নাই। এবার এনাম্ চাই। বখ্‌শিশ্।"

আশরাফ ভাইজীর কাছে হাত পা'ত্‌লে মায়া। ভিখিরিণীর করুন ব'ললে, "মালিক, কুছ্ ইনাম্ মিলে। হামি বড়া গরীব আদমি আছে রা কুছ্ ভেজো দাতা।"

দিদি মুখে আঁচল দিয়ে হাসির মুখ বন্ধ করার চেষ্টা পাচ্ছেন। ভ ভাবীকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন, "দাও গো, ওকে দেবার মতো কি আছে। তো খুঁজে পাচ্ছি না। ইউরেকা। হ'য়েছে, হ'য়েছে। এক কাজ ক দৌড় মেরে আঞ্জুমান থেকে মোল্লাজীকে ডেকে আনো তো। ঐ আজীব জীবনটা ওর ঘাড়ে ঝুলিয়ে দাও।"

আমি তড়াক্ কোরে লাফিয়ে উঠে ব'ললুম, "আল্লা আপনার মঙ্গল করুক ভাইজী। এত দয়ালু আপনি! আমি যে ঐ আশাতেই সার্কাসের গাধার মতো খেলোয়াড়নীকে পিঠে কোরে ব'য়ে বেড়াচ্চি এতদিন।"

মায়া ধমকে ব'ললে আমায়, "দয়া ক'রে একটু থামুন তো হুজুর। ভাইজীর কথার জবাব দিই।" তাঁকে লক্ষ্য কোরে ব'ললে মায়া, "গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজো ভাইজী? বাঃ রে দাতা! তাহ'লে আপনার আর দেয়া হ'লো কি? তাও আবার দিদিকে হুকুম করা হ'চ্ছে।"

ভাইজী ব'ললেন, "জিজ্ঞেস করো না তোমার দিদিকে মায়া। আমার ব'ল্তে আর কি আছে যে দেবো। নিজে শুদ্ধ নাই। সবই তোমার।"

দিদি ধমক্ দিলেন, "যত সব বেহায়াপনা। যেমন হ'য়েছে মায়া, তেমনি হ'য়েছো তুমি।"

ভাইজী জবাব দিলেন, "নইলে যে প্যাঁকাল মাছের সঙ্গে পারা যায় না। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

পিছ্‌লে-কাটা মায়া এবার গ্যালো ভাবীর কাছে। হাত জুড়ে ভিক্ষে চাইলে, "দাতা, আপ্‌হি কুচ্ ... ..."

ধ'ম্‌কে উঠ্‌লেন ভাবী, "নে হতচ্ছাড়ি, আমার তৈরী-চা ঠাণ্ডা কোরে ইনাম্ চাইতে এসেছেন।"

চায়ের বাটি এবার হাতে নিয়ে চীৎকার ক'রলে মায়া, "সব জুড়িয়ে গ্যাছে দিদি। আবার একটু কষ্ট করো। কষ্ট আমার জন্যে নয়। তোমার ... ..."

আমার দিকে কটাক্ষ ক'রে দুষ্টু হাসি হা'সচে মায়া।

দিদি আবার ধমক্ মা'রলেন, "ফের্ ইয়ার্কি মা'রবি তো তোর গাল ভেঙ্গে দেবো। ইতর কোথাকার।"

মায়া কি সহজ পাজী! ব'ললে, "ইতরই কও আর মেথরই কও, দুপুরের খাওয়াটা না নিয়ে কিন্তু আর ন'ড়ছি না।"

ভাইজী জিজ্ঞেস ক'রলেন, "নেমতন্নটা কে দিলে মায়া?"

ব'ললে মায়া, "বারে! কে আবার? দিদি। আপনারও নেমতন্ন ভাইজী, দুপুরের খাওয়াটার তদারক আপনিই ক'রবেন।"

বলার ভঙ্গীতে, কথার নিবদ্ধ তাৎপর্য্যে, মায়া বাদে আমরা সকলেই
উঠলুম। ভাইজী ব'ললেন, "নেমতন্নের ধরণটা ঠিকই হ'য়েছে মায়া।
খাওয়াবো। পরে তোমার বিয়ের ওলিমা খানা খাবো।"

জবাব দিলে মায়া, "তাহ'লে ছবরের পাটা বুকে তুলে দিয়ে কয়েক
অপেক্ষা ক'রতে হবে ভাইজী।"

ব'ললেন ভাইজী চট্‌পট্‌, "উঁহু! ওরে বাস্‌রে। অতদেরী
ক'রতে পা'রবো না। আজ রা'তেই ও কম্মটি সমাধা হোক্‌।"

ব'ললে মায়া রহস্য-ভরা কথা, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম আর দাতার ইচ্ছায়
ভাইজী। আমার পোড়া কপাল। নইলে ... ...। তা হোক্‌ আর ক'
খা। আমার বিয়ের দিন শীগগীর্‌ ধার্য্য হবে আমার মা-বুড়ি বিদেয় নেবার
তাঁরও হোয়ে এসেছে। দানাপানি তো প্রায় সবই বন্ধ। বাহ্যজ্ঞানহীন।
যাই হোক্‌। আমার বিয়েতে কিন্তু একটু ঘটা কোরে দোওয়া ক'রবেন ভাই
যেন—যেন ... ..." বলতে ব'লতেই তার কণ্ঠ গাঢ় হোয়ে এলো। চোখ
হোয়ে গ্যালো জল-ভরা পদ্ম-পাতার মতো। কখন বুঝিবা ঢ'লে পড়ে। এখ
এত হাসি, এত খুশী, এত রগড়, আবার পরক্ষণে একি কাণ্ড। সাধে কি
বলি এ জাতের মেয়ে মানুষ এক একটি ওয়েদার কক্‌, মেঘ-রৌদ্দুরের এ
সমাবেশ! একই গেলাশে একই সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি গরম পানি থাকে না। আ
বিচিত্র এ নারী-ভাণ্ড। বিচিত্র সব কিছুই এক সঙ্গে পাবেন এতে।

দিদি কি বুঝলেন এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য দিদিই জানেন। তিনি
চোখে টল্‌ট'লে পানি নিয়ে ভারী ও কঠোর গলায় ব'ললেন, "দ্যাখ্‌ মায়া,
এমনি কোরে কথার জ্বালায় বারে বারে কাঁদাসনে ব'লে রা'খছি। তুই যদি
অমন ক'রবি তাহ'লে খোকাকে তোর কোলে দিয়ে তোর সামনেই আত্মহ
ক'রবো।"

এমন সময় কোথা হ'তে লাফাতে লাফাতে খোকন এলো, "আ
আম্মাজী, কোথায় গো? শুনেছো ... ..."

ঘরের মধ্যে এসে অপরিচিত আমায় দেখে থম্‌কে দাঁড়ালে স্তব্ধ হোয়ে
শিল্পীর জন্যে সে একখানা দেখবার মতো ছবি বটে। অসমাপ্ত কোনও সংবাদ ত

চোখে মুখে ভাব-ব্যাঞ্জনা ও ভাব-সঙ্কেত রূপে দোল খেয়ে ফির্‌তে লাগলো। সবে মাত্র বেহেশ্‌তের সংশ্রব থেকে ফিরে-আসা তার কালো চোখ দুটি দিয়ে আমার সত্যিকার পরিচয় নেবার জন্যে সব ভুলে তাকিয়ে রইলে। মাথায় মানানসই রেশমী চিক্কন চুলের ঢেউ। একরাশ প্রশ্ন তার ফটিক-চোখে। আমায় জিজ্ঞেস ক'রচে তার চোখ, 'তুমি বাপু কেডা? কেনই বা এসেচো হেথা? আর এসেচোই যদি তো আমার সবারই চোখে পানি দেখচি কেন? এর কারণ কি তুমি?'

নিজকে অপরাধী ভাবছিলুম তার চোখ মুখের ভাব দেখে। চোখ দিয়েই জবাব দিতে চাইলুম, 'খোকন, সোনার খোকন্, আমার পৌনে এক যুগের তাতা-মিয়া, এ স্তব্ধতা, এ বিষাদকরুণরসাত্মক দৃশ্যের কারণ আমি নই বাবু। কারণ তোমার অতি-সাধের খালা-আম্মা মায়ার সামান্য একটি ভাবাত্মক কথা। কথা সামান্যই। মানেও তার এমন কিছু খোলাছা নয়। তাইতেই এনে দিলে কিছু-পূর্ব্বের আনন্দঘন দৃশ্যের নাটকীয় পরিবর্ত্তন। খোকন, তুমি অল্প কয়েক বছর আগে স্বর্গ-হারা। বেহেশতের ছোঁয়াচ এখনও তোমার দেহে ও মনে। দৃষ্টি তোমার স্বর্গীয়। তুমি বুঝবে না বাবু, মর্ত্তের মানুষের সামান্য একটি কথা হাসায় কাঁদায়, জ্যাঁতায় মারায়। সম্মাননায় অবমাননায় এটম্ বোমের চেয়ে শক্তিশালী এ। সামান্য একটি কথার জন্যে মানুষ আত্মহত্যা ক'রেচে, ক'র্‌চে। নেতাদের কথায় দেশে দেশে আগুন জ্ব'লে উঠেচে। তাঁদের কথায় লোকে উঠেচে ব'সেচে, বেঁচেছে ম'রেচে। দোষী আমি নই বাবু, দোষী তোমার খালা-আম্মার একটি কথা।'

খোকা তেমনি এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে। দিদির মনের বিষণ্ণভাব এখনো কাটেনি। খোকনকে দিদি না ব'লচেন কোনো কথা, না ক'রচেন কোলে তুলে আদর সম্ভাষণ। বোধ করি এ দৃশ্যটি অসহ্য হ'লো মায়ার। তাই তো ধ'ম্‌কে মুখ খেঁচিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললে দিদিকে লক্ষ্য ক'রে, ''মায়ের চেয়ে যার দরদ বেশী সে নাকি ডাইনী। কিন্তু এমন রাক্ষুসী মাও আমি কোথাও দেখিনি। ছেলেটা এতিমের মত দাঁড়িয়ে রইলো আর তুমি অতি তুচ্ছ এক হতভাগীর জন্যে কাঁদতে ব'সেচো। সোনা ছেড়ে আঁচলে গেরো। আয় খোকন আয়, এতক্ষণ ধ'রে লোকের ভাব সাব দেখছিলাম আমি। অমন মায়ের কাছে গিয়েই আর কাজ নাই।' ব'লে চট্‌কোরে এগিয়ে গিয়ে খোকনকে কোলে নিলে। আর দুচোখ দিয়ে খোকনের

মুখখানা গিলতে চাইলে। সোহাগজড়িত কণ্ঠে ব'ললে, "কি কথা ব'লতে চাইছি বাবুন ? লজ্জা হ'চ্ছে ? বেশ, আমার কানে কানে বলো।" নিজের কানটী খোকনের মুখের কাছে এগিয়ে দিলে। এবার খোকন শরম পেয়ে মুচ হা'সলে একটু এবং তাকালে অপরিচিত আমার দিকে। মায়া ব'ললে, "ও। নূ মানুষ দেখে লজ্জা হ'চ্ছে বাবু ?" দিদিকে ব'ললে, "কওনা গো, তোমাদের বাড়ী ঐ নূতন লোকটি খোকনের কে হন।"

জবাব দিলেন ভাইজী, "উনি তোমার চাচামিয়া হন খোকা। ছোট বে ওঁকে খুব পেয়ার ক'রতে তুমি। উনিও তোমাকে খুব স্নেহ ক'রতেন।"

ভাবী ব'ললেন, "তোমার চাচামিয়াকে ছালাম করো বাবু।"

মায়ার কোল হ'তে ডা'ন হাত তুলে আচ্ছালমু আলায়কুম্ ব'ললে খো মিষ্টি হেসে।

আমি উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ার কোল হ'তে বুকে নিলুম খোকা "আমাকে ভুলে গ্যাছো বাবু ? আমি তোমার ছোট বেলার তাতামিঞা।"

পাকা উকিলি বুদ্ধি নিয়ে সওয়াল ক'রলে খোকন, "তাহ'লে এতো আপনাকে দেখিনি কেন ?"

তাই তো। এর কী জবাব আছে ? এও যেন আমার বিগত জীব কৈফিয়ৎ তলব করা, আল্লার তরফ থেকে ফেরিস্তাতুল্য মাসুম শিশুর মুখ থে বেড়িয়ে আ'সচে।

খোকার বুদ্ধি দেখে সকলেই মৃদু মৃদু হাস্‌চেন। বললুম, "পরের হুকু আমার চ'লতে হয় বাবু। এতদিন এখানে আসার হুকুম পাইনি।"

মায়া আমোদের সঙ্গে ব'ললে, "এসো খোকন, তোমার চাচামিয়াকে জব্দ ক'রো না।"

আমার কোল থেকে আস্তে আস্তে নেবে গেল খোকন মায়ার কাে তৃপ্তির সঙ্গে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন বাপ মা তাঁদের একমাত্র সন্তানের উ উৎসারিত অপর দুই নরনারীর স্নেহাধিক্যের মূর্ত্ত প্রকাশ। মায়ার বুকের স মমতা জমা হয়েছিল তার চোখে ও ঠোঁটে।

মায়া জিজ্ঞেস করলে এবার, "তখন কি ব'লতে চাইছিলে বাবু? ব'লতে ব'লতে তোমার চাচামিঞাকে দেখে থেমে গেলে?"

ব'ললেন ভাইজী, "হ্যাঁ বাবা, ব'লে ফেল এইবার। বোকার ছেলে বুদ্ধিমান হও তো দাঁও একটা মেরে নাও। চাইলেই মিলবে। আকাঙ্খা অপুর্ণ থাকবে না। আফ্‌ছোছ হয় ব্যাটা, জীবনে ও-রকম খালা আমি পাইনি।"

ব'ললে মায়া ধমকের সাথে, "খালা আবার কি ? কিছু আগেই নিজকানে শুনলেন না আপনার গুণধরী গিন্নির কথা ছেলে আমায় দিয়ে দিয়েছেন ? আপ্‌ছোছ হোয়ে থাকে, যান না, ভুটিয়া বস্তীর কাউকো ধ'রে এনে খালা বানিয়ে নিন্।"

ভাইজী বল্লেন, তোমার মতো পেলে তো ক'রতামই। তা ছেলে এক প্রকার তো তোমারি মায়া। ব'লতে গেলে তোমার দিদির চেয়ে কমতো কিছুই করোনি। অত স্নেহ কেউ কাউকো করে আমার জানা ছিল না।"

লজ্জা পেয়ে মায়া ব'ললে, "হয়েছে, হয়েছে, অত গুণ ব্যাখান ক'রতে হবে না। নিজের ছেলেকে কে-ই বা একটু আধটু মমতা না করে। এ সব সুখ্যাতির ডামাডোলে খোকার কথাই চাপা প'ড়ে গেল। ছেলেটাকে মুখ খুলতে নাকি দেয় কেউ।"

ব'ল্লেন ভাইজান, "ছেলের সৎমা তো মুখ বন্ধ ক'রেই আছেন। আমিও ক'রলাম। এবার বাবা আকবর, তোমার পালা। যত ইচ্ছা তুই মা বেটাতে কথা চালাও, আব্দার অভিমান চালাও, যা খুশী তাই করো।"

আমি ব'ললুম খোকনকে লক্ষ্য ক'রে, "সম্পর্ক এবার বদল হলো বাবা। বাপের নামে নাম তোমার, বাপের মিতে। কাজেই সে সুবাদে একেবারে আব্বা সেজে ব'সে আছো।"

সকলে হাসলেন। হা'সতে হা'সতে মায়া ব'ললে, "তাই ব'লে দেওয়ার বদলে চাওয়া শুরু ক'রো না নূতন আব্বার কাছে এখনি।"

ব'ললুম, "আব্বা যে হন, বাৎসল্য স্নেহে নিজেই দান করেন। চাইতে হয় না। আমি শুধু চাইবো আব্বা, আব্বা গো, আমায় তুমি ভালোবাসো। তাহ'লেই সব পাবো।"

এতক্ষণে দিদি ব'ললেন হেসে, "বুড়ো ছেলের উপর অপত্য স্নেহ পুত্র গুণেই হয়ে থাকে।"

ব'ললুম, "তাহ'লে তো পুত্রের গুণ দেখাতে হয়। এসো আব্বা, আমি তোমায় সত্যিকারের পিতা বানিয়ে দিই।" নিলুম তাকে কাছে টেনে। ব্যাগ থেকে বের ক'রলুম আমার সিল্কের মনোহর পাগড়ী। সুন্দর সুরুচিসম্মত পাঠান কায়দায় বেঁধে দিলুম তার মাথায়। ব'ললুম, "পাঠান-পাহাড়ীর সন্তান, তুই বী রক্তের উপযুক্ত হোয়ে গ'ড়ে ওঠো তুমি। এবার যাও তোমার পুরাতন-পাওয়া চির নূতন মায়ের কাছে। আদায় করো তোমার পাওনা।"

অর্দ্ধ পথেই মায়া হাত ধ'রে টেনে নিলে কাছে। নিলে কোলে তুলে ব'ললে, "মায়ের প্রাণটাই দেয়া থাকে সন্তানকে। তার বাড়া সে আর কি দিতে পারে? দিতে পারে শুধু এই......।" এই ব'লে সে খোকনের মাথায় মুখে চোখে চুমোর পর চুমো খেতে লাগলে। রাক্ষুসী খোকনকে খেয়ে ফেলে বুঝিবা। এত স্নেহের নিপীড়নে এতগুলো লোকচক্ষুর সামনে কিশোর বালক পীড়া বোধ ক'রে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিল। কিন্তু তবু ছাড়ে কে? কে খোকার মনোভাবের দিকে লক্ষ্য করে? আর একজনের দীর্ঘকাল-নিবদ্ধ, তিলে তিলে বর্দ্ধিত, স্বাভাবিক-পথে-বিকাশের-অবলম্বনহীন মাতৃক্ষুধা ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর রক্ত পিপাসার মতই উদগ্র ও উগ্র হোয়ে উঠেচে। এ রক্তের স্বাদ বাঘিনী ছাড়ে কি কোরে?

হায়রে নারীর হৃদয়। কী তুমি, আর কী তুমি নও? দেখেছি আমারই বাড়ীর ধারে। সন্তানহীনা এক সুন্দরী নারী এক গরীবের আঁতুড়ে মা-মরা কালো কুৎসিত এক মেয়েকে মাত্র পাঁচ টাকায় কিনে নিলে। অমূল্য জীবন বিনা মূল্যেই পেতো। টাকা পাঁচটা শুধু করুণার দান। সেই মেয়েটির প্রতি যত্নআত্মির অবধি ছিলো না। সারা রাত জেগে জেগে তুধ গরম ক'রে বোতলে তুলে খাওয়ানো, ঘন্টায় ঘন্টায় আঁষটে-গন্ধী পেচ্ছাব-ভেজা সপ্‌সপে বিছানা বদলানো, নরম কচি হাত পা মাথা বালিশের তলায় চাপা প'লো কিনা উদ্বিগ্ন চিত্তে দেখা, সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলে বালিকাকে চোখের আড়াল হ'তে না দেয়া, এসব শুনেচি এবং দেখেচি। দেখেচি তার মধ্যে 'মা'; দেখেচি তার মধ্যে সুবিমল মাতৃত্বের মূর্ত্ত প্রকাশ; দেখেচি স্বর্গের ছবি; দেখেচি নারীর মধ্যে জগত পালিনী রূপ।

আবার এও দেখেছি :— পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ দিনের একমাত্র এবং নারী জীবনের বহু আশা আকাঙ্খার বুকের রক্তনিঙ্ড়ানো প্রথম-সার্থক রূপায়ণ ফুটফুটে এক সন্তানকে রেখে যুবতী নারী পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এবং পরে ধরা প'ড়ে মামলাটী আমার নিকটে আসে। আমার বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল হলো খুব। নিজে সরে জমিন তদন্ত করলুম। ঘটনার মুলের কাহিনী আরও করুণ ব্যথায় ভরা। ছ'সাত বছর বয়েসের সময় মেয়েটীর বিধবা মায়ের নিকেহ হোয়ে যায়। সৎবাপ মেয়েটীকে পুষতে চায় না। নিতান্ত করুণাবশে একমাত্র পুত্রবতী অপর এক বিধবা তাকে নিজের মেয়ের মতো ক'রে পুষতে থাকে। মেয়ের প্রতি মায়ের যতটা মমতা প্রকাশ স্বাভাবিক কিছুরই কমতি ছিলো না এতে। মেয়ে ক্রমে ক্রমে সাবালেগা হয়। মমতা বশতঃ একমাত্র পুত্র বিশুর সঙ্গে বিয়ে দেয় বিধবা। নিরীহ বিশু স্ত্রীকে মাথায় তুলে রাখে। মায়ের মতো বড় কোমল প্রাণ তার। প্রথম সন্তানের পর আঁতুড়ের বাচ্চা শুইয়ে রেখে নদীতে পানি আনতে যায় স্ত্রী। পানি আনচে তো আনচেই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। অবশেষে ছ'দিন পর ধরা পড়ে থানার সেপাইদের হাতে। সঙ্গে ছিলো এক যুবক, যে বিশুদের বাড়ীর পাশে অপর এক গেরস্থের ঘরে বছর-ভর কৃষানী চাকরী ক'রতো। অনেক বুঝানো হলো। স্বামী শ্বাশুরীর জ্বালা যন্ত্রণার কথাও সে বলে না। ঘরেও সে যাবে না। সন্তানকেও চায় না। চায় শুধু সেই গরীব দিন মজুর যুবককে যার নিজেরই বিবাহিতা স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। কোনও বাধাই মানলে না সে। তুজনে সামনের পানে নজর রেখে বেপরোয়া বেড়িয়ে গ্যালো, যেমন যায় সংসার-নিরাসক্ত যোগী যোগিনী তীর্থ-ধামকে লক্ষ্য ক'রে। সন্তান সম্বন্ধে নির্লিপ্ত নির্বিবকার। এ নারীর জীবনে কাম মুখ্য। সন্তান উপ-উৎপাদন। প্রেম নেই, তাই আত্মবিলয়ও নেই। বন্ধু, বৈজ্ঞানিক যৌনব্যাখ্যা যতই হোক, যাক্ ও-নারীর অনুকূলে, তবু দেখেছি প্রেতিনী, দেখেছি মূর্ত্তকাম, দেখেছি প্রত্যক্ষ নরক।

মুসলমানের ঘরের একমাত্র মেয়ে সহ-প্রায়-শিশু বিধবা বহু রকমের প্ররোচনা সত্বেও আর বিয়ের নাম গন্ধ সহ্য ক'রতে পারেনি এও জীবনে দেখেছি।

চুমো খাওয়ার সাধ সাময়িকভাবে মিটে গেলে খোকনকে বুকে চেপে জিজ্ঞেস ক'রলে মায়া, "এবার বলো, ঘরে ঢুকে কি ব'লতে চাইছিলে বাবু।"

ব'ললে খোকন অমিয় মাখা কণ্ঠে, "রাস্তায় লোকেরা ঢোল দিয়ে গেল। লরেটা স্কুলে কি নাকি একটা খেলা হবে আজ।"

ব'ললে মায়া, "কী খেলা হবে বাবুন্? নাম মনে নাই?"

নাম মনে নেই। তাই খোকন লজ্জা পেলে। মুখ নীচু কোরে ব'ললে, "ওরা ব'ললো,—ব'ললো......." তারপর হটাৎ যেন লজ্জা ঢা'কবার দিশে পেয়েচে তেমনি উদ্দীপিত হোয়ে ব'ললে, "হ্যাঁ, ঐ সাথে ভূতের নাচও হবে। ভূতের নাচ কি খালা আম্মা? আমায় নিয়ে চলো না আজ?"

মায়া ব'ললে, "আমরা সবাই দেখতে যাব বাবু, তুমিও যাবে। সেই জন্যেই তো দুপুরে আজ এখানে খাব।"

মায়ার দিদি জিজ্ঞেস ক'রলেন, "কি ব্যাপার রে মায়া? জানিস্ কিছু?"

জবাব দিলে মায়া, "লরেটো কন্‌ভেন্টে ত্যাব্‌লো ভিভাঁ দেখাবে, আর জিম্-খানা ক্লাবের সদস্যরা ভূতের নাচ। সব স্কুলে স্কুলে নেমতন্ন করেছে। তাই তো সদলবলে এসেছি। সে কথা বলার এখনও সুযোগ হয়নি। এখান থেকেই যাব। মাঝখান থেকে আমারও এক খেল্ দেখান হোয়ে গ্যালো।"

খোকন ছাড়া সকলে হেসে উঠলুম প্রহর-পূর্ব্বের প্রসঙ্গ মনে ক'রে।
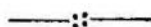
দুপুরের খাওটা ঘটা কোরে ঐখানেই সমাধা হ'লো।

——::——

পঁচিশ

বেলা প'ড়ে এলো।

মায়া ব'ললে, "তোমরা লরেটো কন্‌ভেন্টের দিকে এগোও। আমি খোকনকে নিয়ে চল্লুম আর আর ছেলেমেয়েদের আনতে। আমার হ'য়েছে মরণ। তারা জেদ ধ'রেচে আমার সঙ্গে না হ'লে যাবে না খেলা দেখতে।"

ভাইজী ব'ললেন, "স্কুলের ছেলেমেয়েদের দোষ কি মায়া, আমারই লোভ হয় শিশু সাজতে, তোমার স্নেহ পাবার লোভে।"

ভাবীর দিকে তাকিয়ে মায়া ব'ললে, "কি গো গিন্নী, নাও না বুড়ো শিশুকে একটু বুকে। কোলে ক'রে নিয়ে এসো। লোকে দেখবে। জয় জয়কার প'ড়বে। স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা হবে।"

ভাবী চোখ গরম ক'রে ব'ললে, "বেহায়া, তোর লাজ কি হবে না কোনও দিন?"

জবাব দিলে মায়া, "কেন হবে না? যে দিন বাচাল ঠোঁট ছুটো চিরতরে বন্ধ হবে, শত চেষ্টা ক'রেও আর খুলতে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ব'লবে, মায়ারে, তোর সোনা মুখে একটা কথা ক'। কিন্তু দিদি, যে ক'দিন ঠোঁট ছুটোর কথা ব'লবার ক্ষমতা আছে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড়বো কেন?"

দিদি মুখ ভারী ক'রলেন।

ভাইজী ব'ললেন, "ঠোঁট ছুটো কি শুধু কথা ব'লবার জন্যে তৈরী রে ভাই, যে এত এ্যালো-পাতাড়ী কথা কচ্ছ।"

ব'ললে মায়া, "সে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-কথা শুনান গিয়ে গিন্নীর কাছে। না হয় হাতে নাতে প্রমাণ ক'রে দিন। আমি চ'ল্লাম।"

খোকন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছিল। তাকে তুলতে গিয়ে ব'ললে, "ওঠ্ বাবু ওঠ্। আর ঘুমায় না। আ'লসে বাপ মায়ের ছেলে ঘুমায় কতো রে।"

ভাবী ভাইজী জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলেন। জবাব দিলেই তো বিপদ। আরও গণ্ডা কয়েক জব্দ হোতে হবে। কাজেই চুপ্ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পঁচিশ

বেলা প'ড়ে এলো।

মায়া ব'ললে, "তোমরা লরেটো কনভেন্টের দিকে এগোও। আমি খোকনকে নিয়ে চল্লুম আর আর ছেলেমেয়েদের আনতে। আমার হ'য়েছে মরণ। তারা জেদ ধ'রেচে আমার সঙ্গে না হ'লে যাবে না খেলা দেখতে।"

ভাইজী ব'ললেন, "স্কুলের ছেলেমেয়েদের দোষ কি মায়া, আমারই লোভ হয় শিশু সাজতে, তোমার স্নেহ পাবার লোভে।"

ভাবীর দিকে তাকিয়ে মায়া ব'ললে, "কি গো গিন্নী, নাও না বুড়ো শিশুকে একটু বুকে। কোলে ক'রে নিয়ে এসো। লোকে দেখবে। জয় জয়কার প'ড়বে। স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা হবে।"

ভাবী চোখ গরম ক'রে ব'ললে, "বেহায়া, তোর লাজ কি হবে না কোনও দিন ?"

জবাব দিলে মায়া, "কেন হবে না ? যে দিন বাচাল ঠোঁট দুটো চিরতরে বন্ধ হবে, শত চেষ্টা ক'রেও আর খুলতে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ব'লবে, মায়ারে, তোর সোনা মুখে একটা কথা ক'। কিন্তু দিদি, যে ক'দিন ঠোঁট দুটোর কথা ব'লবার ক্ষমতা আছে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড়বো কেন ?"

দিদি মুখ ভারী ক'রলেন।

ভাইজী ব'ললেন, "ঠোঁট দুটো কি শুধু কথা ব'লবার জন্যে তৈরী রে ভাই, যে এত এ্যালো-পাতাড়ী কথা কচ্ছ।"

ব'ললে মায়া, "সে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-কথা শুনান গিয়ে গিন্নীর কাছে। না হয় হাতে নাতে প্রমাণ ক'রে দিন। আমি চ'ল্লাম।"

খোকন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছিল। তাকে তুলতে গিয়ে ব'ললে, "ওঠ্ বাবু ওঠ্। আর ঘুমায় না। আ'লসে বাপ মায়ের ছেলে ঘুমায় কতো রে।"

ভাবী ভাইজী জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলেন। জবাব দিলেই তো বিপদ। আরও গণ্ডা কয়েক জব্দ হোতে হবে। কাজেই চুপ্ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খোকাকে নিয়ে চ'লে গ্যালো মায়া। যেতে যেতে ব'ললে, "ঠিক্ সম
তোমরা যেয়ো কিন্তু দিদি। দেরী ক'রো না।"

ঠিক্ সময়ে আমরা র'ওয়ানা হলুম। ওরে বাস্ রে! দেরী হ'লে কি
কাণ্ডই যে ক'রবে মায়া! অভিমানের শুধু অন্ত থা'কবে না তাই নয়। একেবা
কথায় কথায় নাজেহাল ক'রে ছাড়বে।

কন্‌ভেণ্টে পৌঁচলুম যখন, দেখি, পূর্ব্বাহ্ণেই ভালো রকম জনসমাগ
হয়েচে। মায়া লেট্-লতিফ হবার পাত্রী নয়। রঙীন কাপড় চোপড়ে সজ্জিত তা
সন্তানদের নিয়ে আগাম হাজির। আমাদের দিকে ঘুরে ফিরে দুএকবার দৃষ্টি ফেলে
মাত্র। কিন্তু গণনার মধ্যে আনেনি। ছেলেমেয়ে নিয়েই মস্ত্। আর সে কি
সোজা হাঙ্গাম ছেলেমেয়েদের! কে কোন আব্দার ক'রচে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠিক সময়ে 'ত্যাব্‌লো ভিভাঁ' শুরু হ'লো। বিষয়, "Days to come
Colonial Sisters Secede." 'অনাগত ভবিষ্যতে একে একে বিবিবে দেউটি
মনে মনে হাসলুম, 'কন্‌ভেণ্টের ভগ্নিরা দেয়ালের লিখন প'ড়তে শিখেচেন তাহ'লে
মাদার ব্রিটানিয়ার অনেক মেয়ে, লাল কালো পীত বহু রঙের। উজ্জ্বল মুকুট পর
মাদার ব্রিটানিয়ার ধারে ধারে ঝুলচে নানা রংয়ের পোষাকপরা তার মেয়েরা, এব
একজন এক একটি উপনিবেশের প্রতীক। একে একে খ'সে প'লো তারা
আলাদা কোরে প্রত্যেকে সংসার পা'তলে। মাদার ব্রিটানিয় ছলছল্ চোখে ডাইনে
বাঁয়ে শুধু দেখচে। অনাগত অথচ অবশ্যম্ভাবী ঘটনার ছায়াপাত চমৎকার প্রকা
হোয়ে উঠেচে। ভগিনীদের মনোব্যথা যাই থা'ক, মুক প্রতীক অভিনয়ে এদেশ
বাসীর হৃদয় জয় করেচেন তাঁরা। বুদ্ধিমতী তাঁরা। সাম্রাজ্য যা'ক আর থা'ক
তাঁদের তো থা'কতে হবে এদেশে। নইলে খ্রীষ্টের বাণী জাহান্নামীদের মধ্যে সেবা
ও ত্যাগের ভনিতায় ছড়াবে কারা?

সাঁঝের পরে বিজলীর আলোয় শুরু হ'লো ভূতের নাচ, রূপায়নে জিমখা
ক্লাবের সদস্য বৃন্দ। প্যাণ্ডেলে কালো লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট বালব্ জ্ব'লে
উঠলো। আবির্ভূত হলো মঞ্চে ভূতের দল। গা-ঘিন্‌ঘিনে কালো পোষাক পর
লোম হর্ষক মুখোশধারী ভূত প্রেতের দল নাচতে লাগলে ধেই ধেই ক'রে। প্যাণ্ডেলে
ছামিয়ানায় লটকানো আরসুলো, টিকটিকি, মাকড়সা, ব্যাঙ, সাপ ছিঁড়ে ছিঁ

গুলোই নেবো। আমি নেহায়েতই উদারমনা কিনা! ভাবি, যাক্‌গে, ঐ য
পেয়েছেন ও-গুলো, তাঁদের রেকর্ড ভেঙ্গে জগত সমক্ষে তাঁদেক লজ্জিত করাটা এ
মানুষের মতো কাজ নয়।"

যে রকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ব'ললেন কথাগুলো ভাইজান, তাতে এক
সবাই আমরা হো হো ক'রে না হেসে পারিনি। হেসেচে সব চেয়ে বেশী মা
থা'মতে চায় না। লুটিয়ে প'ড়ে হা'সতে হাসতে দম ফুরিয়ে গেলে ব'ললে, "বাব
পেটে খিল ধ'রে গ্যালো যে।"

ব'ললেন ভাইজী, "তা যাক্, আমার প্রস্তাবটার কি হলো? বড় আ
পাওয়া যেতো যদি থাকতে।"

ব'ললে মায়া, "তাতো যেতো। এদিকে বুড়ি মার কি হবে?"

ভাইজী সুরাহা বাতলিয়ে দিলেন, "কেন? ঐ যে ব'ললাম পরিচা
আছে। মায়ের তো আর কিছু দেখতে শুনতে হয় না। শুধু দেখা, নিশ্বাস এখ
বইছে কি না। নইলে তো এখন উনি যোগমগ্না অর্দ্ধমৃতা।"

নিশ্বাস ফেলে ব'ললে মায়া, "ঠিক তাই। তবু গর্ভধারিনী মা
ছোট একটি পরিচারিকা আছে মানি, তবু পরিচারিকা আর মেয়ে এক নয়।
মায়ের পরিচারিকা, কিন্তু পরিচারিকা মায়ের মেয়েও নয়, মেয়ের বিকল্পও
মেয়ে মেয়ে, পরিচারিকা পরিচারিকা। নয় কি ভাইজান?"

একথায় সবারই নাক থেকে জোর নিশ্বাস প'লো।

বেদনার সঙ্গে ব'ললে মায়া, "আর যে বেশী দিন আছেন তাও মনে হয়
থেকে থেকে হাঁপের মতো টান ধরেছে।"

আমার দিকে ফিরে ব'ললে, "তুমি যাবে না থা'কবে?"

ব'ললুম, "তুমি একা যাবে? তোমায় রেখে আমি হোটেলে যাব।"

ব'ললে মায়া, "আমি তো সব সময়েই একা। আমার জন্যে ভেবো
তুমি বরং থেকে যাও ভাইজানের সঙ্গে। সকালে যাবার পথে দেখা ক'রে যেয়ে

ভাইজী ব'ললেন, "তাই করো না ভাই? মায়াকে রেখে আসার ব
ক'রছি।"

ব'ললুম, "জি না। আমার কিছু জরুরী কাজ আছে। চিঠিপত্তরের জবাব লিখা, ডাইরী এবং আরও দুএকটি অত্যন্ত জরুরী কাজ।"

ব'লে ফেলে আমারই কেমন যেন লজ্জা ক'রতে লাগলো। কী ভাববেন জোড়মানিক! দুজনার মুখে সহসা মুখ তুলে দেখলুম একটা আমোদের চাপা হাসি খেলে বেড়াচ্চে।

ভাইজী ব'ললেন, "তাহ'লে মায়া, রাতের খাবারটা দুজনে এখানে খেয়েই যাও। কই গো, যাও দিকিন, ভূতটা কি ক'রছে দ্যাখো।"

শেষের কথাটুকুন ভাবীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হ'লো। ভূত মানে বাচ্চা চাকরটা।

ভাবী ব'ললেন, "রুটি হোয়ে গ্যাছে। আমি শুধু তরকারিটা দেখবো।"

মায়া ব'ললে, "দুপুরে যা খেয়েছি তাতে আগামী দুপুর পর্য্যন্ত এ দেহটির জন্যে আর ভাবনা নাই। বরং আপনার অতিথিকে আমার ভাগেরটি পর্য্যন্ত খাইয়ে দিন।"

ভাবী ব'ললেন, "মায়াকে আর জেদ ক'রো না। রাতে এক বাটি চা ছাড়া আর কিছু খায় না ও।"

অবাক হোয়ে ব'ললেন ভাইজান, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"বরাবরই কি ও এই করে?"

"হ্যাঁ। মিথ্যেবাদী ব'লে গ্যালো দুপুরে ও অনেক খেয়েচে। মোটেই না। তোমাদের সামনে তো খায় না। খেলে দেখতে যে একটা শিশুরও যে খোরাক আছে ওর তাও নাই। ভর্‌পেট সে কোনোদিনই খায় না। রাতে তো নয়ই।"

"কেন? রাতে মোটে খায় না কেন?"

"সে ওর অদ্ভুত ধারণা। বলে, যুবতী-কুমারী আর বিধবাদের রাতে কিছু খেতে নাই। আমিষ তো ওর সবই বাদ।"

ভাইজীর মুখ থেকে শুধু বেরুলো, "আশ্চর্য্য!"

এতক্ষণ মাটির দিকে মাথা কোরে মায়া ব'সেছিলো। এবার মুখ তু
জবাব দিলে, "না ভাইজান। আপনার গিন্নীর কথা বিশ্বাস ক'রবেন না। রাক্ষুসে
মত খাই ব'লেই তো যখন তখন উনি আমায় রাক্ষুসী বলেন।"

ভাইজী শুধু ব'ললেন, "তাই বটে।"

আমার দিকে ফিরে তিনি ব'ললেন, "তাহ'লে ভাই তুমি কিছু খেয়ে যাও
মায়াকে ব'লে তো আর কোনও লাভ নাই। ও একবার যা সত্যি ব'লে জানে
থেকে নড়াতে গেলেহিমালয় পর্ব্বতটাকেই প্রথমে নড়াতে হবে।"

ব'ললুম আমি, "আমারও ঐ কথাই ভাইজান।"

"মানে? রাতে কিছু খাবে না?"

"জি না। দুপুরে যা খেয়েচি! এখনও পেট ঢেঁকি হোয়ে আছে।"

"তাই? না, দিনাজপুরের সাঁওতালদের মতো পোঁ ধরে যাচ্ছো?
তো কুমারী,—তুমি কি বিধবা নাকি?"

হেসে ব'ললুম, "তা একরকম তাই বটে। কিন্তু দিনাজপুরের সাঁওতা
দের পোঁ ধরা কি ভাইজান?"

হেসে ব'ললেন ভাইজী, "আরে ভায়া, সে এক মজার রেওয়াজ। সাঁও
তালরা ধান আনতে যায় মোড়লের বাড়ী। দলের সর্দার সাঁওতাল যাবে পুরো ভাগে
ছালাম ক'রবে মোড়লকে, 'মোড়ল মোর ছালাম।' অনুগামী সাঁওতালরা এ
একে ব'লবে, 'মোরও ওত্ই।' অর্থাৎ আমারও ওতেই হ'য়ে গ্যাছে।"

সব কজনেই হেসে উঠলুম। ইঙ্গিতটী যুৎসই। হাসলেও মায়া পে
লজ্জা। আমিও। বাকী দুজন পেলেন অনাবিল আমোদের আমেজ।

দুজনে সদর রাস্তায় নাবলুম। আকাশে একবার নজর ফেলে দেখি পাত
পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারারদল লজ্জাবতী নববধুর মতো ঘোমটার আড়া
সহাস্য চোরা কটাক্ষ হানচে পৃথিবীর এই নিতান্ত দুর্ভাগা জীবটির উপর। হে প্রলু
কারিণীর দল, বারে বারে প্রলুব্ধ করেচো আমায়, আমার শত সহস্র কাজ ও চিন্তা
ফাঁকে ফাঁকে। আজ আর সে ফুরসুত নেই। আমি এখন এক নূতন প্রকৃতিে
পেয়েচি, যে আমার সমস্ত নীরব ও গোপন সত্বাটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে। একদি
ছিল যেদিন নীচের অকরুণ সহানুভূতিলেশহীন নির্ম্মম সংসারটি কথা ও ব্যবহারে

সুতীব্র খোঁচায় খোঁচায় আমায় দংশে মারতো। পালিয়ে যেতুম আমি বগলে মাদুর নিয়ে মুক্ত মাঠে উদার আকাশের তলে। ধরিত্রীর মৃদুল স্নিগ্ধ বায়ু-হিল্লোল মায়ের মতো করুণায় তপ্ত সারাদেহে বুলিয়ে দিতে স্নেহের পরশ। মাদুরে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতুম তোমাদের পানে। তোমরাও উজ্জ্বল প্রেমময় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থা'কতে আমার দিকে। তোমাদের শত সহস্র দৃষ্টিতে পেতুম মায়ার দৃষ্টির আভাষ। দেখতুম তোমাদের রাণী শুকতারা আর সন্ধ্যে তারাকে। দেখতুম ধ্রুবতারা আর ছোট বড় সপ্তর্ষিমণ্ডলকে। দেখতুম ছায়া পথের অগণিত পরীকুমারীরদলকে। দেখতুম আকাশ গঙ্গায় স্নাত অত্যুজ্জ্বল দেব-কুমারীদের নপুরচ্ছন্দা গতিভঙ্গিমাকে। আমার মায়া সোহেলীরূপে দেখা দিত আকাশ পটে। তাকিয়ে থাকতুম আর ব'লতুম সজল চোখে, "মায়া, তুমি আজ কতো উপরে। আমায় তুলে নাও। আমি আর পারিনে, পারিনে। এ বাধা বিপত্তিসঙ্কুল নিষ্করুণ ধরা আমাকে ধরা দিলে না। দিলে না এর প্রেমরস পান ক'রতে। ধরার সমুদ্রমন্থনে আমার ভাগ্যে উঠেচে শুধু হলাহল। আমার ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত পুরুষ পেলে না আমার অমৃত-প্রকৃতিকে একান্ত কোরে। পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা তাই থেকে গ্যালো অপূর্ণাঙ্গ, অসমাপ্ত।"

মিঠা রোদ্দুরসহ বিকেলের আকাশে দেখা দিত মেঘের দল। সাদা, কালো, সিঁদুরে, হিঙুল, উর্ণা কাজল, কোদালে কুড়ুলে সব রকমের মেঘ। গ'ড়তো তারা অপরূপ চিত্র জীবন্ত কোরে। যা পাওয়া যায় দুনিয়ায় তার নমুনা মিলতো সে বিচিত্র রং বেরঙের চিত্রে। প্রায়ই দেখতুম আকাশের বুকে অবিকল হিমালয়ের হিম গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে অটল গাম্ভীর্য্য নিয়ে। তুষারস্তূপে আবৃত হোয়ে আছে তার শিরোদেশ। নীচের ও ধারের কালো, পাংশুটে, ধূসর মেঘে তৈরী ক'রতো গাছপালা ঘেরা দার্জ্জিলিং পাহাড়। মন আবেগ-উত্তাপে দারুণ চঞ্চল হোয়ে উঠতো। বুকখানা ধড়ফড় কোরে থেমে যাবার উপক্রম ক'রতো। ব'লতুম মেঘকে, "ওরে নির্দ্দয় কঠোর উপহাসকারী মেঘপুঞ্জ, উদার সুবিশাল বক্ষের অধিকারী আকাশচারী হোয়েও তোরা কি নির্দ্দয় ধরণীর মতো আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এলি? আমার চোখের সামনে কে তোদেক অমনি কোরে সাজিয়ে গুজিয়ে দাঁড়াতে ব'লেচে? যা দিনে রাতে ভুলতে পারিনে তারই চিত্র

চোখের সামনে জীবন্ত কোরে গ'ড়ে তুলে কী কৌতুক অনুভব কর'চিস্ তোরা? আকাশের সংস্পর্শে যারা যায় তাদের নাকি থাকে না মনে দানবীয় জীঘাংসা, মানবীয় কলুষ। মন হোয়ে যায় আকাশেরই মতো উদার। আর দিনরাত আকাশে ভ্রমণ কোরেও তোরা র'য়ে গেলি শকুনির মতো ছোট লোক? সে ওড়ে আকাশে নজর গোভাগাড়ে। আমি রইলুম ছোট্ট চাতক পাখী। আশা ক'রে চাইলুম দে জল। দিলি বজ্রানল। বিরহী যক্ষের মতো আশা কোরেছিলুম প্রবল হাওয়ায় উড়ে যাবি হিমগিরি। আমার মনোবেদনার খবর পৌঁছে দিবি মায়ার বাড়ী। নয়তো সংসেজে নজর বরাবর দাঁড়িয়ে রইলি রঙের বাহার নিয়ে। ত্যাব্‌লো ভিস্তির মতো হিমালয় শুদ্ধ দার্জ্জিলিং পাহাড়ের জীবন্ত মুক অভিনয় তোদের কে ক'রতে ব'লেচে? এতে যে আমার বুকখানার অবস্থা কি হোয়েচে তা কি তোরা জানিস্? বহু দিনের মৃত সন্তানের মুখের আদল অপর কারো সন্তানের মুখে দেখতে পেলে বাপ-মা'র শোক নূতন কোরে জেগে ওঠে। দু'চোখ ভেসে যায় পানিতে। আমারও চোখের সরোবর তোরা কি আজ দেখতে পাচ্চিস্‌নে?"

সেই মায়াকেই তো আবার ফিরে পেয়েচি। কিন্তু ফিরে নিয়ে যেতে পারবো কি সঙ্গে নিয়ে? বিয়েতে রাজী না হয় তো বন্ধুত্বে দোষ কোথায়? থা'কবে কাছেকুলে, পাবো সাহচর্যের আনন্দ, পাবো প্রেরণা। সংসারের ভ্রূকুটিকে লাথি মেরে দূর ক'রে ছুটবো জীবন সংগ্রামে নব উদ্যমে, নবতেজে। যে স্ত্রী আমার যামিনী জাগরণের কামিনী, রাত-কা বাঘিনী, দরকার নেই আর অমন স্ত্রীতে। আমার চাই শক্তিরূপিনী বন্ধু, একাত্মীয়া। মায়া ছাড়া আর কেউ তা হোতে পারে না।

মরো-মরো মায়ের আপত্তি হয়তো ক'রবে মায়া। বেশ্‌ তো। সবুর ক'রবো ততদিন, যতদিন বৃদ্ধা বিদেয় না নেন ধরণীর পান্থশালা থেকে। তারপর মায়া একা। তখন তার আর কৈফিয়ৎ কি?

দুজনে রাস্তায় চ'লেচি। কারো মুখে কথা নেই। তারও মনে হয়তো অনেক কথা, যেমটি আমার মনে ছবির পর ছবি জাগিয়ে যাচ্ছে।

অনেক—অনেকক্ষণ পর মায়াই প্রথম মুখ খুললে, "গুম্ হোয়ে কি ভাবছো এতো?"

ব'ললুম, "তোমার কথা।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ছাড়া জগতে তোমার আর চিন্তা ক'রবার কিছু নাই নাকি?"

"না।"

"সত্য অস্বাভাবিক মিছে কথা।"

"মোট্টেই না। আমার সব চিন্তার মাঝে আর দশটির সঙ্গে তুমিও যে আস্তে আস্তে জড়িয়ে যাও। তাইতো তোমা-নিরপেক্ষ কোনও চিন্তেই আমার মনে স্থান পায় না। এর ওষুধ কি ব'লতে পারো?"

"পারি। নিজের স্ত্রীকে খুব বেশী ক'রে ভালোবাসা আর ... ... "

উদ্দীপনায় ব'লে ফেললুম তাকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে, "তুমি ঠিকই ব'লেচো মায়া। তাইতো তার চিন্তে মন থেকে সরে না।"

"মানে?"

"মানে অস্পষ্ট। একটা কিছু ধ'রে নাও। হ্যাঁ, তারপর তোমার দ্বিতীয় দফা নোস্‌খা?"

"মায়া রাক্ষুসীকে ভুলে যাওয়া।"

ব'ললুম, "সেই ব্যবস্থাই ক'রচি।"

"কি রকম ব্যবস্থা?" স্বরটা তার যেন একটু কেঁপে গ্যালো ব'লে মনে হলো।

"ব্যবস্থাটা বড় অভিনব মায়া। চিন্তার সামগ্রী দূরে থাকলেই চিন্তা। সব সময় চোখের সামনে নাগালের মধ্যে থা'কলে আর চিন্তা ক'রতে হয় না। অতএব তুমি তৈরী হও।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তো এবারে এসেই বলেচি। হয় যাবে আমার সঙ্গে, নয় রাখবে তোমার কাছে। একা আর আমি ফিরে যাবো না।"

"বেশ তো। সব সময় আমি তো তৈরী হ'য়েই আছি।"

ব'ললুম জোরের সঙ্গে, "কোন্ রকমের তৈরী ? হেঁয়ালী রাখো মায়া। স্পষ্ট জা'নতে চাই।"

ব'ললে সে, "হেঁয়ালী আবার কি ? আমার সব কথাই হেঁয়ালী। আর তোমার মতো খেয়ালী হওয়া বুঝি ভালো ?"

বললুম উত্তাপের সঙ্গে, "রাখো আমার খেয়ালী হওয়ার কথা। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না তাই বলো ?"

"বেশ গেলাম। তারপর ?"

"তারপর, তারপর ক'রেই তো সা'রলে। তারপরের উপর তোমার চিন্তা ক'রবার দরকার কি ? সে চিন্তা কি আমার নেই ?"

"আছে। সে চিন্তা আমার সম্বন্ধে, তোমার নিজের সম্বন্ধে নয়। তোমা চিন্তা অপরিপক্ক, অপরিণামদর্শী, একদেশদর্শী।"

ব'ললুম, "আমার সম্বন্ধে এত হীন ধারণাই যদি তোমার, তা হলে প কোরে এতদিন বলোনি কেন ?"

ব'ললে মায়া মায়ার সহিত, "এই ছাখো, একটুতেই তোমার অভিমা হয়। একটা ভালো কথাও তোমায় ব'লতে নাই। আচ্ছা, জীবনটাকে আরে জটিল কেন ক'রতে চাও শুনি তো ? তোমায় কাছে না পাওয়ায় আমার তো কোন অভাব বোধ হয় না ?"

ব'ললুম, "আমি তোমার মতো আদর্শবাদী, ভাববাদী যীশুখ্রীষ্টও নই গৌতম বুদ্ধও নই। আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মোট বুদ্ধিতে বুঝি, নিজের জীবনের দামটা, এর সুখ সুবিধে. হাওয়াবাদী শূন্য আদর্শে চেয়ে ঢের বেশী।"

ব'ললে সে, "বেশ, তোমার কথাই হলো। সুখ সুখ ব'লে সুখের পেছনে ছুটলেই কি সুখ পাওয়া যায় ?

"সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছেন ঐ ওরে ক'রো ভয়
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।"

ব'ললুম, "ও-সব ব'লে আমায় ভোলাতে পা'রবে না মায়া। আমার মোটা মাথায় তোমার ও সব সূক্ষ্মতত্ত্বকথা মোটেই ঢুকবে না। আমি প্লেন্ মানুষ, প্লেন্ জবাব চাই।"

মায়া দেখলে যে এখন আমি ভয়ানক উত্তেজিত। তার স্বভাব-সিদ্ধ প্রখর অনুভূতি ও সহানুভূতিরদ্বারা বুঝেছিলো আমার স্বভাব। তাই বোধ করি মমতার সঙ্গে ব'ললে, "এত অধৈর্য্য হচ্ছো কেন? ব'লেছি তো যাবো। সে তো আর এখন হ'তে পারে না। বুড়ি মরার পর। তোমারও তো যাওয়ার দেরী আছে।"

"কই আর বেশী দেরী? দিনগুলো যে স্রোতের মতো ব'য়ে যাচ্চে।"

হাসলে মায়া। ব'ললে, "দ্যাখো, জীবন যাকে সঁপে দিয়ে ব'সে আছি তার অবাধ্য হই কি ক'রে? সে আমায় যা করাবে তাই ক'রতে হবে। এতে আমার সম্মতি অসম্মতির কি আছে?"

আনন্দে ব'ললুম, "তাই বলো। এবার পথে এসো। বশ্যতা স্বীকার করো। পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই, বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়।"

হেসে ব'ললে মায়া, "আমি তাই তো ক'রেছি। তুমি বুঝতে পারো না, কি বুঝেও বুঝতে চাও না তো আমি কি ক'রবো?"

হৃষ্টচিত্তে মায়াকে তার বাড়ী পৌঁচে দিয়ে হোটেল মাউন্ট্ এভারেষ্টের ধার দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো মায়া এই বিশাল গৃহটির মতোই বিরাট। আর তুলনায় আমি কতো ছোটো।

——::——

ছাব্বিশ

কয়েক দিন পরের কথা।

রাতের লেখা চিঠিগুলো সকালে ব'সে খামে পুরচি, ঠিকেনা লিখচি, এমন সময় মায়ার ছোট্ট পরিচারিকাটি খুঁজতে খুঁজতে এসে হাতে ছোট্ট একখানি স্লিপ্ দিলে, "তোমার এখনই একবার আসা দরকার।—মায়া।"

ব্যাপার কি! কাল রাতেই গল্প কোরে এলুম! জরুরী কোনও কিছুরই আভাষ কাল জানতে পারিনি। রাতের মধ্যে এমন কি ঘট্‌লো যার জন্যে সকালেই জরুরী ডাক প'লো!

দৈবাৎ-এরই তুনিয়া। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলিত জগতের কারণতত্ব যতই ঘাঁটিনে কেন, ওরই মধ্যে হটাৎ 'দৈবাৎ' এসে পড়ে। সস্টি জগত-ব্যাখ্যা কারণ-তত্ত্ব দিয়ে আর কুলিয়ে ওঠা যায় না। মানুষের বেলায় তো বটেই।

কারণ যে একটা আছে, তুচ্ছই হোক আর বড়ই হোক, এও তো না ভেবে পারা যায় না। না গিয়েও থাকা যায় না। এমন কোরে কোনও দিন ডাকেওনি। অথচ তু'একটা জরুরী চিঠি লেখা এখনও বাকী। জরুরী মানে মরিয়মের চিঠির জবাব। জবাব দিতে দেরী হ'লে হয়তো দড়ি খুঁজবে। যেতো মেজাজ। আবা চিঠির ঢং যা, তাতে জবাব দেবো কি তাও ভেবে কুল কিনারা ক'রে উঠ্‌তে পা'র চিনে। জবাবের বদলে পটাশ্ সায়ানাইড্ জাতীয় কিছু পাঠানোই ভালো ব'লবেন, তুমি লোকটী তো ভারী বিচ্ছিরি হে! নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অমন ভাবতে পারে তার মুখে ... ...। যা দিন্, দিন্; আপত্তি নেই। ওরূপ কপালই তো নিয়ে এসেচি আমি। আর আমার বৃদ্ধ ফোক্‌লামুখো নানাজানও সান্ত্বনার মোক্ষম কথা ব'লে গ্যাচেন 'চা'র আঙ্গুল চ্যাপ্টা কপাল। নসিব। নইলে অনেক দিন পর প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা প্রেয়সীর এ রকম চিঠি কোনও স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু জীর্ণদেহ হৃদয়েশ্বর পেয়েচেন কোনও দিন? ভাষা আর ভাবটা দেখুন। অনেক কথার অল্প বলচি, "আশা করি, গৌরী মায়া দেবীর আস্তানায় ঘন ঘন যাতায়াতে আর ফুঁ ঝাঁ তাবিজতুমারে তোমার শরীর আশাতীত ভাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আর কো

মরিল কি বাঁচিল তাহার খোঁজ খবর লওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। ছেলে মেয়েদের জন্যও তোমার আকর্ষণ দেখি না। তুমি একটী মানুষ না কি ?”

দেখেচেন চোখা বিদ্রূপের তীর ? এতে কার পিত্তি না জ্বলে ? ক'লজে পানি হোয়ে যায় না কার ? মানুষ তো আমি নই-ই। পশুত্বে মনুষ্যত্বে জড়ানো মানুষের কেউ পনেরো আনা ন'পাই মানুষ, তিন পাই পশু। আর কেউ বা এক আনা মানুষ, পনেরো আনা পশু। আমি ষোলো আনাই পশু এ আমি স্বীকার করচি। তাই ব'লে স্ত্রী হোয়ে ক'লজে ছেদ ক'রে দিতে হবে ? এমনি কি নবী ব'লেচেন, 'আমি দোজখের মধ্যে বেশীর ভাগ মেয়ে মানুষ দেখেচি !' আমার মরিয়মের চ্যাপ্টা কপালে যে কি হবে !

ও দিকে খালেককে লিখে দিলুম, 'মায়ার সম্মতি পাওয়া গ্যাচে। অল্পদিন পরেই আমরা আসচি। তুমি অতি অবশ্যই হয় ক'লকাতায়, নয় চাট্‌গাঁ টাইগার পাসের ওধারে একটা বাসা ঠিক কোরে রাখো। কি বন্দোবস্ত ক'রলে সেই মতা-বেক চিঠি দিও। তোমার চিঠি পেলেই আমরা রওয়ানা হবো।

বন্দোবস্ত একটা হবেই সে ভরসা আমার আছে।

সব ছেড়ে ছুড়ে কাঠের বাড়ীটার দিকে রওয়ানা হলুম। গিয়ে দেখি মায়া বাইরের কোনও ঘরে নেই। মায়ের ঘর থেকে আমার সাড়া পেয়ে ডাকলে, “এসো, এই ঘরে এসো।” গেলুম। মায়া অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হোয়ে কাঠের মেঝেতে কম্বল পেতে ব'সে আছে। জিজ্ঞেস করলুম, “কি ব্যাপার ? এত সকাল সকাল ডেকে পাঠিয়েচো কেন ?”

চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ব'ললে, “ব'সো।”

ব'সলুম। হটাৎ খাটের দিকে চেয়ে শূন্য-খাট দেখে জিজ্ঞেস করলুম, “মা কোথায় ?”

ব'ললে, “সেই জন্যেই তো ডেকেছি। মা কাল রাত ন'টায় নির্ব্বান লাভ ক'রেছেন।”

চ'ম্‌কে উঠলুম, “আঁ্যা ! বলো কি ? খবর তো দাওনি ?”

ধীর ভাবে ব'ললে, “না। অতরাতে তোমায় আর কষ্ট দিইনি। আর এসেই বা কি হ'তো। কি কাজেই বা লাগতে তুমি।”

মনে অভিমান হলো। ব'ললুম, "কেন? আর কিছু না পারি তোমার এরকম শোকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তো থা'কতে পারতুম।"

ব'ললে মায়া সিনিক্ দার্শনিকের মতো, "শোক? শোক ক'রে আর কি হবে? লাভ আছে কিছু?"

তারপর উদাসীন দৃষ্টি মেলে কোন্ কবির একটি রুবাই আওড়ালে,

"ভাবনা মিছে কান্না মিছে
সার শুধু তোর নয়ন লোর;
জীবন-আশা সব নিরাশা
দেখছো তো হায় বন্ধু মোর?
এমন দিনে আবার কত
হারিয়ে যাবে অস্ত পারে;
আমিও সেদিন থাকবো কিনা
কে জানে সে ঠিক খবর?"

এ যেন গ্রীক্ কবি এউরিপিদেসের ভাবের প্রতিধ্বনির মতো আমার কানে বাজলো।

"Man doom'd to care, to pain, disease and strife,
Walks his short journey through the vale of life
Watchful, attends the cradle and the grave,
And passing generations long to save:
Last dies himself: Yet wherefore should
We mourn?"

মুখে ব'লছে বটে, তবু কি তার মনে হারানোর ব্যাথা ধাক্কা দিচ্চে না! বুকখানা শোকে হাহাকার কোরে উঠেচে না? হাজার হোক মা তো বটে! সাধারণ একজন বন্ধু হারালেই মনে কত কষ্ট হয়!

"Life we have been long together,
Through pleasant and through
Cloudy weather;

'Tis hard to part when friends are dear ;
Perhaps 'twill cause a sigh, a tear."

দীর্ঘদিন কাটিয়েছি একত্রে জীবন,
ঝঞ্ঝাবাতে সুখ আহ্লাদে চলেছি দু'জন ;
বন্ধু যবে ছেড়ে যায় সহা বড় দায়,
বুক হ'তে পড়ে শ্বাস চোখে বারি ধায়।

আর তো গর্ভধারিণী ও তিপালিনী মা। হয় শোকে শোকে পাথর হোয়ে গ্যাচে, নয় তো শোককে ধৈর্য্যের পাথর চাপা দিয়ে মুখ বন্ধ কোরে রেখেচে। বাইরে যে অশোকামূর্ত্তি দেখচি এ কিছু আর সত্যি নয়। মনের গোপন তলে বেদনার সমুদ্দুর ব'য়ে চলেচে। সদাহাস্যময়ী মায়ার এ মূর্ত্তি আমার অসহ্য। বড় ব্যথার বল্লুম, "মায়া, আমি জানি সারারাত তোমার কিভাবে কেটেচে। আমায় কষ্ট দেবে না, তাই তুমি রাতে ডাকোনি। কিন্তু আমার পক্ষে কাজটি তুমি ভালো করোনি।"

একথার জবাব দিলে না মায়া। শুধু মেঝের দিকে মুখ নীচু কোরে রইলে। ফের্ বললুম, "তোমার চরম বিপদের সময় নিকটে থেকেও তোমার কাছে থাকবো না এ মনে হতেই বুকখানা আমার ভেঙ্গে প'ড়চে।"

সে মুখ তুললে এবার। চোখের কোণে দু'ফোঁটা পানি। বেদনার দ্বারে ঘা দিয়েচি আমি। ব'ললে মায়া, "ইচ্ছা থাকলেও ডাকি কখন? যোগাড় যন্তর জ্ঞাতি গোত্রকে ডাকতেই রাত অনেক হোয়ে গ্যালো। বুড়ো মানুষকে আর ঘরে ধ'রে রাখলাম না। তুমি চ'লে গেলে, আমি নিজ হাতে একবাটি চা ক'রে খাওয়াতে গিয়ে দেখি, সব নিস্পন্দ। নাকে হাত দিলাম, বুকে হাত দিলাম নাড়ী টিপলাম, মাকে কোনো খানেই আর পেলাম না। কখন যে চ'লে গ্যাছেন জানতেও পারলাম না।"

আমি একটি নিশ্বাস ফেললুম। আবার ব'ললে মায়া, "ধাম্মিক মানুষ কিনা! আমার মতো পাপিষ্ঠাকে মা জানতে দেবেন কেন? মনে হয় মরণের সময় কষ্টও হয়নি কিছু। এসে দেখি দিব্বি ঘুমিয়ে আছেন। বুকের উপর বুদ্ধ

মূর্ত্তি। আমার ধার্ম্মিক বাবাও বিনা কষ্টে মারা গ্যাছেন। শুধু প'ড়ে রইলাম আমি।" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পলো।

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "ভাইজান ভাবীকে কি খবর দেয়া হ'য়েচে ?"

ব'ললে, "হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে এসেই মেয়েটি চ'লে গ্যাচে সেখানে।"

"রাতে সেখানে-ও খবর দাওনি ?"

"না। লাভ কি ? অযথা কষ্ট দেওয়ায় কোনও পক্ষেরই লাভ নাই। তাঁরা ছুঁতে পারবেন না, কাঠ বইতে পারবেন না, পোড়াতে পারবেন না, শুধু শুধু শীতের রাতে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।"

'হুঁ' ব'লে ফেললুম এক দীর্ঘ নিশ্বাস। ঘরের চার ধারে একবার তাকিয়ে দেখি বহু মোমবাতি জ্ব'লে গ'লে মেঝেতে গড়ানী প'ড়ে গ্যাচে। জিজ্ঞেস ক'রলুম, "মোমবাতি কি পোড়াতে হয় নাকি ?"

ব'ললে, "হ্যাঁ। একশো একটি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের রীতি।"

ইতিমধ্যে আশরাফ ভাইজান, ভাবী ও খোকনের সাড়া পাওয়া গ্যালো। ভাবী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলেন। মায়া উঠে খোকনকে কোলে তুলে নিলে। ভাইজানকে চেয়ার এগিয়ে দিলে। ভাইজানও অভিযোগ ক'রলেন, "মায়া, রাতেই একটা খবর দেয়া উচিত ছিল।" আমায় জিজ্ঞেস ক'রলেন তিনি, "তুমি কখন এলে ?"

বললুম, "এই কিছু আগে।" মায়ার খবর না-দেয়ার কৈফিয়ৎ দিলুম আমি, "রাতে আমাদের কাউকেই খবর দেয়নি ভাইজান, আমরা কষ্ট পাবো ব'লে।"

ভাইজান ব'ললেন, "ওটা কি কথা ? একটু কষ্ট হবে ব'লে কি লোকে নিজেদের আপনজনের বিপদে আপদে কাছে দাঁড়াবে না ?"

ভাবী চোখে পানি নিয়ে ব'ললেন, "তো আমায় খবর দিলি না কেন ? সারারাতটি তোর একাকী কাটাতে হ'য়েছে ?"

ব'ললে মায়া, "সারারাত তো প্রায় কেটে গ্যালো আমার শ্মশান গড়ে। সেই গিঙ্ বস্তীতে।"

ভাইজান ব'ললেন, "তা হোক। একজন পাহাড়ীকে দিয়ে খবর তোমার দেয়া উচিত ছিল। প্রায় সবাই তো আমায় চেনে, আমার বাড়ী ও চেনে।"

সে কথা সত্যি। ভাইজান এবার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, বড় ব্যবসায়ী। প্রায় সবাই চেনে। চাকুরী ছেড়ে দিয়েচেন বহুদিন। এখন জনপ্রিয় নেতা।

মায়া ব'ললে, "দুঃখ ক'রবেন না ভাইজী। আমার বেলায় খবর পাবেন। তখন আমার দেহটি কাপড়ে জড়িয়ে কবরে রাখতেও আপত্তি হবে না। আমি লিখে দিয়ে যাবো।"

ভাইজী ব'ললেন, "ছিঃ ওকি কথা! তুমি দীর্ঘজীবি হও।"

ভাবী ব'ললেন, "ঐ রকম অলক্ষুণে কথা ওর চিরজীবন সুখ তো পেলো না।" একটি বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একথাটী অভিযোগ রূপে আমার মনে বোম্ শেলের মতো প্রচণ্ড ঘা দিলে। শুধু নিশ্বাস ফেললুম।

মায়া ব'ললে, "দীর্ঘজীবি হওয়ার দোওয়া আর দেবেন না ভাইজী। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? জীবনে কাউকে শান্তি দিইনি, নিজেও পাইনি। সারা জীবন শুধু শান্তির ভাণ ক'রেছি।"

একথার জবাব কারুরই মুখে জোগালো না। দিদি রান্নার ঘরের দিকে গেলেন। ব'লতে ব'লতে গেলেন, "দেখি ওর জন্যে কিছু খাওয়ার যোগাড় করি। সারারাত তো গ্যাছেই, এতোটা বেলা অবধি ওর পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি।"

খোকা সব রকম-সকম দেখে এতক্ষণ থাক্-ধান্ধা লেগেছিলো। এবার আস্তে আস্তে মুখ খুললে, "খালা-আম্মা।"

"বাবু,"

"তোমার কি হ'য়েছে খালা-আম্মা?"

"কিছুই হয়নি বাবু।"

"তবে মুখ ভার কোরে আছ কেন?"

"তোমার আম্মা কাঁদছিলো কিনা, তাই।"

"আম্মা কা'ন্‌ছিলো কেনো?"

"আমি কাল রাতে তোমাদের বাড়ী যাইনি, তাই।"

এ-দিক্ ও-দিক চেয়ে খোকন এবার জিজ্ঞেস ক'রলে, "নানী-বুড়ি কে খালা-আম্মা ? ঐ খাটে যে হরদম্ শুয়ে থা'কতো ?"

জবাব দিলে মায়া, বড় চমৎকার জবাব, "এই দেশটার ও-পারে একটা দেশ আছে বাবু। মানুষ খুব বুড়ো হ'লে সে দেশে চ'লে যায়। তোমার সেই দেশে গ্যাছেন।"

"বুড়ো মানুষ অত হাঁট্‌লো কেমন কোরে ?"

"হাঁট্‌তে তো হয় না বাবু। ঐ দেশের লোক হাওয়াই-জাহাজ নিয়ে আ তুলে নিতে।"

"ও-ও ; আর সেই জাহাজে তুলে ফুরুৎ কোরে উড়ে নিয়ে যায়। না

"হ্যাঁ বাবু।"

"আবার কবে আসবে নানী ?"

"আর তো আসবে না।"

"কেন ? তোমার কথা মনে হবে না ?"

"তাতো জানিনে বাবু।"

"যাওয়ার সময় শুনে নাওনি কেন ?"

"ভুল হোয়ে গেছলো বাবু।"

"তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না। আমায় ডা'কলে হ'তো ?"

"তুমি যে তখন ঘুমিয়েছিলে বাবু।"

"ও-ও। সেই রাতে। না ?"

"হ্যাঁ বাবু।"

খোকন গুরু গম্ভীর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশটিকে অনেকখানি হাল্কা কোরে নি এলো। এরা কী না পারে ? মরাকে বাঁচাতে পারে এমন সঞ্জীবনী মন্ত্র আ ছুনিয়ার শিশুদের মুখে।

খোকনের কথা শুনে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাইজী মাথা নেড়ে ব'ললে "হ্যাঁ, এ ব্যাটা পারবে। মায়ার ভাঙ্গা-মন চাঙ্গা ক'রতে এ ব্যাটা দেখছি এক বারে সিদ্ধ পুরুষ।"

আমি এতক্ষণে শুধু ব'ল্লুম, "হ্যাঁ। তাই বটে।"

ইতিমধ্যে ভাবী চা হালুয়া নিয়ে এ'লেন। শত অনুরোধেও মায়া এক বাটি চা ছাড়া আর কিছুই খেলে না। আমরা সব গুলোরই সদ্ব্যবহার ক'রেচি।

খাওয়া হোয়ে গেলে ভাইজান ব'ললেন, "আমার আবার একটু উঠতে হবে। বাজার সেরে বাড়ী ফিরবো। তোমরা মায়াকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। খোকন, তোমার খালা-আম্মাকে তোমার বাড়ী নিয়ে চলো বাবু। ভাই বাদশাহ, তুমি মায়াকে সাথে ক'রে নিয়ে এসো।" নিরহঙ্কার ভাইজান। বাজার কোরে নিজ হাতে ব'য়ে আনতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

ভাবী ব'ললেন, "ওঠ্ মায়া, ওখানে গিয়ে গোছল ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রবি।"

মায়া ব'ললে, "খালি বাড়ী, মায়ের ঘর খালি রেখে আজ তো যেতে পারি না দিদি।"

"কেন? শাস্ত্রে তো কোনও বাধা নাই?"

"না, তা নাই। আর আমি ও-সব মানিও না। যে মানতো সে চ'লে গ্যাছে।"

"তবে তোর কোনও কথাই শুনবো না। একা একা থা'কবি আর শুধু চিন্তা ক'রবি।"

আমি বললুম, "আমি ওকে সঙ্গে ক'রে আনচি ভাবী।"

"তাই করুন ভাই। আমি একটু আগে আগে যাই। বাড়ীর ছোক্‌রা চাকরটা তো একটা অপদার্থ। কিছু না ব'ললে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুই ক'রতে পারে না।" ভাবী মায়ার চাকরানীটাকে সঙ্গে ক'রে চ'লে গেলেন। র'য়ে গ্যালো খোকন। যেতে যেতে ব'ললেন ভাবী, "খোকন, তোমার চাচামিঞা আর তোমার খালা-আম্মাকে সঙ্গে ক'রে পরে পরে এসো।"

খোকন ব'ললে, "আচ্ছা। আসবো।"

আমি এক সময় জিজ্ঞেস ক'রলুম, "মায়ের মার্বেল পাথরের সেই ছোট বুদ্ধ মূর্ত্তি তো দেখছিনে? কোথায় সেটা?"

ব'ললে মায়া, "দিয়ে দিয়েচি। সাধ ক'রে এক গরীব বুড়ী চাইলে,—এক-কালে মার সঙ্গে ওর খাতির ছিলো খুব,—আমিও দিয়ে দিলাম।"

কথায় কথায় ব'ললুম, "বেশতো, তোমার নিজের মতামতের কথা ছেড়েই দাও। মায়ের জন্যে অতঃপর করণীয় কি আছে মেয়ে হোয়ে তাতো তোমার ক'রতে হবে? অন্ততঃ সমাজের মনের দিকে চেয়ে?"

অনেকটা অবহেলার সুরে ব'ললে, "কি আছে? যেমন সব সমাজে আছে, এখানেও তাই। জীবে দয়া অর্থাৎ যারা বেঁচে রইলো তাদেরকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পেট পুরে খেতে দেওয়া। আর পাহাড়ীদের দিতে হবে স্ফুর্ত্তির উপকরণ মাদক দ্রব্য।"

ব'ললুম, "তাহ'লে লোকজনকে খেতে তো দিতে হবে যখন অমন একজন অতিবৃদ্ধা ধার্ম্মিকা সংসার ত্যাগ ক'রলেন?"

মায়া ব'ললে, "ত্যাগ ক'রলেন কি ফিরে এলেন তাই বা কে ব'লবে? বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা তো আশা করি কিছু কিছু জানো। নিরীশ্বরবাদী এঁরা বিশ্বাস করেন কামনা বাসনা জীবে অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্ম অনুসারে এঁরা দেহ হ'তে দেহান্তরে ভ্রমণ কোরে বেড়াবেন। অবশেষে নির্ব্বান লাভ হবে।"

আবার এক মূহুর্ত্ত চুপ থেকে ব'ললে, "তাহ'লে লোকজনকে খাইয়ে মৃতের কি ফল হয়? যার উপার্জ্জন সেই-ই যদি ভোগ করে তা'হলে অপরের উপার্জ্জনের দিকে আশা কোরে থাকায় লাভ কি?"

আমি ব'ললুম, "দ্যাখো। আমাদের অশিক্ষিত মুছলমান সমাজেও অনেক জায়গায় ও-রূপ ধারণা আছে। তারা বাপ মায়ের সদ্‌গতির নামে বাহাদুরি লাভের আশায় খানাপিনার আয়োজন করে। গরীব হোয়ে যায়। অনেক সময় অনেক সমাজ জোর কোরে খানাপিনা আদায় করে। এবং ধর্ম্মের নামে, পুণ্য অর্জ্জনের নামে এ জুলুম চালিয়ে যায়। গরীব সমাজ আরও গরীব হোয়ে যায়।"

সমর্থন কোরে ব'ললে মায়া, "তাহ'লেই দ্যাখো ধর্ম্মের নামে কত বড় অধর্ম্ম করে তারা। আমার ইচ্ছা নাই কিছু ক'রতে।"

ব'ললুম, "ইচ্ছে নেই, না সামর্থ নেই, সেই কথা লজ্জা না কোরে অকপটে বলো। সামর্থ তোমার না থা'কতে পারে, এখন আমার আছে। তাঁর আত্মার কোনও অবমাননা কোনও অকল্যাণ না হয়, সেইটেই আমি দেখতে চাই।"

মায়া একথায় বোধ করি মুগ্ধ হ'লে। মুখ দেখে তাই তো মনে হ'লো।

ব'ললে, "আমার না থা'কলে তুমি দিতে তাতে লজ্জা ক'রবো কেন ? কিন্তু সত্যি দরকার নাই। টাকা আমার আছে।"

ব'ললুম, "তাহ'লে শুধু তোমার নৈতিক বিশ্বেসের জন্যে সমাজের বিধান ভাঙ্গা হবে না। কোন্ তারিখে বি ক'রতে হবে তার ব্যবস্থা কোরে ফ্যালো। অন্ততঃ সমাজের লোকে না বলে যে মায়া অন্য সমাজের লোকদের সঙ্গে মিশে বিগড়ে গ্যাছে।"

কিছুক্ষণ কি যেন ভা'বলে মায়া। তারপর ব'ললে, "বেশ্। তাই হবে। আমি তোমায় ইঙ্গিত দিচ্ছি, তুমি একটি ফর্দ্দো তৈরী করো। আমার ইচ্ছা ছিলো আমার যা কিছু আছে তা মহারাণী গার্লস স্কুলের ছেলেমেয়েদের উন্নতির জন্যে লিখে দিয়ে যাবো রেজেষ্ট্রি দলিল দিয়ে। খরচ ক'রলে কিছু কমে যাবে। তা হোক্—তব্ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

মনটা আমার খুশী হ'লো তার কথা শুনে। ব'ললুম, "দেরী হ'য়ে গ্যালো, এইবার ওঠো। রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে।"

"উঠি।" ব'লে মায়া এ-ঘর ও-ঘর তালা লাগালে। বাইরের ঘরে খোকন মায়ার-আনা একখানা ছবির বই দেখছিলো। তাকে কাছে ডেকে নিলে। তারপর আমরা সদর রাস্তায় পা দিলুম।

যেতে যেতে ব'ললুম, "মায়া, তোমার কথা চিন্তে ক'রলে এক দিক যেমন আনন্দে বুক ভ'রে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি নিরাশ হোয়ে যাই।"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কেন ?"

ব'ললুম, "দ্যাখো, তোমার নির্ম্মল জীবনটি সারা জনমই শুধু পুণ্য অর্জ্জন ক'রেচে। পাপের কালিমার ছোঁয়াচ একবিন্দু লাগেনি তোমার দেহে ও মনে। আর আমার জীবন ! এই অল্পদিনের জিন্দেগীতেই মাথার চুল থেকে পা পর্য্যন্ত ভর্ত্তি কোরেচি পাপে পাপে। পরকালে আমার কি হবে তাই ভাবি। এক ভরসা আছে। শুধু তুমি যদি তোমার পরশমণি প্রাণ দিয়ে আমায় তরিয়ে নাও।"

ব'ললে মায়া একটু দুঃখের হাসি হেসে, "হায়রে কপাল। কী এমন পুণ্য অর্জ্জন ক'রেচি বলো তো ? ভবিষ্যতের দিকে চাইলে আশা ক'রবার কোনও

অবলম্বন খুঁজে পাই না। তোমার কথা শুনে এক মরমী কবির রুবাই মনে পলো।' ব'লেই থেমে গ্যালো।

ব'ললুম, "থামলে কেন? বলো কি সে রুবাই? ভেতরে ভেতরে এ বইও প'ড়েচো তুমি? তোমার কিছু-পূর্ব্বের রুবাই-আবৃত্তি আমার কানে ও মনে ঝঙ্কার তুলেচে, যদিও বিষাদ ভাবে পূর্ণ সে রুবাই।"

ব'ললে মায়া, "এ রুবাইটিও বোধ করি আদিরসের নয়।"

ব'ললুম, "না হোক্ আদিরসের, না হোক্ আনন্দ ভাবের। তবু তুমি বলো। আমি শুনতে চাই।"

মায়া ব'ললে, "বেশ্, ব'লছি তবে। কিন্তু আমার মুখে তো তেমন কোরে শুনাবে না, যেমন কোরে তোমার মুখে কবিতা ভালো লাগে।"

ব'ললুম, "আহ্! তুমি কেন সঙ্কোচ ক'রচো? আওড়াও না? আর তো কেউ নেই এখানে যে তোমার লজ্জা হোতে পারে?"

তবু ভূমিকা শুরু ক'রে দিলে সে। বুঝলুম এত কথাতেও সঙ্কোচ তার কিছুতেই কা'টতে চাইচে না। বললে, "কবিতাটা কিন্তু নিরাশায় ভরা। আমার নিজের সম্পর্কে সুন্দর খেটে যায়। পরকালের ছবি। বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে মায়া-বদ্ধ সংসারাসক্ত জীব অপেক্ষা ক'রছে খেয়া তরীর। খেয়া-মাঝির জবাব শুনে দুঃখ ক'রছে পুণ্য-পুঁজিশূন্য মানবাত্মা,

"এই তো সেদিন খেয়ার ঘাটে
ব'ললে মাঝি, 'বন্ধু গো,
কড়ি আছে সঙ্গে তোমার
পার হ'তে চাও সিন্ধু গো?'
জবাব শুনে ফেল্‌লে শ্বাস,
'কড়ি-কাঙ্গাল হায় বেকুব,
তোমার মতোই শূন্য হাতে
আসে কতোই অন্ধ গো!'

আমারও অমনি জবাবই মিলবে খেয়া মাঝির কাছ থেকে। চোখের জলে তৈরী হবে আর এক বৈতরণী। এখানেও একা, সেখানেও একা। কেউ থা'কবে না কাছে, কেউ আশ্রয় দেবে না।"

ব'লতে ব'লতে কণ্ঠ তার ভারী হোয়ে এলো। চোখের কোণে অশ্রু দিলো দেখা। এর জবাব তো আমি দিতে পারিনে। আমি কি ব'লতে পারি, 'মায়া, আমি থা'কবো সাথে, আমি দেবো আশ্রয়? পৃথিবীতে যে লা'গতে পারলে না তার কোনও কাজে, পরপারের ঘাটে কোন্ কাজে লা'গবে তার? অনুশোচনা-বিদ্ধ বুক থেকে বেরুলো শুধু দোজখের আগুনের হলকার মতো গরম বাতাস।

বোবা রাস্তা ধ'রে চলেছি দুই মুক নরনারী। খোকনের মুখর মুখও স্তব্ধ হোয়েচে দুজন বর্ষীয়ান নরনারীর ভাবসাব দেখে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইচে খোকন এর ওর মুখ পানে। ভাব্ছে হয়তো 'কি বলে এরা, আর কেনই বা কাঁদে?'

আরও কিছুক্ষণ কেটে গ্যালো নিঃশব্দে। নির্ব্বাক চরণ ঘায়ে শুধু রাস্তায় শব্দ জাগে মচ্ মচ্ মচ্।

এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে আমিই সবাক হলুম আবার। ব'ললুম, "মায়া, তোমার এই শোক দুঃখের মধ্যেও একটি কথা জা'নতে আমার প্রবল বাসনা হ'চ্চে।"

আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে সে,—জিজ্ঞাসুদৃষ্টি। ব'ললুম, "আচ্ছা, তুমি কি স্বর্গ নরক মানো?"

ব'ললে সে, "মানি। নইলে জগতে দুঃখ কষ্ট সওয়া যে অর্থহীন হোয়ে যায়। আমি বই কেতাব তেমন পড়িনি। কোনও সাধু দরবেশের কাছেও যাইনি। তত্ত্বকথা কি জিনিস তাও জানিনে। তবু মন আমার বলে যে এই মানবসৃষ্টি, জগৎ-সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন খামখেয়ালী সৃষ্টি নয়। আদর্শের পেছনে ছোটা বোকামী নয়।"

একটু থেমে আবার ব'ললে, "এ বস্তু-জগতের ওপারে অবশ্যই একটি নৈতিক জগত আছে যেখানে নীতির পুরস্কার আর দুর্নীতির তিরস্কার কর্ম্ম অনুসারে মানুষের মিলবে। আজকের কতো দুখী সেদিন হবে সুখী, আর কতো সুখী হবে দুখী।"

চরম দুঃখের সময় মানুষের অন্তরের কথাই বেড়িয়ে আসে। আনন্দাতিশয্য যেমন একটি মদ, চরম শোক-দুঃখ-ভারও তেমনি একটি মত্ততা। মাতালের মতো হড়্ হড়্ কোরে মনের কথা উগ্‌লে দেয় সব।

তাইতো আবার জিজ্ঞেস ক'রলুম, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্মান্তরবাদে কি এ প্রশ্নের জবাব মেলে না?"

ব'ললে মায়া, "মিলে। কিন্তু বড় নিরাশাপূর্ণ কঠোর জবাব। মানবা হাঁপিয়ে ওঠে, হতাশ হোয়ে যায়।"

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "কেন?"

ব'ললে সে, "সামান্যতম বাসনা অবশিষ্ট থাকা অবধি তোমার ফিরে আ'স হবে এই কামনাময় ধরায়। খুঁজতে হবে তোমার মানবেতর মাতৃগহ্বর। বাস শেষ হ'লে হবে তোমার মুক্তি। এ বিধান বিজ্ঞানের মতো অমোঘ। কোনও প কারুণিকের করুণার হাত নাই এতে। তাই, নাই এতে কোনও ক্ষমা-সুন্দরের প ক্ষমা, মানবের অতি সাধারণ কোনও দুর্ব্বলতায়। তাহ'লে আশা ক'রবার, করুণা ব'লে কোনও জগত পিতার অস্তিত্বে আস্থাবান হওয়ার দরকার কি? অথচ তো কোনও স্রষ্টার অস্তিত্বে আস্থাবান না হোলে মানুষের দুঃখ-কষ্টের-জীবন দুর্ব্বিস হোয়ে পড়ে।"

আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। এক মূহুর্ত্ত পরে পুনঃ সে ব'ললে, "বইবা উপযুক্ত ভার হোলে তবেই বওয়া যায়। অসহ্য হোলে বিরক্তি ভরে মানুষে ফেলে দেয়। দুজন আর দশজনের অনুসরণযোগ্য যে আদর্শ, সে আদর্শ মা জাতির জন্যে হ'তে পারে না।"

ব'ললুম, "আদর্শে তো সব সময় সকলে পৌঁচতে পারে না মায়া। তা ব'লে আদর্শকে ছোট করাও কোনও যুক্তির কথা নয়।"

ব'ললে মায়া, "না, তা নয়। তাই ব'লে এও যুক্তির কথা নয় যে এম আদর্শ জীবনের সামনে হাজির ক'রতে হবে যা নাকি রূপায়িত ক'রতে কোটি গুটিকমাত্র মেলে। মায়ের কথাই ধরো না। সব ছেড়ে এক মাত্র মেয়ে, তার কথা খেয়াল না করে জীবনেই মৃত হোয়ে অর্দ্ধ জীবন কাটিয়ে দিতে হবে? মে হোয়ে আমার মনে কোনও ক্ষোভই জাগেনি কি?"

এ কথার জবাব দিতে পারিনি। এ সময় দিদির দরজায় পৌঁছে গেছি।

খোকন হাঁকলে, "আম্মা গো, আম্মাজান, আমরা এসে গেছি।"

মা ব'ললেন, "আয় খোকন, সকলকে ভেতরে নিয়ে আয়।"

——::——

সাতাশ

ভাইজী ভাবী দুসপ্তাহ ধরে মায়াকে নিজের বাড়ী আসতে দিলেন না। থা'কতে দিলেন না একা একা। বাড়ী রইলো তালাচাবি বন্ধ। মায়া রইলো খোকনকে নিয়ে ব্যস্ত। খোকনও ভুলে গ্যালো বাপ মায়ের কথা। মায়া স্কুলে নিত্য নিয়মিত যাতায়াত ক'রতে লাগলে। বাইরে কেউ দেখতে পেলে না শোকের চিহ্ন। শুধু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হ'য়ে রইলে সে, যেন বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ থমথ'মে ভাব ধারণ ক'রে আছে সুযোগমত বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে চ'মকে দিতে।

আমার নির্দ্দেশমত নির্দ্দিষ্ট দিনে পরোলোকগতা বৃদ্ধা মায়ের পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় মহাভোজ মহোৎসবে সম্পন্ন হোয়ে গ্যালো। লুচি পুরি তরকারী মিঠাই মণ্ডা ক্ষীর পায়েশ কিছুই বাদ গ্যালো না, যা নাকি সচরাচর গরীব পাহাড়ীরা চোখে দেখেনি। শুধু একটি জিনিস মায়া কিছুতেই দিতে রাজী হ'লে না, সেটি পচানী আর হাঁড়িয়া। মায়ার নিজ বাড়ীতেই হ'লো এই শোকোৎসব।

মহাভোজ অন্তে পাহাড়ীরা মহানন্দে মেতে গ্যালো মাদল নিয়ে, ঢোলক নিয়ে আর নিয়ে লম্বা শিঙ্গা। বাদ্যযন্ত্রের তা-গুড়্ গুড়্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ আর শিঙ্গার দীর্ঘ তরঙ্গায়িত পোঁ-পোঁ-ও শব্দ চার ধারে পাহাড় পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে নিস্তব্ধ কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে ফিরে আসছিলো আমাদের কানে, আর সৃষ্টি ক'রছিলো এমন এক পরিবেশ যা যথার্থই উপভোগ ক'রবার মতো।

আনন্দের আতিশয্যে সমাজ সর্দ্দার শিফতা মায়ার পায়ে প্রণাম ক'রলে, "আমাদের মাইজী মানুষ নয়,—দেওতা," সকলে জয়ধ্বনি কোরে উঠ্লে। এই উপলক্ষ শিফতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোয়ে গ্যালো। শিফতা উত্তম পর্ব্বত আরোহণকারী। বহুবার বহু বিদেশী দলের সঙ্গে নানা পর্ব্বতে সে আরোহণ ক'রেচে। উৎসব অন্তে রাতের দীর্ঘ প্রহর ধ'রে অতি মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেলুম তার সেই সব রোমাঞ্চ-কর অভিযানগুলোর কাহিনী। শুনতে শুনতে আমার ভেতরের ঘুমন্ত অজ্ঞাত এক দুঃসাহসিক কৌতূহলী ব্যক্তি, যে সময় সময় আমাকে উদ্বুদ্ধ ক'রতো অজানাকে

জা'নবার, অদেখাকে দেখবার,ধীরে ধীরে উত্তেজনায় গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হ'লে সে। বললুম তারে, "শিফতা, আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারো সামনের ঐ—সন্দাকৃফু পর্ব্বতটিতে? আমি যখন ওর দিকে তাকিয়ে দেখি তখন অদম্য একটি বাসনা অনু-ভব করি ওখানে যেতে।" এই কথাগুলো হিন্দুস্থানীতে কোনও প্রকারে প্রকাশ ক'রলুম মায়ার ঘরে ব'সে। ও-ঘরে তখন মায়া, দিদি আর অন্যান্য পাহাড়ী মেয়েরা। ভাইজানকে বাইরে পাহাড়ীরা নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনাচ্চে। এই অবসরে শিফতাকে ধ'রে এনে পর্ব্বত অভিযানের মনোরম পরিকল্পনায় মেতে উঠেচি।

শিফতা ব'ললে তার ইংরেজী উর্দ্দু মিশিয়ে, "হুজুর, ও-পর্ব্বতটি দেখতে নিকটেই মনে হ'চ্ছে বটে কিন্তু অনেক দূর। ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে পনেরো দিনের আগে সেখানে পৌঁছতে পা'রবেন না।

প্রথম তো এখান থেকে একেবারে এই পাহাড়ের নীচে নেবে যেতে হবে। এই উৎরাইয়ের পরে চড়াই শুরু হবে। ডবল ডবল ঘোড়া নিতে হবে। কেন না ও-পর্ব্বতে বিষাক্ত এক প্রকার ঘাস আছে যা খেলে ঘোড়া ম'রে যায়। তবে হ্যাঁ, একবার যদি ওর মাথায় চড়া যায় তাহ'লে জান ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে চার দিকের আশ্চর্য্য দৃশ্যাবলী দেখে। দেখতে পাবেন গোটা হিমালয় প্রদেশটিকে পনেরো হাজার ফিট উঁচু থেকে।"

বিজিনেস্ ইংলিশ শিখেচে শিফতা বিলিতী সায়েবদের সঙ্গে মিশে মিশে।

আমার মন আর নেই তখন দার্জ্জিলিং পাহাড়ে। শিফতার কথার সাথে সাথে কল্পনায় উড়ে গেচি সন্দাকৃফু পর্ব্বতে। গালে হাত দিয়ে শুনচি শিফতার কথাগুলো। শুনচিনে তো, গিল্‌চি। কখন মায়া এসে কি কাজে শিফতার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনচে সব, টের পাইনি। হটাৎ জিজ্ঞেস ক'রে ব'ললে, "কি যুক্তি বুদ্ধি হ'চ্ছে হুজুরের?"

চ'মকে উঠ্‌লুম। থতমত ভাব কাটিয়ে উঠে জবাব দিলুম, "কি আর। এর কাছ থেকে পাহাড়ের গল্প সল্প শুনছিলুম।"

ব'ললে মায়া, "যার স্ত্রী ছেলেমেয়ে থাকে তার ম'রবার সাধ কেন হয় তাই ভাবি।"

ব'ললুম, "ম'রবার সাধ আবার কে ক'রেচে?"

ব'ললে সে, "তুমি। যে পরিমাণে তোমার সাধ আছে পর্ব্বতে চড়ার, সে পরিমাণে তুমি কষ্টসহিষ্ণু কি ? সামান্য একটু অসুখেই যে গ'লে পড়ে সে যাবে সন্দাক্‌ফু পর্ব্বতে? এ রকম পাগলামি খেয়াল তোমার মাথায় দিলে কে ?"

শিফতাকে সম্বোধন ক'রে ব'ললে, "শিফতা, পাহাড় পর্ব্বতে চ'ড়ে চ'ড়ে তোমাকে পর্ব্বত-বাতিকে ধ'রেচে। সেই লোভে তোমরা খুঁজতে থাকো শিকার। নানা লোভনীয় কাহিনী ব'লে তাদের লোভকে জাগিয়ে তোলো। একবার ভেবে ত্যাখো না সে লোকটি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত। এ খাঁটি মেরে ফেলার বুদ্ধি।"

এই অহেতুক অসত্য অভিযোগে শিফতা হচ্‌কচিয়ে গ্যালো। ব'ললে, আঁকুপাঁকু ক'রে, "না মাইজী, আমি তেমন কোনও লোভই দেখায়নি। বাবু নিজেই নিয়ে যাওয়ার কথা ব'লেচেন।"

আমি অপরাধীর মতো চুপ ক'রে রইলুম। মায়া ব'ললে, "বাবুর আর কি। খেয়াল চাপলেই হ'লো। খেয়ালের পরিণাম কতদূর গিয়ে পৌঁছবে সে খেয়াল তো তাঁর নাই।"

আমার দিকে ফিরে ব'ললে, "দুদিন সবুর করো। তোমার দেখা আমিই দেখে আ'সবো। আমার সাজে। তোমার সাজে না।"

তবু চুপ কোরে রইলুম। কী ক'রে অস্বীকার করি যে অমন যুক্তি বুদ্ধির অবতারনা করিনি? বিশেষ কোরে আলোচনার শেষাংশ সে নিজের কানে যখন শুনেচে।

এবার চাপা রাগ ঝাঁঝের সঙ্গে ফেটে প'লো আমার উপর, "ছুটি ফুরিয়ে এলো। বাড়ী যাবে না? বাড়ী যাও। আমার সামনে আত্মহত্যা ক'রতে পা'রবে না।"

এবার হটাৎ মাথায় বুদ্ধি এলো। ব'ললুম, "আগাগোড়া সব না শুনে হটাৎ এমন ক্ষেপেচো কেন বলো তো? তোমায় না-জিজ্ঞেস ক'রে, তোমার অমতে ও-রকম দুর্দ্দর্ষ কাজে হাত দিই আমি? আমি পাগল নাকি?"

ব'ললে সে, "এক রকম তাই বইকি। সকলের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গ্যালো, ভাইজান ও-ঘরে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন, আর এ-ঘরে তুমি ব'সে হিমালয় অভিযান চালাচ্ছো। খেতে হবে না?"

ফোলা পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এলুম সাঁঝের পর কাঠের বাড়ীটাতে। দেখেই তো মায়া মায়াহীন, "কি হ'লো? খোঁড়াচ্ছো কেন?"

ব'ললুম, "এই ওধারে এক পাহাড় থেকে না'বতে গিয়ে পা হ'ড়্‌কে প'ড়ে গেছি। একটু দরদ লেগেচে।"

ব'ললে মায়া গম্ভীর বিদ্রূপের সুরে, "তাইতেই পর্ব্বতে চড়ার সাধ যায়? সামান্য একটু পাথরের ঢিবি থেকে নামতে যে আছাড় খায় সে আবার পর্ব্বতে চড়ার স্বপ্ন ত্যাখে কেমন কোরে?"

কৈফিয়তের সুরে ব'ললুম, "দৈবাৎ-এর কথা বলা যায়?"

ব'ললে মায়া, "পর্ব্বতে এরকম দৈবাৎ হ'লে তো হড়্ হড়্ কোরে পাতাল-পুরী যেতে হবে। এটা খুলনা নয় যে চোখ বুজে অন্যমনস্ক ভাবেও যেখানে সেখানে যাওয়া যায়। এখানে চোখ মন খোলা রেখেই চ'লতে হয়।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম যেন কতই না অপরাধী। হুকুম হ'লো, "শুয়ে পড়ো বিছানায়।" সুবোধ বালকের মতো আদেশ পালন ক'রলুম মুখ বন্ধ কোরে। ফোলা জায়গার দরদ্ দরদের সঙ্গে দেখে আইয়োডেক্স ফায়োডেক্স্ কি সব মালিশ ক'রতে লাগলে, গরম শেক্ দিতে লাগলে। গরম দুধের হুকুম হ'লো চাক্‌রাণীর উপর। সামান্য অসুখ বিসুখে এ রকম সেবাকারিনীকে পেলে তো রাজার হালে থাকা যায়। মিষ্টি চোট্‌পাট্ একটু করুক না। দুধাল গাইয়ের চা'ট্ও মিষ্টি।

সমস্ত দিন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে দিলে না মায়া। বিকেলের দিকে কী কাজে যেন বাইরে গ্যালো। জিজ্ঞেস্ করা তো বেআইনী তার আইনে। যেতে যেতে ব'লে গ্যালো, "নড় চড়ার আজ আর কাম নাই। চুপ্‌চাপ্ শুয়ে থাকো। আজ রাতের মধ্যেই ব্যাথাটা ক'মে যাবে।"

যোয়ান পুরুষ হোয়ে কত শুয়ে থা'কবো? এখন তো আর নজরবন্দী নই? এই ফাঁকা অবসরে যাই শিফতার বাড়ী, গল্প কোরে আসি। সম্ভব হ'লে ঘোটক বন্ধুটীকেও একটু সম্ভাষণ কোরেও আসি। ব্যাথা অনেক ক'মেচে। আজকে ঘোড়ার পিঠে চাপলেই হয়তো ব্যাথা ষোলো আনা ভালো হ'য়ে যাবে। বিষে বিষক্ষয়।

অল্প অল্প খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে গেলুম শিফ্‌তার বাড়ী। বাইরে ব'সে সে গুড়ুক্ টা'নছিলো। আমায় দেখে সে ব্যস্ত-সমস্ত হোয়ে দাঁড়ালে। কা'লকের টাকা টনিকের কাজ ক'রেছে তার গরীব সংসারে।

উদগ্রীব হোয়ে জিজ্ঞেস করলে সে, "হুজুরের পায়ের ব্যাথা কি খুব বেশী হ'য়েছিলো কাল?"

ব'ললুম, "হ'য়েছিলো একটু।"

কর্ম্ম-কঠোর পাহাড়ীর কাছে কি ছোট হ'তে আছে?

ব'ললে সে, "আমারই কাল ভুল হোয়ে গ্যালো। আমার মেয়েটি খুব ভালো মাসাজ্ জানে। অভ্যেস্ আছে ওর। বিলেতী সায়েবদের মাসাজ্ করে। এক মাসাজেই ব্যস্, মরা মানুষ তাজা হোয়ে ওঠে।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে সম্মতি আদায়ের জন্যে ব'ললে, "তা যদি মর্জ্জি করেন তো যেটুকু ব্যাথা আছে এখনি ভালো হোয়ে যাবে। আজই আবার ঘোড়ায় চাপতে পা'রবেন।"

আমার মৌনই সম্মতি লক্ষণ জেনে ডা'কলে, "কাঞ্চি, কালকের বাবু এসেচেন রে। একবার বাইরে আয়।"

মেয়ের বদলে মা এলো ঝট্‌পট্। এসে ব'ললে, "কাঞ্চী আসচে একটু পর।"

কিছু পর কাঞ্চী এলো। কাপড় বদলাতে স্নো পাউডার মা'খতে একটু দেরী হ'য়েচে তার। কাল দেখিনি তাকে। আজ যখন সাজগোজ ক'রে সামনে এসে দাঁড়ালে, দেখলুম খুকীই বটে। একেবারে পাতি-খুকী। বয়েস ষোলো কি ছাব্বিশ বুঝা কঠিন হলো। জামালগঞ্জ পাহাড়পুরের বুদ্ধ-মূর্ত্তির মতো থাঁদা নাকের দুপাশে শ্রীমুখচন্দ্রিমার গালের হাড় দুটো পাহাড়ের মতো উঁচু। তারও উপরে দুপাশে দুটি গহবরের মতো বেমানান দুটি ফুটো। আর সেই ফুটো দুটি থেকে এক জোড়া সর্পচক্ষু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলে আমার দিক। হাতের কব্জির হাড় দুখানা বোধকরি আমার পায়ের হাড়ের চেয়ে ছোট হবে না। গায়ের শিলা গোস্ত্ মনে হয় দুরমুশ্ কোরে মোটা হাড়ের উপর স্তরে স্তরে এঁটে দেয়া হ'য়েচে। লম্বা বেণী। সাপের জিভের মতো লক্‌লকে তার সরু অগ্রভাগ। যেন সাক্ষাৎ

কাম-মূর্ত্তি। দেখেই শিউরে উঠলুম। তার ক্ষুধিত তীক্ষ্ণ চোখ রাক্ষসীর ধ'রে খেতে আ'সচে।

শিফতার মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি মেয়ের সজ্জিত শ্রীরূপ দেখে চোখে আনন্দ আর ধ'রচে না। হটাৎ জিজ্ঞেস ক'রলুম শিফতাকে, "তুমি ক'রেচো কি এই দেশে, মানে, এই পাহাড়ের কোনও মেয়েকে?"

ব'ললে শিফতা হেসে, "না হুজুর। মাকালু (মহাকালো) পর্ব্বত থে নেবে আসবার সময় তিব্বত প্রান্তে দেখা হয় এক মেয়ে মানুষের সঙ্গে। তার তি জন স্বামী বর্ত্তমান ছিলো। আমার সঙ্গে খাতির হলো। সবকে ছেড়ে আম সঙ্গে চ'লে এলো। আমার তখন শরীর ছিলো গাট্টাগোট্টা। আমার তিব্বতী নারী।"

আমার অনুমান ঠিক। প্রথম দিনেই ধ'রেছিলুম এ নারী নিশ্চয়ই নেপ ভুটিয়া লেপ্চা সিকিমি নয়। দেহের গড়ন তা বলে না।

পুনরায় ব'ললে হেসে শিফতা, "বহুত্ দবেজ্ আওরত্ আমার হুজুর।"

মনে মনে ব'ললুম, 'তাতো দেখতেই পাচ্চি। আর তুমিও কম দরে ঘোড়্-সোওয়ার নও। নইলে তিনজন স্বামীর কাছ থেকে এ রকম ঘোটকীর মু লাগাম লাগিয়ে পিঠে সওয়ার হোয়ে আসা কম মর্দ্দের কাম নয়।"

আবার ব'ললে শিফতা, "লেড়্কীও আমার বহুত্ দবেজ্। একব মাসাজ ক'রে নিলে আর ভুলবেন না হুজুর।"

তাতো বটেই। দবেজ মায়ের দবেজ বেটি। মাসাজ তো ক'রে নেবে কিন্তু ইব্‌লিসী মেসেজ্ যদি একবার মনে ঢুকে যায়, আর মনের বজ্জাত ঘো খাড়া হোয়ে চিঁহিঁ চিঁহিঁ রবে বল্গাহীন ভাবে দৌড়তে থাকে ইবলিসী-চাবুক খে তো তাকে রুখবে কে? না বাবা, দরকার নেই আমার অমন মাসাজে। আ বিনা-মাসাজেই ভালো হোয়ে যাবো।

তাইতো ব'ললুম শিফতাকে, "না শিফতা, আমার মাসাজ সহ্য হয় ন দেহখানার ভির্‌মির ব্যারাম আছে কিনা। মাসাজে ব্যারাম আমার বেশী ব এমনিই তোমার অমন সুন্দর মেয়েকে পাঁচ টাকা জল খাবার দিয়ে দিচ্চি।"

দিলুম পাঁচ টাকা রূপশ্রীর হাতে। মহাখুশী হ'য়ে চ্যাপ্টামুখো চাঁদবদনী যখন দুপাটি সাদা সাদা দাঁত বের ক'রলে তখন কপালের নীচের ফুটো দুটো আর দ্যাখা গ্যালো না। বাপ মাও মহাখুশী। এমন দাতা তারা দেখেনি, যে বিনা-মাসাজে টাকা দেয়,—বড় কষ্টের টাকা।

আজকের চা বিস্কিটের সঙ্গে আনারস এলো আর এলো বাতাবী লেবুর কোয়া।

চা পান শেষে ব'ললে শিক্তা, "তাহ'লে হুজুর, আজ আর ঘোড়ায় চাপবেন না। একটা দিন বিশ্রাম নিন্।"

বললুম, "তাই ভালো শিকতা। কাল চড়া যাবে। আজ চলি তবে।" এই ব'লে উঠে দাঁড়ালুম। পাতি-খুকী দাঁত বের ক'রে কি ব'ললে তিব্বতী ভাষায় বিন্দু বিসর্গ বুঝলুম না। তবে তার কপাল পর্য্যন্ত হাত তুলে ছালাম করাটার মানে সহজেই বুঝতে পারলুম।

শিকতা ব'ললে বুঝিয়ে, "খুকী ব'লছে আপনি বড় ভালো মানুষ।" শুনে হাসলুম। সকলের ছালাম নিয়ে আগামী কালের আর একবার ওয়াদা কোরে পথে পা বাড়ালুম।

ভাবলুম মায়ার পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছে ভাল্-মানষের মতো চুপ্চাপ্ শুয়ে থা'কবো। ডুবে ডুবে খাবো জল শিবের বাবাও টের পাবে না। কিন্তু আমার চ্যাপ্টা কপালে যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাত হয়। মায়া পূর্ব্বাহ্ণেই হাজির, এবং বারান্দায় আমার অপেক্ষারত উদ্বিগ্ন মুখে পথের পানে চেয়ে আছে। দেখা হ'তেই রুষ্ট মুখে জিজ্ঞেস ক'রলে, "আজ আবার কোন পর্ব্বতে চড়াই ক'রতে গেছলে ?"

একটু হেসে মস্করা ক'রে ব'ললুম, "তিব্বতের মাকালু।"

ব'ললে মায়া তেমনি রুষ্ট মুখে, "আচ্ছা, তুমি কেমন মানুষ বলো তো ? তোমার শরীরে কুলোয় না, অথচ মনটি তোমার দুষ্ট ঘোড়ার মতো।"

বললুম, "তুমি ঠিকই ধরেচো মায়া। আমার স্বভাবের শতদোষের মধ্যে এই একটি দোষ, যা আমার পক্ষে অমঙ্গল আমি তাই ক'রে বসি।"

ব'ললে মায়া, "তাতো করো। কিন্তু পাগলেও তো নিজের ভালো মন্দ বোঝে। শিক্ষিত মানুষ হোয়ে তুমি কি তাও বোঝো না ? ছুটির আর কত বাকী ?"

ব'ললে মায়া, "সে কিছু না। হাকিম গিরির মতো একটি উচ্চ পদ ছেড়ে এখানে কি কুলিগিরি ক'রবে?"

ব'ললুম, "তাও আমার ভালো। যে হাকিমগিরির উঁচু আসন আমার মনুষ্যত্বকে দিনে দিনে নীচে নেবে নিয়ে যায়, তার চেয়ে তোমার উঁচু মনুষ্যত্বের সাহচর্য্যে শাক পাতা খাওয়াও আমার ঢের ভালো।"

ব'ললে মায়া, "ওটা সাময়িক আবেগের কথা। তোমার মতো মানুষ দুদিন কুলিগিরি ক'রলে তোমার মায়ার ছায়াও আর মারাতে চাইবে না। সে কথা থা'ক। যা হবার নয় তা ব'লে লাভ নাই।"

মনে একটা আঘাত পেলুম এই কথায়। তবু জবাব কিছু দিলুম না। নইলে অনেক নজির তুলে অনেক কিছুই ব'লতে পারতুম। আর যে তো অভি-মানিনী। এ সময় বলাও ঠিক হবে না। মনের ভয় ভাবনা তার আমার ভালো-বাসায় দুদিনেই শূন্যে উড়ে যাবে।

প্রসঙ্গটিকে একটু হাল্কা ক'রবার জন্যে বললুম, "কুলিগিরি ক'রতে হতো না মায়া। সে যাই হোক। মন খারাপ কোরে তোমার কাজ নেই। অনেকটা দার্জ্জিলিংএর মতো পরিবেশ তুমি দেখতে পাবে চাটগাঁয় যেখানে আমরা যাচ্চি। মনে হয় কোনও কোনও দিকে দার্জ্জিলিংএর চেয়েও অতি মনোরম সে জায়গা। এখানে সমুদ্র সৈকত নেই, বড় নদী নেই, গাছপালায় ঘেরা মনোরম সমতল ভূমি নেই, সাম্পানে চ'ড়ে দীর্ঘ বিকেল হাওয়া খেয়ে বেড়াবো তার ... ...।"

মাঝখানেই বাধা দিয়ে ব'ললে মায়া, "তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। আমি কি চাটগাঁ হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি নাকি যে অমন লোভনীয় বর্ণনা দিচ্ছো? না আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছো? চাটগাঁ না হোয়ে যদি তোমার চাকুরীর খাতিরে সুন্দর বনে থা'কতে হয় তাহ'লে কি তোমার বিবি সায়েব যেতে রাজী হবেন না?

ব'ললুম, "বিবি সায়েবের কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে যেতেও রাজী হবে আমার নিশ্চিত ধারণা।"

মায়া একথার জবাব কিছু দিলে না। না দিক। তবুতো বুঝতে পারচি যে সে যাচ্ছে আমার সঙ্গে, যাচ্ছে সর্ব্বস্বত্যাগ কোরে, যথা সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কোরে।

এক জোড়া কম্বল বালিশ চাদর রেখে অতিরিক্তগুলো দিয়ে দিলে গরীব প্রতিবেশীদেক। শিফতাও বাদ গ্যালো না। জিনিসের সঙ্গে সে আরও পেলে নগদ কিছু টাকা। শিফতা আর একবার গড় হোয়ে প্রণাম ক'রলে।

ছোট চাক্‌রাণীটাকে ব'ললে, "আমি কা'ল যাবার পরে নিয়ে যা'স আমার কম্বল চাদর বালিশ। ব্যবহার করিস্।"

আমি ব'ললুম, "মায়া, ভাইজান, ভাবী, খোকন ওঁদের সবাইকে আজ রাতে এখানে এনে রাখলে হয় না? সকাল সকাল ট্রেণ। সকালে দেখা সাক্ষাতের সময় হবে কি?

মায়া ব'ললে, "কেন হবে না? ট্রেনতো বেলা এগারোটায়। জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিয়ে একবারে সকাল আটটার মধ্যে বেরুবে। তাহ'লেই তো হবে।"

ব'ললুম, "তাও তো হতে পারে।"

তারপর আমায় ব'ললে, "তোমার বিছানাপত্র সবই তো স্যানিটারিয়ামে?"

ব'ললুম, "আনবো নাকি আজই এখানে?"

ব'ললে, "না। তুমি বরং আজ রাতে সেইখানেই থাকো। এর ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করো। বাজার যা থাকে ছেলে মেয়ে বিবি সায়েবের জন্যে, তাও সেরে নাও।"

ব'ললুম, "সেরে নিয়েচি। তবে বিবি সায়েবের জন্যে নিয়ে যাচ্চি মায়া সায়েবকে উপঢৌকন দিতে।"

ব'ললে, "তা দিও। কিন্তু সকাল সকাল আজ এখানে খেয়ে যাও। খাবে এখন? সামান্য যা-কিছু, সবই তৈয়ার।"

ব'ললুম, "আনো তবে। আমি আবার যাবো কসাই বস্তী।"

বহু রকমের খাবার আনা হ'লো। কাছে ব'সে মায়া খাওয়াতে লাগলে, বড় দরদ কোরে! খেতে খেতে এক সময় নজর তুলে দেখি তার চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রচে। ভাবলুম ওটা জন্মভূমির বিদায় ব্যাথা। তবু ব'ললুম, "মায়া, তুমি ভাবনা চিন্তে ছেড়ে দাও তো। হরঘড়ি ও-রকম মন-মরা হোয়ে থেকো না।" এ সময় মায়ার চোখের কোণে পানি গড়িয়ে এলো।

হো হো ক'রে হেসে উঠলে মনসুর, "দেখুন, জেবার মায়ের চোখ কেমন দেখুন।"

শুধু জেবার মা কেন, মেয়ে মানুষ আবার পুরুষকে ভোলে নাকি? সে পুরুষের যদি ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট থাকে তবে তো আর কথাই নেই।

গিন্নীকে ব'ললে মনসুর, "যাও, যাও, ভায়ার জন্যে জল্‌দি জল্‌দি কিছু নাস্তার জোগাড় করো।"

এবার আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস ক'রলে, "তা ভাই, এলেন কবে?"

ব'ললুম, "মাস তিনেক পূর্ব্বে।"

অবাক হ'লে মনসুর, "তি-ন মা-স আগে! তা এতদিন গরীবদের কথা একবারও মনে ক'রতে নাই?"

"সকলের আগেই মনে করেচি মনসুর ভাই। দেখেও গেচি, কথাও ব'লে গেচি।"

"কি রকম? কই, মনে তো পড়ে না। জেবার মাও তো মনে হ'লো কেবলই দেখলো।"

"না। তোমার সঙ্গে দ্যাখা হ'য়েচে।"

"আমার সঙ্গে! অথচ এত বড় ব্যাপারটি মনে থা'কবে না?"

"মনে না থাকবারই যে কথা মনসুর ভাই। মাস তিনেক পূর্ব্বে মাগরিবের ওয়াক্‌তে কোনও কাবুলী-মার্কা সি-আই-ডির সঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো?"

"হাঁ হাঁ, প'ড়ছে বটে মনে। মায়াদের খবর জিজ্ঞাসা ক'রছিলো। তা সে গুপ্ত পুলিশ কি আপনি?"

"কি জানি। দ্যাখো তো মিলিয়ে।"

এবার আর একবার হো হো করে ঘর ফাটাবার যোগাড় ক'রলে মনসুর।

"নাক চোখটি এরকমই ছিলো বটে। তা এতদিনে আর একটি বারও আসা চ'ললো না?" জিজ্ঞেস ক'রলে মনসুর।

ব'ললুম, "বড় লজ্জা ক'রতো মনসুর ভাই। কোন্ মুখে এসে তোমাদের সামনে দাঁড়াবো। তারপর তোমার সেই কথা, খুলনার এক শিক্ষিত...... ...... লোক এসে মায়ার জীবনটা.........................

কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই আর একবার হো-হো হাসির তোড়্। জুচ্চোর কথাটার উল্লেখ আমি আর করিনি। তবে দেখলুম তার মনে আছে। হাসি পনেরো আনা মিলিয়ে গেলে ব'ললে মনসুর, "আচ্ছা হাসির কাণ্ড।"

ব'ললুম, "এবার খুশীর কাণ্ড আছে মনসুর ভাই।" মনসুর শোনবার জন্যে উন্মুখ হোয়ে রইলে। আমি আবেগ-উত্তাপে ব'ললুম, "মায়াকে কাল নিয়ে যাচ্চি মনসুর ভাই, মায়াকে কাল নিয়ে যাচ্চি, তোমরা দোওয়া ক'রো। মায়ার জীবন আর বৃথা হবে না।"

অ্যাঁ! ব'লেন কি?" তারপর চীৎকার কোরে ডা'ক্‌লে, "আরে, শুনে যাও এদিকে। বড় খুশীর খবর, বড় খুশীর খবর।"

গিন্নী দরজার কাছে এসে জানিয়ে গেলেন, "সঙ্গে সঙ্গেই শুনেছি। তোমার আর নতুন কোরে শোনাতে হবে না। আমি নাস্তা আনি।"

ডেকে ব'ললে মনসুর, "ঐ সঙ্গে আমারও। খাওয়াটাই যা লাভ। ভেবেছিলাম ওর সইয়ের খোশ্‌খবরী শুনিয়ে একটি নতুন লুঙ্গী আদায় ক'রবো জেবার মার কাছ থেকে। তা আর হ'লো না। বাড়ীর মালিক তো সেই-ই কিনা। আপনি তো জানেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওরা খবর পেলো কি ক'রে? বিনা তারের টেলিগ্রাম আছে নাকি ওদের কাছে?"

ব'ললুম, "মনসুর ভাই, সারা জন্ম নারী টিপ্‌লে, আর নারীজ্ঞান হ'লো না? ওঁরা সবাই গেছলেন নাকি দরজার পর্দ্দার ওপার থেকে? অতি-কৌতূহলী ওঁরা। পর্দ্দার ওপারে ছায়াছবির নড়ন চড়ন, খুশ খাশ্‌ শব্দ, চুড়ির টুংটাং আওয়াজ, তোমার কানে যায়নি নাকি?"

হাবার মতো ব'ললে, "না ভাই। আপনি ঠিকই ব'লেচেন, আমার এখনো নারীজ্ঞান হয়নি। এ জা'তকে চেনা কি সহজ বাদশাহ্ মিঞা? এরা গুপ্ত পুলিশের বাবা।"

"তাই তো। ওঁৎ পাতায় ওস্তাদ যারা তাদের গুপ্ত খবর জা'নতে দেরী হবে কেন?"

নাস্তাপানি দিয়ে পেটের খোল ভ'রে নিলুম এবং সকলের দোওয়া আর এক বার ভিক্ষে ক'রে উঠে পলুম।

আনন্দ ঝ'রে প'ড়চে ওঁদের চোখে। পর্দ্দার এপারে মেয়ে মহলের সবা এসেচেন। দোওয়া ওঁদের মুখে ও মনে।

রাস্তায় ক'ধাপ এগিয়ে দিতে দিতে ব'ললে মনসুর, 'আল্লাহ আপনা খায়ের করুক ভাই, আল্লাহ আপনার দোজাঁহানে ভালাই করুক। আহা, মেয়েট এতোদিনে কুল পেলো। আপনার যাবার পর থেকে সত্যি মেয়েটির দিকে চাও যেতো না। কী গুম্‌গীন্ তার মুখ।''

ব'ললুম, ''আর গুম্‌গীন্ থা'কবে না মনসুর ভাই। সময় পাও তো ক গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।''

ব'ললে মনসুর উৎসাহের সঙ্গে, ''যাবো বইকি। নিশ্চয় যাবো। সবা মিলে আমরা তুলে দিয়ে আ'সবো।''

মাঝ পথে ছালামের আদান প্রদান হ'লো। আমিও খুশীর চিন্তে করতে করতে ফিরে এলুম স্যানিটারিয়ামে।

খুশীর জোশে দেহের সমস্ত রক্ত ধাওয়াও ক'রেচে মগজে। তাই রাতের অপ্রভাবে ঘুম আর চোখে ভর্ ক'রলো না। অর্দ্ধ রাতের দিক এক সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখচি মরিয়মের সঙ্গে বাড়ীতে আমার ভয়ানক গণ্ডগোল শুরু হ'য়েচে। সে চীৎকার ক'রে ব'লচে, 'আমি আর—থা'কবো না তোমার সংসারে। এখনি চ'লে যাবো। রইলো তোমার ঘর সংসার আর ছেলেমেয়ে।' আমিও সমানে চীৎকার ক'রে জবাব দিচ্চি, 'চলে যাও, এখুনি, এখুনি। বাড়ী খালি কোরে দাও। চাইনে তোমার মতো মেয়ে মানুষকে। আমার ছেলেমেয়েকে আম্মা দেখবে।' গট্‌গট্ কোরে বেড়িয়ে গ্যালো মরিয়ম রাগে ফুলতে ফুলতে। এতদিন পর সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় আমার মেজাজও ঠিক নেই। আমারও গায়ের গোস্ত্ ফুলে ফুলে উঠচে। বাড়ী ভ'রে গ্যাচে লোকজনে। আমোদ পাচ্চে তারা এই অসভ কাণ্ডকারখানা দেখে।

এদিকে পাশের তক্তপোষের ভদ্রলোকটি আমার গা নাড়া দিয়ে জাগি দিচ্চেন, ''ও মশোয়, ও মশোয়, শুনচেন? একবার জাগুন তো দয়া কোরে।''

নাড়ানাড়ির ঠ্যালায় ধড়্‌মড়্ কোরে উঠে বসলুম চোখ কচলাতে কচলাতে সন্ত্রস্ত ও জড়িত স্বরে ব'ললুম, ''অ্যাঁ! আউজুবিল্লাহ্। আউজুবিল্লাহিমিনাশ

শায়তোয়ানির্ রাযিম্। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল্'আলিয়েল্ আযিম্।"

ব'ললেন ভদ্দরলোক রুষ্ট মুখে, "অসময়ে মন্তর আউড়িয়ে লাভ কি বলুন? আমার ঘুমের কম্মটি শেষ কোরে তবে তো ছা'ড়লেন? বোধহয় হোটেলের সবাই জেগেচেন।"

জড়িত স্বর ও আবিষ্ট কর্ণকুহর তখনও স্বভাবে ফিরে আসেনি। অর্দ্ধ ঘুমন্ত ও অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থা। তেমনি ভাবেই ব'ললুম, "কেন বলুন তো?"

"কেন আবার কি? এমন চিৎকার জুড়েচেন, 'বেড়িয়ে যাও, বেড়িয়ে যাও, এক্ষুনি বেড়িয়ে যাও।' শীতের দেশের দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরটা ফেটে যায় আর কি! পাকা ঘুমের মধ্যে আঁৎকে উঠলুম। ডড়িয়ে গেচি মশোয়। মনে হ'লো ঘুমন্ত মানুষ আমাকেই গলাধাক্কা দিয়ে বার কোরে দিচ্চেন। এসব কি বলুন তো?"

এক মূহুর্ত্ত দম্ নিয়ে আবার শুরু ক'রলেন, "ম্যানেজারকে ব'লে এ কামরাটা আমার আজই ছাড়তে হ'চ্চে। এমন বীভৎস কাণ্ড তো দেখিনি। আরে ছ্যা, ছ্যা, রাম বলো, রাম বলো।"

বন্ধুর ধম্কানী আর অনুশোচনার ধাক্কায় ঘুম-জড়ানো ভাব আমার কেটে গ্যাচে তৎক্ষণে। ব'ললুম, "বন্ধু, ঘুমের ঘোরে কি করেচি না করেচি জানিনে। আপনার পাকা ঘুমের ব্যাঘাত ক'রেচি তার জন্যে দুঃখিত ও লজ্জিত। কামরা আপনার ছাড়তে হবে না। আমি আজই চ'লে যাচ্চি।"

একটু লজ্জা পেয়ে ব'ললেন ভদ্দরলোক, "না, না চলে আপনাকে যেতে ব'লচে কে? তবে মন্তর তন্তর যা জানা আছে সেগুলো ডাকাত-তাড়ানোর শেষে না প'ড়ে শোবার সময়েই প'ড়বেন, যাতে ডাকাতগুলো আদপেই আপনার উপর দুপুর রাতে হামলা না করে।"

ব'ললুম, "ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু স'ত্যি স'ত্যিই আমি আজ দেশে চ'লে যাচ্চি।"

লজ্জিত ও অনুতপ্ত হোয়ে ব'ললেন তিনি, "নিন্ তো। এ যাবার দিনে কি একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ক'রে ফেল্লুম। তা মশোয়, মনে কিছু ক'রবেন না। আমার আবার

ঘুমের ডিস্‌টার্ব্ব হোলে..........ব্রেণ্‌-খাটানো মাথা কিনা। উজ্‌তে পেরেচেন কথাটা?"

ব'ললুম মাথা নেড়ে, "জি হাঁ, বুঝতে পেরেচি।"

আবার লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে প'লেন তিনিও এবং আমিও।

শুয়ে পলুম বটে, ঘুম এলো না। কেমন জানি মনটা খারাপ হোয়ে গ্যালো। আজ যাবার দিনে কত আশা কোরে আছি শুভয় শুভয় কাটবে সব। আর একি অশুভ কাণ্ড! নিজ্‌কে নিজে বুঝালুম, স্বপ্নের কি কোনও মাথামুণ্ডু আছে নাকি?

সকাল আটটার মধ্যে প্রস্তুত হোয়ে বেড়িয়ে পলুম। ঠাণ্ডার দেশে তার আগে আর বেরুনো যায় না। যাবার পূর্ব্বে আমার সহবাসী বন্ধুটির নিকট আর একবার ক্ষমা চেয়ে নিলুম। আমার লজ্জা হ্‌ওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধুটিও বিশেষ লজ্জা পেয়েচেন। তাই তো আমার যাবার সময় হাত চেপে ধ'রে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললেন, "মনে কিছু নেবেন না ভায়া। আমার আবার.........। একবার ঘুম ছুটে গেলে....। উজ্‌তে পেরেচেন কথাটা?"

ব'ললুম, "না, না। সময়ের ঘটনা, ও-রকমটি হোয়েই থাকে।"

ঘুমের মাঝে এই সব কাণ্ড নিয়ে লজ্জাটা আমার গা-সওয়া হোয়ে গ্যাচে। এ-তো ভালো। তবু ভদ্দরলোক দুদণ্ড ঘুমোতে পেরেচেন। ভাগ্যিস্‌ পাকে চক্রে এক বিছানায় শোবার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর।

ছাত্র জীবনের ঘটনা। একমাত্র সোহাগের নন্দন ব'লে আম্মা-বেটি আদর কোরে আমার শোবার বিছানায় দুধারে দুটি লম্বা পাশ-বালিশ দিয়ে রাখতেন। আমিও পাশ ফিরলেই দুটির একটিকে পেয়ে গলা আঁকড়ে পড়ে থাকতুম। এ অভ্যেস্‌ আমার সুঅভ্যেসে পরিণত হোয়েছিলো।

একবার গেচি এক কুটুম্‌ বাড়ীর বিয়েতে। বহু জনসমাগম। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা বিছানা দেয়া রাতে সম্ভব নয়। আমার ভাগ্যে এক বুড়ো মানুষের সঙ্গে এক বিছানায় শোবার ভাগ নির্দ্ধারিত হ'লো। বুড়ো মানুষ আর ছেলে মানুষ, কোন প্রকারে রাতটা কেটে যাবে। রাতের পোয়াটেক্‌ বাকী আছে। ও বাবা, বুড়ো উঠে চীৎকার জুড়ে দিয়েচেন গেরস্থকে উঠবার জন্যে। হাঁক ডাকে সবাই উঠেচেন। বুড়ো তখন নিজে নিজে হুঁকো সেজে দম্‌ ক'ষচেন। ব্যাপার

কি ঘটেচে গেরস্থ জানতে চাইলেন সবিনয়ে। বুড়ো ব'ললেন, "আমাকে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আলাদা বিছানা পেতে দাও। বাবা! আমি এই মাটিতেই শোব। কিন্তু তোমার খাট পালঙে আর নয়।" গেরস্থ ব'ললেন, "ব্যাপারটি কি ঘটেচে খুলে বলুন তো?" বুড়ো ব'ললেন, "আর ব্যাপার কি! সে কহতব্য নয়। এই ছেলেটি কে গো? সারারাত আমাকে কোল-বালিশ বানিয়েছে। দুচোখের পাতা এক ক'রতে পারিনি।"

বিয়ের ধুমধাম্ খানা-পিনা ছেড়ে ভোর রাতেই পালিয়ে এসেচি।

সে যাই হোক্। আমার আরও অনেক সুঅভ্যেস আর সুকীর্ত্তি আছে সে সব ব'লে কাজ নেই। এখনকার মতো কাজ হ'চ্চে আমার মায়াকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ী রওয়ানা হওয়া। তাই তো আটটার মধ্যেই রিক্সা ডেকে বেড়িয়ে প'লুম।

দূর হ'তে মায়ার বাড়ী নজরে প'ড়তেই দেখলুম রং বেরঙের পোষাক পরা ছেলেমেয়ে এবং বর্ষীয়সী নারী-পুরুষে ভ'রে গ্যাচে বাড়ী। আরো নিকটবর্ত্তী হ'তেই দেখলুম নিশান হাতে ছেলেমেয়েরা, এবং পুরোভাগে র'য়েচে বড় নিশান একটি, তাতে লাল সালু কাপড়ের বড় বড় হরফে সেলাই ক'রা হয়েচে "মিস্ মনমায়া দেবী দীর্ঘজীবি হউন।" স্কুলের ব্যাজ্ থেকে বুঝলুম এরা মায়ার ছেলেমেয়েরা—অর্থাৎ আমারই, মায়া যেমন বলে থাকে।

কিন্তু দ্যাখো মায়ার কাণ্ডগুলো! তুমি যাচ্চো, কি বলে, ইয়ের বাড়ী, মানে নিজের বাড়ী। তা অত ঢোল শহরতের দরকার কি বাপু? আগে ভালোয় ভালোয় চোখ কান বুজে দেশে যাই। ভালোয় ভালোয় শাদীর কলেমা দিয়ে তোমাকে সমাজের কান-বেড়ী দিই, তারপর হৈ চৈ যত খুশী পারো ক'রো। কিন্তু এখনি কেন? এই এরা সব নিশান হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে আকাশ ফাটানো পাহাড়-কাঁপানো জয়ধ্বনি ক'রতে ক'রতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাক্, হাজার গণ্ডা লোক বিস্ময়ে কৌতূহলে দাঁত বের কোরে হাঁ কোরে চেয়ে চেয়ে তোমায় আমায় দেখুক, নিজেদের মধ্যে মন-গড়া শতগণ্ডা ব্যাখ্যা ক'রে টিকে টিপ্পনী কা'টতে থাকুক, গাড়ী মিস্ হোক; এই তো তোমার কাণ্ড? নামের গোড়াতেই যার মিস্, সে সব-বাস্-ই

না। নিরানন্দ ভাইজানকে ছালাম জানাবো, সময়োচিত শিষ্টাচারে আপ্যায়িত কোরে জানাবো ওরেভোয়ার, গুড্ বাই।

না, না, ভুল চিন্তা আমার। ওঁরাও তো যাবেন ষ্টেশনে আমাদেরকে সি-অফ্ ক'রতে। তবে তো আরও রিক্সার দরকার হবে। হয়তো সে সবের ব্যবস্থা ভাইজান ক'রে রেখেচেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, পাব লোক।

এগিয়ে চ'লেচে রিক্সা। এগিয়ে চ'লেচে আমার চিন্তা। সর্ব্বনাশ সোওয়া ন'টা!

পৌঁচে তো গেলুম ভাইজানের দরজায়। কিন্তু কই, রিক্সা তো দেখছিনে। মায়াটাও মারাত্মক ভুল করে। শুধু বকুনি খাই আমি। আজ নির্ঘাত আমার বকুনি না খেয়ে সে আর নিস্তার পাচ্চে না।

কিন্তু কারো সাড়া পাচ্চিনে কেন? কারো ছায়াও দেখতে পাইনে, না শুনতে পাই কারো কথা! কাণ্ডজ্ঞানহীন বেহুঁশ এরা! উচিত ছিলো না কি সব সেরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা?

মনে মনে বিরক্ত হোয়ে তিন লাফে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে গেলুম। "কই ভাবী, কোথায় আপনারা? সময় যে হোয়ে এলো? এখুনি না বেরুলে গাড়ী ধরা যাবে না। কি বিপদ! কে কোথায়?"

ছোকরা চাকরটাকে ধমক দিলুম, "এই, তোর গিন্নী মা কোথায়?"

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ব'ললে, "কামরে মে।"

মনখানা বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। কী ব্যাপার! ঘরে থেকেও ওঁরা জবাব দিচ্চেন না কেন? একি কৌতুক! সব সময় কৌতুক কি ভালো লাগে?

এ-খানে ও-খানে লম্বা পা ফেলে গেলুম ভাবীর শোবার ঘরে। কিন্তু একি! আর কেউ নেই, শুধু ভাবী বিছানায় উপুড় হোয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন কেন? মনটা হটাৎ দ'মে গ্যালো।

ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "ভাবী, কাঁদচেন কেন ভাবী? মায়া কি আসেনি এখানে?"

কাঁদতে কাঁদতে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বাধো বাধো অবস্থায় মুখ না তুলেই ব'ললেন ভাবী, "মায়া। মায়া নাই ভাই।"

আতঙ্কিত হ'য়ে ব'ললুম, "মুখ তুলুন ভাবী। বলুন খুলে মায়া কোথায়? আপনার পায়ে পড়ি, দেরী ক'রবেন না।"

মুখ তুললেন ভাবী। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে গ্যাচে। চোখের বর্ণ পাকা হলুদের মতো হ'য়েচে দেখতে। আবার ব'ললুম, "দেরী করবেন না ভাবী, বলুন মায়া কোথায়? কাঁদচেনই বা কেন? আমার বুক দুরু দুরু ক'রচে।"

ক্রন্দন-উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'ললেন ভাবী, "মায়া নেই ভাই। মায়া আমাদের মায়া কাটিয়ে পালিয়ে গেছে।"

পালিয়ে গ্যাচে? পা-লি-য়ে গ্যাচে? মায়া পালিয়ে গ্যাচে? ঠিক শুনচি তো? না, এও নারীদের এক অভিনয়? না, দুই সখীতে বিদায় বেলায় কিছুটা মজাক্ ক'রচে?

ব'ললুম, "ভাবী, গাড়ীর সময় হ'য়ে গ্যাচে। মায়াকে বের করুন কোথায় লুকিয়ে রেখেচেন। এখন মস্করা রঙ্গ রসের সময় নয় ভাবী।"

তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই ব'ললেন ভাবী, "ঠাট্টা নয় ভাই। প্রাণের ভাই আমার, ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা নয়। কি কোরে বিশ্বাস করাবো আপনাকে এ ঠাট্টা নয়?"

ব'ললুম হতভম্ব হোয়ে, "বিশ্বাস, বি-শ্বা স। আপনাকে বিশ্বাস .... কিন্তু কোথায় গ্যালো, কার সাথে গ্যালো ভাবী? সারা জীবন কি তা'হলে আমি মরিচিকাকে ধ্যান ক'রে ফিরেচি ভাবী? মায়া পালিয়ে যাবে। এ বিশ্বেস...... আপনার পায়ে পড়ি ভাবী সব খুলে বলুন, সব খুলে বলুন। আমি কি আলেয়ার পিছে এতদিন............"

ক্রন্দন কিছুটা প্রশমিত কোরে ব'ললেন ভাবী, "না ভাই, আলেয়া সে নয়, মরিচিকা সে নয়। আমার মায়া খাঁটি সোনা। তাই তো সে আপনাকে দুঃখ দিতে চায়নি। নিজে দুখের সাগরে সাঁতার দিয়েছে।"

"দুঃখ দিতে চায়নি, তবু পালিয়েচে? অন্য পুরুষের সাথে? এতদিন এতকাল পর?"

"না ভাই। চাকরানীটি ব'ললো সে আর মায়া একই ঘরে ছিলো দুজন। সারারাত ঘুমায়নি মায়া। জেগে জেগে চিঠি লিখেচে বুকের রক্ত দিয়ে, চোখের পানি মিশিয়ে। শেষ রাতে কে একজন বাইরে দুটি ঘোড়া নিয়ে এলো। চিঠি লিখা শেষ কোরে ভোর বেলায় আমাকে দিতে উপদেশ দেয় চাকরানীকে। তারপর এই শীতের রাতের আঁধারে গিয়ে ঘোড়ায় চাপে। চাকরানী ব'ললো জীবনে যাকে কাঁদতে দেখেনি, চোখের পানিতে তার সারা দেহ ভিজে গেছলো। চোখ মুখ মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে আর ফোলা।"

"কি লিখেচে সে চিঠিতে? কোথায় তার চিঠি ভাবী?" উন্মাদের মতো গলার স্বর আমার। নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাইনি। ভাবীও প্রকৃতিস্থ নন। নইলে তিনিও বোধ করি আমার চেহারা দেখে অঁৎকে উঠতেন।

ভাবী ইশারা কোরে টেবিলের উপর একটি খোলা চিঠি দেখিয়ে দিলেন। ত্বড়িৎ গতিতে গিয়ে তুলে নিলুম চিঠিখানা। হাত শুকনো পাতার মতো থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপচে। চোখ বোধ করি ঠিক্‌রে প'ড়তে চাইছিলো সে চিঠির ওপর। অনেকক্ষণ কোনও অক্ষর দেখতে পাইনে। দুএকটি দেখলেও মানে বুঝতে পারিনে। দুবার চা'রবার প্রথম দুচার লাইন প'ড়তে চেষ্টা ক'রলুম, দাঁড়িয়ে ছিলুম টেবিলের ধারে। অবশেষে ব'সে প'ড়লুম ধপাস্‌ কোরে শোবার পালঙ্কে। তারপর আবার প'ড়তে লাগলুম। ভাবীর নামে লেখা দীর্ঘ চিঠি,— সারাজীবন রেখেচি এ চিঠি বুকের মনিমঞ্জুষা ক'রে। এ চিঠি, না বুকের তাজা খুন?

"দিদি,

যে কথা এতোদিন বুকের মধ্যে জমা ছিলো, তোমার কাছ থেকেও লুকিয়ে এসেছি, আজ বিদায় বেলায় চোখে জলে তোমার পায়ে নিবেদন ক'রে বুকখানাকে খালাস ক'রছি এবং অনুতাপের হাত থেকে বিবেককে মুক্ত ক'রে, মনকে পূর্ণরূপে রিক্ত ক'রে বিদায় নিচ্ছি।

আমার সোদর বোন নাই। সে অভাবও কোনও দিন অনুভব করিনি। বোন থা'কলেও তোমার চেয়ে বেশী মমতা ক'রতো এ ধারণা আমার হয় না। আশে পাশে আরও দুচারজন সোদর বোনের কাহিনী তুমিও জানো আমিও জানি। মায়ের পেটের বোন হ'য়েও যে রকম হিংসার কাহিনী তাদের জানি তাই থেকেই

আমার এই ধারণা। সোদর বোন তোমারও নাই। মনে হয় আমায় পেয়ে তোমারও কোনও অভাব বোধ হয়নি।

আজ এতোদিনের অভিজ্ঞতায় তাইতো ভাবি দিদি, ভালোবাসা এমন একটি অপার্থিব বস্তু যা দুনিয়ার যে কোনও সম্পর্কের অনেক উর্দ্ধে। পরের মেয়েকে ঘরে এনে আপন জনকে পর কোরে দ্যায় এ কাহিনীও তোমার অজানা নাই। দুনিয়ায় দুই জাতের মানুষ দেখেছি। এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়া-সর্ব্বস্ব, সাধারণ রক্ত মাংস দিয়ে তৈরী। নজর তাদের দুনিয়ার উপর আর ওঠে না। আর এক শ্রেণীর মানুষ স্বর্গীয় ভাব-বস্তু দিয়ে গড়া। তাদের কাছে দুনিয়ার টাকা পয়সার কামলাল-সার তুচ্ছ ক্ষণিক লোভের চেয়ে প্রাণের আবেগ আবেদনটি বড়ো; বড় আদর্শের জন্য অতিলোভনীয় প্রাণটিকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। তোমার মায়াকে এতোদিন তুমি নিশ্চয়ই ভুল বিচার করোনি।

ঘটনা-চক্র নিজের আদর্শনীতিতে কাউকে ঠিক থা'কতে দ্যায়, কাউকে দ্যায় না। সূক্ষ্ম ঘড়ির যন্ত্রের মতো যাদের দুর্ব্বল মন ঘটনা প্রবাহ তাদেক ঘাটে ঘাটে শুষ্ক তৃণ গুচ্ছের মতো অসহায় রূপে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এতে তাদেক দোষ আমি দিতে পারিনে। মন তাদের কুটিল নয়। এদের উপর আমার করুণা হয়, রাগ হয় না। শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ খোকনের চাচা মিঞা। তাইতো তাঁর উপর কোনও দিন আমি রাগ বা অভিমান ক'রতে পারিনি। প্রথমে জীবনে আমাকে জীবনের প্রথম ভালোবাসা প্রদানও তাঁর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। সেই জন্য চিরদিন তাঁকে ক্ষমা ক'রে এসেছি। এই বোধ-শক্তির জন্যই তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট্ ও অম্লান রাখতে পেরেছি। আমাকে এতোদিন রক্ষা ক'রেছে, শক্তি দিয়েছে আমার অমলিন প্রেম।

দিদি, মানুষ পুতুল ভালোবেসে শ্রদ্ধা ক'রে দেবতার আসনে তুলে দিয়ে সেই দেবতাকৃত দেবারোপিত পুতুলের জন্য কেন পৃথিবীর শত লোভকে তুচ্ছ করে তার কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। তিনি অত্যন্ত ভাব-প্রবণ। তাঁর ভাবালুতাকে আমি বাহ্যিক ভর্ৎসনা ক'রেছি, কিন্তু তাঁকে মনে মনে বিচার ক'রে দোষারোপ ক'রতে পারিনি। যে-প্রেমপাত্রকে দেহীরূপে পাওয়া যায় না, যার সঙ্গ-সুখ অমৃতের মতো উপভোগ করা যায় দীর্ঘদিন তার আকর্ষণ জীবনে স্থায়ী-আসন প্রতিষ্ঠা করে।

তাইতো বিবাহিত জীবন লাভ কোরেও আমাকে তিনি কোনও দিনই ভুলতে পারেননি, সুখও পাননি। হয়তো পেতেন, ভুলতেও আংশিক পা'রতেন যদি তেমন সহানুভূতিশীল মমতাময়ী হাতে প'ড়তেন। আমি যতদূর জানতে ও বুঝতে পেরেছি তা তিনি পাননি। তাইতো আমাকে না-পাওয়ার দুঃখেরও তাঁর অবধি নাই। অন্তরে-পাওয়ার আদর্শেও তিনি আস্থাবান নন, বড়ই অধৈর্য্য।

ঘটনা চক্র তাঁর এবং আমার জীবনে এমন জট পাকিয়ে রেখেছে যে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ারও কোন পথ নাই। এখন ইচ্ছা ক'রলেই আমরা সব কিছু ক'রতে পারি না। স্বল্প-বুদ্ধি নারী হোয়েও পণ্ডিতের ভাণ নিয়ে তাঁকে আমি বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু পারিনি। তাঁর ভাব-প্রবণতার ঢেউয়ের দোলায় আমার যুক্তি আছাড় খেয়ে ভেসে গ্যাছে।

আমি এই কয় মাসে বুঝতে পেরেছি উনি প্রেম-বুভুক্ষ বুকের হাহাকার নিয়ে এবারে দার্জ্জিলিং এসেছেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তবেই যাবেন এই দৃঢ় সংকল্প তাঁর মনে। তাঁকে দোষ দিই কি ক'রে? সত্যিকার মানুষের প্রেম আর জীবন তো আলাদা নয় দিদি। জীবনের অস্তিত্ব নিঙ্‌ড়িয়ে যে প্রেমের জন্ম, সে-প্রেম যাকে দেয়া যায় জীবনও তাকে দেয়াই হোয়ে থাকে। কাজেই আমার জীবনের উপর তাঁর অধিকার আছে। কিন্তু দিদি, যিনি আমার জীবনের জীবন তাঁর অমঙ্গল আমি চোখের সামনে কোন প্রাণে সহ্য ক'রবো? যদি বুঝতাম আমাকে নিয়ে তাঁর মঙ্গল হবে তাহ'লে এতটুকু মনোকষ্ট তাঁকে দিতাম না। আমি বুঝেছি এ জীবনে সুখ তাঁরও অদৃষ্টে নাই আমারও না। নইলে এমনি কোরে দুঃখ পারাবারের দুই-তীরে দুজনে ব'সে জীবন-ভর কাঁদবো কেন?

এখন এটুকু উনি বুঝতে চাইছেন না যে তাঁর পূর্ব্ব-হোতেই সহস্র-গেরো-দেয়া জীবনে আর একটি অতি জটিল গেরো দিয়ে নিজের জীবনটি ক'রতে চান দুর্ব্বিসহ। তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়ে, সর্ব্বোপরি তাঁর বাপ মা,—সবারই চোখের জলে সাঁতার কেটে আমার মতো অতি তুচ্ছ এ মায়াকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধবেন এও আমার পক্ষে অচিন্ত্য। অভিশাপের দীর্ঘ নিশ্বাস প'ড়বে নাকি এঁদের বুক থেকে? কাঁদবে না কি ছেলেমেয়ে দিনরাত বাবা বাবা ব'লে? সেই সব মনে ক'রে পাপী মন নিয়ে কোন সুখে তাঁকে নিয়ে সংসার পাতবো? একত্রে সতীন নিয়ে ঘর করা

সেও বড় আগুন। সে আগুনের হল্কায় আমার যাই হোক্ তিনি সইতে পা'রবেন না সে অগ্নিদাহ। আর আমিও সইতে দেবো না। চোখের সামনে সহস্র কাজে ও কথার ঝাঁঝে তিলে তিলে দ'গ্ধে মরচেন তিনি। আমার উপর যদি কোনও অত্যাচার হয় সে আঘাতও বাজবে তাঁর মনে প্রচণ্ডরূপে। নারীর মতো কোমল প্রাণে সইতে পা'রবেন না তিনি। তারপর, তারপর হয়তো একদিন দেখবো দুঃখের জ্বালা সইতে না পেরে তিনি.........

দিদি, তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমার মরণ হ'লো না কেন? সেই সাক্ষাতই তো হ'য়েচে আমাদের কাল। অমৃত ও বিষ মেশানো সেই সাক্ষাত আমাদের জীবনকে নঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো অদৃষ্ট-চক্রের ঢেউয়ের তালে তালে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যার অদৃষ্টে অশেষ মনোস্তাপ লেখা আছে তার মরণ হবে কেন দিদি? অল্প বয়সে একমাত্র ভাইকে হারালাম। বাবা ছিলেন, মা ছিলেন তাঁরাও একে একে ছেড়ে গেলেন। আমি নিজে বেঁচে থেকে চোখের সামনে তাঁকে পলে পলে মরণের কোলে ঢ'লে প'ড়তে কেমন কোরে দেখবো? তুচ্ছ এক মায়ার জন্য তাঁর বুকের উপর সরব নীরব সব রকম অত্যাচার বিষের ধোঁয়ার মতো অহর্নিশি বিষোতে থা'কবে এ আমি সইবো কি ক'রে? পারবো না, পারবো না। তার চেয়ে আমার মরণ হোক্ দিদি। আত্মহত্যা কোরে নরকগামী হ'লে তাঁকে কোনও কালেই পাবো না। সেই জন্য স্বাভাবিক মরণের পথ অনুসন্ধান ক'রতে র'ওয়ানা হলাম বাপের দেশে কঠোর আত্মনিপীড়ন ও দুর্গম পথকৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে। তোমরা যখন এ চিঠি পাবে আমি তখন বিপদ সঙ্কুল সিংহলীলা পর্ব্বতপুঞ্জ ও মেচ্ছি নদীর পথে হয়তো অনেক দূরে। যদি সিংলীলার সিংহের পেটে না যাই তো তার বরফ-ঢাকা চূড়ায় আমারও তপ্ত বুকে হিমানী-পুঞ্জ দিয়ে মা ধরিত্রী মমতায় রেখে দেবে নিজের বুকে। বরফের কবর হবে আমার। অভিযাত্রীর দল হয়তো একদিন আবিষ্কার ক'রবেন আমার দেহ। কিন্তু সামান্য একটি মৃতদেহকে কে গ্রাহ্য ক'রবেন? তাঁরা কি জানবেন যে এই মৃতদেহটির পেছনে করুণ একটি কাহিনী ছিলো? তাঁরা কি জানবেন যে এই মৃতা একদিন তার উদ্বেলিত উচ্ছল প্রাণাবেগে চঞ্চল হোয়ে ফিরতো?—তার প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা উজাড় কোরে ঢেলে দিতো তার প্রেম-দেবতার পায়ে?

যাক্ সে কথা। কেউ না জানুক, তুমি তো জানো সে ইতিহাস।

দিদি, তবু আমার অন্তর দেবতা কি বলে জানো? বলে, 'ওরে রাক্ষুসী, তোর মরণ এখনও কপালে নাই। যাকে তুই এড়াতে চা'স, যার জন্য তুই দেশান্তরী হোয়ে মরণকে বরণ ক'রতে চা'স্, তোর মরণের পূর্ব্বে আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। মরণ তোর হবে তারই কোলে।' জানিনা, এ অনাগত সত্যের ডাক, কিম্বা আমারই অবুঝ মনের নিভৃতে লুক্কায়িত একটি পরম কমনীয় লোভনীয় বাসনা। কিন্তু আমার অন্তর দেবতা তো কোনও দিন আমাকে ভুলায়নি দিদি।

দিদি, আমি চল্লাম। কোনও দুঃখ ক'রো না। চিরজীবন তোমাদের কাছে ঋণী হোয়ে রইলাম। এক বিন্দু তোমাদের উপকারে এলাম না। আমাকে অনুসন্ধান ক'রো না। ক'রলেও পাবে না। মরণের যার ভয় নাই বরং সাগ্রহে কামনা করে তাকে তার আর কি ভয় আছে দুনিয়ায়? সিংলীলা পর্ব্বত, হিমবাহ, তুষার নদী সবাই আমাকে আজ হাতছানি দিয়ে ডা'কছে। বিপদে আপদে ক্ষুৎপিপাসায় ওদেরই বুকে নেবো আশ্রয়।

আমার সোনার খোকনের কথা মনে হতেই অঝোর ধারে নয়ন ঝুরছে। খোকন আমার মানুষ হবে দিদি। সেদিন তার রাক্ষুসী খালা-আম্মার কথা বার বার মনে ক'রবে,—নিশ্চয় ক'রবে। আমার অন্তরাত্মা বার বার ব'লে দিচ্ছে একথা। ভাইজানকে আমার অশান্ত অতৃপ্ত আত্মার জন্য দোওয়া ক'রতে ব'লো।

আর—আর তাঁর পায়ে আমার শত কোটি ছালাম জানিয়ে বলো আমার জন্য তিনি যেন শোক দুঃখ না করেন, তাঁর সোনার দেহটি শুকিয়ে না ফ্যালেন। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। তাঁর স্ত্রীকে চেষ্টা ক'রে ভালোবাসতে ব'লো। আমি চিরদিনই তাঁর হোয়ে রইলাম।

তোমরা তাঁকে দেখো। বুঝ্ সুজ্ দিয়ে সযত্নে গাড়ীতে তুলে দিও। বিহ্বল অবস্থায় ছেড়ে দিও না। যেন উনি মনে করেন যে-মায়া একদিন ছায়ার মতো তাঁর জীবনে নেবে এসেছিলো আজ সে-মায়া ছায়ার মতোই মায়া হোয়ে মিলিয়ে গ্যালো।

বাপ মার অবাধ্য হোয়ে পাতকী যেন তিনি না হোন। আমি বিশ্বাস করি দিদি, এনশ্বর জীবনই মানুষের শেষ পরিণতি নয়। মানুষের আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ

বৃথা হবে না। একদিন পাবো তাঁকে চরম একান্ত কোরে। সেদিনের অনুসন্ধানে আজ একাকী যাত্রা ক'রলাম। আশীর্বাদ ক'রো দিদি, তোমার মায়ার যেন আর কাঁদতে না হয়।

এই চিঠি তাঁকে দেখিয়ো না। তাতে উনি আরও শোকবিহ্বল, আবেগ-চঞ্চল হোয়ে উঠবেন। মুখে খবরটি শুনিয়ে দিও। সারারাত ধ'রে চোখের জলে লিখলাম এই চিঠি। লেখা অন্তে যাত্রা ক'রলাম ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে। একজন পাহাড়ী ঘোড়া নিয়ে কিছুটা পথ আমাকে দেখিয়ে দিয়ে আ'সবে। তারপর আমি একা। তোমার পায়ে আমার অশ্রু-সিক্ত ভক্তি। ইতি—

তোমার চির-একা
হতভাগিনী বোন,
মায়া।

পুনশ্চ :—

আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ব'ললে যাবো ব'লেছি বরাবর। মিথ্যা বলিনি দিদি। পাপিষ্ঠা আমি, তাঁরই মঙ্গলের জন্য দুই অর্থপূর্ণ হেঁয়ালী কথার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলাম। সে যাওয়া এই-যাওয়া দিদি। তাঁর দিনক্ষণ বাঁধা ছিলো। আমারও তাই দিনক্ষণ বাঁধতে হলো। আগাগোড়া আমার জবাবগুলো মনে ক'রতে ব'লো দিদি, তাহ'লেই মন পরিষ্কার হোয়ে যাবে। তখনি সব ভেঙ্গে পরিষ্কার ক'রে ব'ললে হয়তো কি একটা অঘটন ঘটিয়ে ব'সতেন। তাই তো বাধ্য হোয়ে রহস্যাবৃত ছলনার আশ্রয় নিয়েছি। আমার সকল দোষ, সকল ত্রুটি, আমার সর্ব্ব আবর্জ্জনা তিনি যেন দাসী ভেবে মার্জ্জনা করেন। ইতি —

তাঁর চির-দাসী, চির-বন্ধু,
মায়া।

চিঠি প'ড়তে প'ড়তে দেহের রক্তস্রোত সব ধাওয়া ক'রেচে মাথায়। অত্যন্ত উত্তেজিত হোয়ে উঠলুম। পরের চিন্তা পরে ক'রবো। এখন আমার সর্ব্ব-প্রথম কাজ হ'চ্চে মায়াকে ফিরিয়ে আনা। পাহাড়ে রাস্তায় এখনো সে বেশী দূর যেতে পারেনি। যে আমারই কারণে ম'রতে গ্যাচে তাকে মৃত্যুর দোর থেকে

ফিরিয়ে আনা আমার ফরজ এবং গরজ। ফিরিয়ে তাকেই আনতে হবে, নইলে আমারও আর ফেরা হবে না।

রেসের ঘোড়ার মতো চঞ্চল হোয়ে উঠেচি। থর্‌থর্‌ ক'রতে ক'রতে জিজ্ঞেস করলুম ভাবীকে, "ভাবী, ভাইজান কোথায়?"

আমার মুখ চোখের অবস্থা দেখে বোধ করি তাঁরও মুখ চোখে উদ্বেগের ছায়া কালো হোয়ে ছাথা দিলো। ব'ললেন তিনি, "খবর পেয়েই তিনি ছুটেছেন মায়াকে ফিরিয়ে আনতে।"

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ব'ললুম, "তবে আমিও যাই।" ব'লে দরজার বাইরে তড়িত গতিতে পা দিলুম। চীৎকার কোরে ব'লে উঠলেন ভাবী, "আপনি কোথা যাবেন ভাই?"

বাইরে জোরে জোরে যেতে যেতে ব'ললুম, "মায়াকে আনতে।"

চীৎকার কোরে ছুটে এলেন ভাবী, "আপনি রাস্তা ঘাট চেনেন না। শুনুন, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন। আপনার ভাই তাকে আনবে।"

সদর রাস্তা পেরিয়ে তখন আমি দৌড়তে শুরু করেচি। কার কথা কে শোনে। কানে আমার আর কোনও কথাই ঢুকচে না। দৌড়তে দৌড়তে মনে প'লো শিফ্‌তার কথা। নিশ্চয়ই চেনে সে এই পাহাড় পর্ব্বতের খাঁজ্‌ খোঁজ গুহা গর্ত্ত। চেনে সে এর পথঘাট।

কয়েক মিনিট দৌড়ের পর পেলুম শিফ্‌তার বাড়ী। পেলুম তাকে বাইরের দাওয়ায় চুরুট টানতে দস্যুর মতো ধরলুম গিয়ে তার হাত। হচ্‌কচিয়ে উঠলো শিফ্‌তা। উত্তেজিত আর্ত্তস্বরে ব'ললুম তাকে, "শিফ্‌তা, ওঠো, ওঠো। ওঠো শিফ্‌তা। শীগ্‌গীর্‌ ঘোড়া আনো, ঘোড়া আনো এক জোড়া।"

সেও চরম উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস ক'রলে তাড়াতাড়ি, "কি, কি হ'য়েচে হুজুর?" কালো হ'য়ে এসেচে তারও মুখ।

ব'ললু, "মায়া চ'লে গ্যাছে। আর দেরী ক'রো না শিফ্‌তা। ঘোড়া আনো, ঘোড়া।"

"মাইজী কোথায় গ্যাছেন হুজুর?"

"ম'রতে গ্যাছে। ঐ সিংলীলা পর্ব্বতের দিকে। পরে শুনো শিফ্‌তা। জল্‌দি করো, জল্‌দি করো, ঘোড়া আনো, তোমার আমার ঘোড়া। এখনও পাওয়া যাবে তাকে।"

তিন চার বাড়ী পরের সেই ঘোড়া দুটো আ'নতে ছুটলে শিফ্‌তা।

ইতিমধ্যে এলো শিফ্‌তার স্ত্রী আর মেয়ে। শুনতে পেয়েচে আমাদের উত্তেজিত কথার স্বর। জিজ্ঞেস ক'রলে শিফ্‌তার স্ত্রী, "কা হুয়া হুজুর?"

বলার মতো মনের অবস্থা নয় আমার। বহু কথা এড়াবার জন্যে শুধু ব'ললুম, "এখন নয়, পরে শুনতে পাবে।"

"চা লাউঁঙ্গী?"

"নেহি"—একটু তোড়ের সঙ্গে জবাব হ'লো। ভয়ে কিছু আর সে জিজ্ঞেস ক'রলে না। হতভম্ব হোয়ে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলে মা ও মেয়ে।

ইতিমধ্যে শিফ্‌তা এলো এক জোড়া ঘোড়া নিয়ে। আমাদেরই সেই ঘোড়া।

স্ত্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে ব'ললে শিফতা, "আমার ব্রিচেজ্‌ আনো। মনমায়া মাইজী চলা গিয়া। জলদি লে আও ব্রিচিজ্‌।"

আমার দিকে ফিরে ব'ললে শিফ্‌তা, "মাইজী আমার সংসার চালাতেন হুজুর। স্কুলের মাইনে প্রায় সবই পেতাম আমরা। মাইজী মানুষ না, দেওতা।" কেঁদে ফেল্লে শিফতা। কাঁদতে কাঁদতে ব্রিচেজ্‌ নিয়ে এলো তার স্ত্রী। ব্রিচেজ্‌ সায়েবদের দান।

জলদি ব্রিচেজ্‌ পরে নিলে শিফতা। আমার রইলো পূর্ব্বের সায়েবী পোষাক।

এক লাফে চাপ্‌লুম ঘোড়ায়? চা'প্‌লে শিফতাও। ব'ললুম, "চালাও শিফতা, চালাও সিংলীলার রাস্তায়।"

"আমি আগে যাই হুজুর। রাস্তা আমি চিনি।"

"চালাও। বহুত্‌ জোর্‌ চালাও।"

ছুটচে ঘোড়া। ঘোড়া ছুটচে হাওয়ার মতো। অল্পক্ষণে সহর ছেড়ে বেড়িয়ে এলুম। জলাপাহাড়ের ধার দিয়ে শিফ্‌তা ধরলে রাস্তা ঘুম্‌-এর দিকে।

ঘুম্‌ও পেরিয়ে গ্যালো। এলো জোড়্‌পুখ্‌রি। ঘোড়ার গতি শ্লথ ক'রে দিলে শিফ্‌তা। ব'ললুম, "থামালে কেন শিফ্‌তা?"

"হুজুর, এখানে চার ধারে একবার দেখে নেয়া দরকার মাইজী ধারে পাশে কোথাও আছেন কি নাই।"

"আরও দূরে যদি গিয়ে থাকে শিফ্‌তা? যে পালিয়ে যেতে চায় এতো নিকটে সে থা'মবে কেন?" জিজ্ঞেস ক'রলুম আমি।

জবাব দিলে শিফতা, "আমরা যত জোরে এসেছি হুজুর, মাইজী এতো জলদি আ'সতে পারবেন না।"

ব'ললুম, "তোমার মাইজী সব পারে শিফ্‌তা, কাছে থেকেও তোমরা তাকে চিনতে পারোনি।"

"তবু দেখি হুজুর, ঐ উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে, যেখান থেকে ধারে দূরে সব ত্মাখা যায়।"

"আর ঐখান থেকে হাঁক দাও শিফ্‌তা। হয়তো তোমার ডাকে জবাব দিতে পারে।"

"জি আচ্ছা" ব'লে ঘোড়া ছোটালে শিফ্‌তা। চ'ড়লে পাহাড়ের টিলায়। ডাক দিলে জোরে, "মাইজী, মাইজী।"

জবাব এলো ভেসে, "জী, জী।"

জোশের সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়া ছুটালুম। ব'ললুম উত্তেজিত উদ্দীপনায়, "ঐ তো জবাব দিয়েচে শিফ্‌তা। ত্মাখো, ত্মাখো, এইখানেই কোথাও আছে, কোথাও আছে।"

ব'ললে সে শুষ্ক মুখে, "জি, না হুজুর, ও-তো আমরই কথা ঐ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আমাদেরই কাছে ফিরে আসচে।"

"নেই তবে?"

"এখনো তো নাই হুজুর।"

"তবে ফের্‌ ছোটাও ঘোড়া। ছোটাও, ছোটাও। মায়া আরও দূরে গ্যাচে। চলো ঐ টঙ্‌লু।" ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেই এগিয়ে যেতে লাগলুম। শিফ্‌তা ধ'রলে সাথ। গ্যালো আমারও আগে।

ব'ললে, "রাস্তা আমি চিনি হুজুর, আপনি নয়।"

কিছুদূর গিয়ে ব'ললুম, "শিফ্‌তা, আরও জোর চালাও। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে—খটাখট্ খটাখট্। ঠিক আগে আগেই চ'লেচে মায়া ঘোড়া ছুটিয়ে।"

ব'ললে শিফ্‌তা, "জি, না হুজুর, এও তো আমাদেরই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।"

"তবে কি মিলবে না মায়াকে?"

"কেন নাহি মিলবে হুজুর। আপনি দিল্‌কা পেরেশানী মৎ কিজিয়ে; মাইজী কো জরুর মিল্ জায়েগা।"

"তবে চ'লো শিফ্‌তা, হয় মায়াকে মিলবে নয় তো নিজে মিলিয়ে যাবো ঘোড়ার খুরের নীচে, যখন আর কোমরে শক্তি থা'কবে না।"

"ঘাব্‌ড়াইয়ে মৎ। জরুর মিল্‌বে হুজুর।" শিফ্‌তার আশ্বাসবাণী।

"তোমার ডাকে সাড়া দিলে না পাষাণী। আমি একবার ডাকি শিফ্‌তা, গলা ফাটিয়ে ডাকি। তবু যদি পাষাণীর দয়া হয়। মায়া, মায়া"—বুক ফেটে যাচ্চে। গলা শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গ্যাচে। আমার অমন হেন ডাক্! জবাব না দিয়ে কি থা'কতে পারে সে? সে যে আমায় এখনো ভালোবাসে—ভালোবাসে। জবাব দিলে সে—লম্বা জবাব,—ঐ পাহাড়ের কোল থেকে।

"আয়া—আয়া......."

"না—না, তুমি আয়া নও, আয়া নও মায়া। অভিমানীনি, অভিমান ছাড়ো। ফিরো এসো—ফিরে এসো।"

এলো জবাব তার, "এসো, এসো—ও-ও......"

"আসবোই তো। এসেচি তো। ফিরে আর যাবো না। কোথায় যাবে তুমি? আমিও তোমার সাথে সাথে......"

এলো জিজ্ঞেস, "সাথে—সাতে—এ-এ?"

"অবাক হয়ো না মায়া, তোমার মতো আমিও ম'রতে জানি। আমাকে তো মেরেই রেখে গ্যাচো। মরার আবার মরা কিসের?"

প্রাণপণে আবার কাতর কণ্ঠে চীৎকার ক'রলুম, "মায়া, আমাকে আর দুঃখ দিও না মায়া। এতো নির্দ্দয় কেন হ'লে? তুমি কি জা'নতে না এভাবে তুমি গেলে আমার কি হবে?"

গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে কি জবাব ভেসে এলো কানে গ্যালো না।

ঘোড়া ছুটচে। আর জোর কারো দেহে অবশিষ্ট নেই এক শিফ্‌তা ছাড়া। ধীর তালে ছুটচে ঘোড়া। তাড়াতাড়ি শিফ্‌তা তার ঘোড়া শুদ্ধ আমার সামনে এসে লাগাম ধ'রে থেমে দিলে আমাকে।

"থামুন হুজুর, বেচৈন্ হবেন না হুজুর। আমি বলচি মাইজীকে আবার পাবো। মাইজী আবার ফিরে আসবেন। ফিরে তার আসতেই হবে। কছম করছি যতক্ষণ আমার জীবন আছে মাইজীকে আমি তালাশ ক'রবো।"

"তুই এতো কাঁদচিস্ কেন শিফ্‌তা? তোর কি হ'লো?"

"আপনার সব খুন মাথায় চ'ড়ে গ্যাছে। ঐ খুন প'ড়ছে নাক দিয়ে। দেখুন দিকিন জামাকাপড় ঘোড়ার পিঠ তাজা খুনে খুনে সয়লাব হোয়ে গ্যাচে।" দুর্দ্দর্ষ পাহাড়ী শিফ্‌তা অঝোর ধারে নীরব কান্নায় ভিজিয়ে ফেলেচে তার বুক। আমার বুক ভিজেচে নাকের রক্তে, না বুকের রক্তে, কি খেয়াল আছে আমার?

কেঁদে কেঁদে আবার ব'ললে শিফ্‌তা, "হুজুর, ভদ্দর লোকের কি এত কষ্ট সহ্য হয় হুজুর? আমাদের শরীর পাহাড়ের মতোই পাথর দিয়ে মজবুত্-তৈয়ার। আর সামনে যাওয়া হবে না হুজুর। গলা দিয়ে আপনার জবান আর বের হ'চ্ছে না হুজুর। আমরা বহুত্ দূর টঙ্‌লু তক্ এসে প'ড়েচি।" ঘোড়া থেকে নাবিয়ে নিলে জোর করে। আস্তে আস্তে ব'ললুম, "এইখানে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তুমি ঘর পানে চ'লে যাও শিফ্‌তা।"

পাথরের তৈরী পাহাড়ী শিফ্‌তার পাথর গ'লতে শুরু ক'রেচে। থা'মচে না তার কান্না। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদ্‌চে শিফ্‌তা। চোখ লাল হোয়ে যাচ্চে ক্রমে ক্রমে। অবশ হোয়ে আ'সচে আমার দেহ। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মাটিতে হাঁটু গেড়ে মাথাটি আমার নিলে তার হাঁটুর'পর। আসন্ন মৃত্যুর অবসন্নতা নিয়ে তাকিয়ে রইলুম তার ক্রন্দনরত মুখের পানে। তার চোখের পানি প'ড়তে লাগলো আমার মুখে। এরপর আর মনে নেই কিছু।

——::——

ক্রোড়োধ্যায়

কয়েকদিন পরে ভাবীর ঘরে, না—না দিদির ঘরে,—মায়ার দিদি-ডাক হারা দিদিকে সমবেদনায় এখন দিদি বলি আমি,—কয়েকটি বালিশ উঁচু ক'রে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছি। পাশে মাটিতে ব'সে শিফ্‌তা।

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "তারপর শিফ্‌তা ?"

"তারপর হুজুর, সামান্য দূরে সীমন্‌পল্লী ছিলো। আপনার ঘন ঘন কয়েকবার চীৎকার তারা শুনতে পেয়েছিলো, আর শুনতে পেয়েছিলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কারো বিপদ মনে ক'রে সরল পাহাড়ীরা ছুটে আসে এবং দেখতে পায় আপনাকে আমার কোলে অজ্ঞান অবস্থায়। ধরাধরি ক'রে নিয়ে যায় তারা তাদের গরীব কুটিরে। মাথায় জল দিতে থাকে। ঠাণ্ডা জলের ধারানীতে আপনার জ্ঞান ফিরে আসে। তারা গরম দুধ ও চা খাওয়াতে থাকে।

রা'ত যায়। পরদিন ভাই-চিয়র্‌ম্যান্ সা'ব অনেক ঘোড়া ও লোকজন নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হোন। তারপর তো আপনিও জানেন।"

জানি শিফ্‌তা। পাল্কীর মতো কি একটা তৈরী করা হয়। পাহাড়ীদেক ব'লে ক'য়ে যত্নের সঙ্গে আনা হয় তাতে ক'রে এই বাড়ীতে, এই বিছানায়। পাঠান ভাইজান আর তাঁর পাহাড়ী-পত্নী এই মৃতের দেহে নিমিত্ত হোয়ে প্রাণ সঞ্চার করেন। তুমি শিফ্‌তা, তোমার কথা না বলাই ভালো। ওরে শিফ্‌তা, তোর লোহার মতো কঠিন দেহের বুকের ভেতরে হিমালয়ের মতো স্নেহের বরফ কতো জমা ছিলো ? উপযুক্ত স্নেহ-সহানুভূতির-সূর্য্য কিরণে উপযুক্ত মুহূর্ত্তে গ'লতে শুরু ক'রেছিলো সে মমতার বরফ। গ'লে গ'লে গঙ্গার সৃষ্টি ক'রলি এ ক'দিনে ? প্রভু ভক্তি, বিশ্বাসপরায়ণতা থাকে যদি কোথাও তো তোর মধ্যেই আছে। অনেকক্ষণ আবেগ-সজল চোখে চুপ্‌চাপ্ থাকার পর জিজ্ঞেস ক'রলুম, "তারপর তোমার মাইজীর অনুসন্ধানের কি হ'লো শিফ্‌তা ?"

"মিল্‌বে হুজুর, মিল্‌বে মিল্‌বে। মাইজীর খবর জরুর মিলবে। আপনি ঘাব্‌ড়াবেন না।"

"আর কবে মিলবে শিফ্‌তা? আজ নিয়ে আট দিন হ'লো না।"

"আপনাকে আমরা ভালো দেখলে আবার ছুটবো। ভাই-চিয়ারম্যান্ সা'ব তো বহুত্ পাহাড়ী আদ্‌মি এধার ওধার ভেজিয়ে দিছেন।"

"তা তো জানি। কিন্তু ফল কি? বৃথা আশা শিফ্‌তা।"

শিফ্‌তার চোখ ছলছল্ কোরে ওঠে। মায়া মায়ায় মিলিয়ে গ্যাচে। তবু তার কথ মনে হয়, মরণের পূর্ব্বে আবার দেখা হবে আমার সাথে। আমার কোলে হ'বে তার মহানির্ব্বাণ।

একি শুধু মানুষের হৃদয় সঞ্জাত একটি আশার বাণী? আরও কয়েকদিন আশায় আশায় র'য়ে গ্যালো।

একদিন ব'ললুম শিফ্‌তাকে, "শিফ্‌তা, হয়তো এই শহরেরই কোথাও সে লুকিয়ে থা'কতে পারে। চ'লো না শিফ্‌তা, বৌদ্ধগুম্ফা আর মঠ মন্দিরগুলো একবার দেখে আসি?"

"চলিয়ে হুজুর।"

গেলুম ঘুম গুম্ফায়। চেয়ে চেয়ে দেখলুম ভিক্ষুনীদের দিকে। নাঃ, সবাই আছে, মায়া নেই। গেলুম গিঙে। শত হাজারের মধ্যেও যে এক পলকে চিনবো মায়াকে। মায়া থা'কলে তো?

গেলুম লরেটো কনভেণ্টে। গেলুম আর্য্য মিশনে। গেলুম আঞ্জুমানে। গেলুম কসাই বস্তী, ভুটিয়া বস্তী, লেপচা বস্তী, নেপালী বস্তী। গেলুম দার্জ্জিলিং-এর আনাচে কানাচে, অলি গলিতে। খুঁজলুম গুহায় গর্ত্তে, ঝোপে ঝাড়ে, বনে জঙ্গলে।

গতকাল থেকে মৃদঙ্গের বাজনা-ধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগিয়ে ছোট্ট পাহাড়িয়ে শহর মাৎ ক রেচে। শুনলুম দার্জ্জিলিং-এর বাঙ্গালী সমাজ নাকি স্থানীয় রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে হরিবাসরের আয়োজন ক'রেচে। কি জানি, সেখানে বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে মিশে থা'কতে পারে তো মায়া? সারা জীবনই যখন কেটেচে তাদের সঙ্গে?

গেলুম হরিবাসরে। সাদা ধব্‌ধবে ধুতি পরণে, মোটা সাদা খদ্দরের চাদরের উপর দিয়ে ফুলের মালা গলায়, কপালে চন্দন তিলক আঁকা কীর্ত্তুনিয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে, আবেগ মিশিয়ে গাইচেন পদাবলী। ঢুকতেই কানে এলো,

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মনে মনোভাব পেষল জানি॥"

নয়নের ধারায় প্লাবিত মুখে অপরাপর ভক্তের চোখের পানি ঝুরিয়ে ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলেন কীর্ত্তনিয়ে,

'প্রথম জীবনের প্রেম শ্রীরাধিকার নয়ন অন্ধ ক'রে দিলো। সে প্রেম দিন দিন বা'ড়লো বই আর কোনও দিনই ক'মলো না। পুরুষ রমণীর মধ্যকার প্রেম এ নয়। সে শুধু প্রেমময় প্রেমময়ীর প্রেম। দুজনের মনে দুজনের মনোভাব প্রবেশ ক'রলো; পরস্পর তন্ময়-চিত্ত হোয়ে রইলো।

ভক্তজন চীৎকার কোরে 'আহা আহা' রবে কেঁদে উঠলেন। ভাববিগলিত একজন হেঁকে উঠলেন, "কই হে সাধু, সাবধান। বল হরি,—হরি বোল, হরি বোল।" সকলে সমস্বরে ধ্বনি দিলে। মেয়েদের মধ্যে দেখলুম চেয়ে, এ ধ্বনি-দাত্রীদের মধ্যে আমার খনি আছে নাকি। বৃথাই ক্লান্ত উৎসুক চোখ খুঁজে ফিরতে লাগলো। কোথায় সে?

এদিকে পদাবলী গীত হ'চ্চে,

প্রেমক অঙ্কুর আঁতজাত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।"

প্রেমের অঙ্কুর অন্তররূপ আঁতুড় ঘরে জন্মেই মারা গ্যালো। দুটো নব কিশলয় তার আর গজাতে পেলো না।

চ'লচে পদাবলী,—

"কো জানে চন্দ চকোর বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।"

কে জানে যে সুধার অধিকারী হোয়েও চাঁদ তার আশাধারী চকোরকে বঞ্চনা ক'রবে? কে জানে যে মাধবী পুষ্প তার ভ্রমরকে খালি মুখেই ফিরিয়ে দেবে?

তাইতো, তাইতো। আমি কি ভেবেছিলুম যে আমার প্রথম জীবনের ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু প্রেম এমনি কোরেই আঁতুড় ঘরে মারা যাবে? নব কিশলয়ের সফলতায়

ফুটে আর উঠবে না সে? আমার চাঁদ, আমার মাধবী, তার আশাধারী চকোর, তার গুণমুগ্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনকে এমনি কোরেই কি বঞ্চনা ক'রবে, খালি মুখে ফিরিয়ে দেবে?

পাহাড়ের মায়া আমায় একদিন এনে ফেলেছিলো এই পাহাড়ে;—মিলিয়ে দিয়েছিলো পাহাড়িনী মায়াকে। সেই মায়া-লালসী প্রেম-বিলাসী পাহাড়ই আজ আবার নিজের বুকে লুকিয়ে রা'খলে তাকে। দিলে না ফিরিয়ে আমার বুকে। বড় স্বার্থপর সে। বড় নির্দ্দয় প্রাণহীন পাথর সে। ছোট শিশুর মুখের সামনে মোওয়া দেখিয়ে ব্যঙ্গপ্রিয় যেমন ক'রে সরিয়ে নেয় মোওয়া, এই পাহাড়ও আজ আমাকে তাই ক'রেচে। মায়াহীন আজ আমিও। কায়াহীন শুধু মাত্র একটি ছায়া নিয়ে হ্যান্তে ম'রে আছি। ভাঙ্গা বুকের দিবারাত্রির দহন জ্বালা, অসহ্য — অসহ্য। দোর্জ্জেলিং—বজ্রভূমি—অবশেষে আমার বুকেই তার বাজ হেনেছে।

ঘটনার-মালিক কি দেখছে না আমার এই তপ্ত বুকখানা?

প্রেম-সর্ব্বস্ব মায়ার প্রেমোষ্ণ বুকের ভেতর থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী তার অন্তরে অন্তরে ক'য়ে দিয়েচে, সফল হবে না কি সে বাণী? আবার সে আ'সবে না কি ফিরে? আসে যদি, তবে কবে আ'সবে সে? কবে দেবে আমার শোক-সন্তপ্ত কোলে তার প্রেম-লুণ্ঠিতা আত্মসমর্পিতা বুক জুড়ানো মাথাখানি!

হে আশা-পূরণের মালিক, তোমার পূর্ণতার অক্ষয় ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হোয়ে গ্যালো আমাদের বেলায় এসে?

অথ ইতি সাধু-সংবাদ।